বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

মেহেরপুর

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

মেহেরপুর

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

নির্বাহী সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

রফিকুর রশীদ

সংগ্রাহক

আবদুল্লাহ আল আমিন

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
মেহেরপুর

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২০/জুন ২০১৩

বাএ ৫১০১

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত পঞ্চাশ

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : MEHERPUR (Present state of Folklore in Meherpur District), Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Executive Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2013. Price : Tk. 250.00 only. US$: 6.00

ISBN-984-07-5120-4

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি

www.pathagar.com

তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য

www.pathagar.com

ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

www.pathagar.com

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

www.pathagar.com

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active

www.pathagar.com

tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Rodger D Abrahams

জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়।

জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. **নামকরণের ইতিহাস** : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড় দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. **বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ** : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া

www.pathagar.com

(কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়লেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), নড়াইলের কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের খিরের চমচম (সন্দেশ), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি) বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন : গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে

www.pathagar.com

দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখী উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন,

www.pathagar.com

১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে খির খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : (folk food)

সপ্তম অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান,

খ. লোকনৃত্য।

অষ্টম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস, ৩. লাঠিখেলা, ৪. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৫. হাডুডু খেলা, ৬. ঘুড় ওড়ানো, ৭. ডাংগুলি খেলা, ৮. পলাগুঞ্জি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

নবম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. বাউয়ালি প্রভৃতি।

দশম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

একাদশ : ধাঁধা (riddle)

দ্বাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয় নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, পরিকল্পনা উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব এ.কে.এম. মাহবুবুল আলম ও ফোকলোর উপবিভাগের

www.pathagar.com

উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ – Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয় নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান মেহেরপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে মেহেরপুরের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

আমরা আশা করি, এই সংকলন গ্রন্থটি লোকজ সংস্কৃতানুরাগীদের কাছে আদরণীয় হবে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-৮২

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল ২৩
খ. ভৌগোলিক অবস্থান ২৬
গ. জনবসতির পরিচয় ২৭
ঘ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ ২৮
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল ২৯
চ. শিক্ষার হার ৩৭
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ৩৮
জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ৪১
ঝ. ধর্ম ও দর্শনচর্চার ইতিহাস ৪৫
ঞ. শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস ৪৭
ট. খাদ্যশস্য ৫০
ঠ. মসজিদ, মন্দির ও গির্জা ৫১
ড. মুক্তিযুদ্ধ ৬০
ঢ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৬৪

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৮৩-১২৬

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি ৮৩
খ. কিংবদন্তি ৮৫
গ. কবিগান ৯০
ঘ. লোকছড়া ৯৭
ঙ. লোককবিতা ১০৮
চ. ভাট কবিতা ১১১
ছ. পুথিসাহিত্য ও পুথিপাঠ ১২৩

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১২৭-১৪০

লোকশিল্প ১২৭
১. মৃৎশিল্প ১২৮
২. পাটশিল্প ১৩১
৩. তাঁতশিল্প ১৩৪
৪. বাঁশ-বেতশিল্প ১৩৮

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৪১-১৪২

www.pathagar.com

লোকসংগীত (folk song) ১৪৩-২০২

১. বাউলগান ১৪৪
২. জারিগান ১৫৩
৩. ধুয়াগান ১৫৮
৪. ঝাঁপান গান (সাপের মন্ত্র জাগানো গান) ১৫৯
৫. আলকাপ গান ১৬৩
৬. হাড়ি সম্প্রদায়ের গান ১৬৪
৭. মর্সিয়া গান ১৭০
৮. কীর্তন গান ১৭৪
৯. ভাসান গান ১৭৭
১০. মানিক পিরের গান ১৮০
১১. আরজান শাহ্র গান ১৮২
১২. আজাদ শাহ্র গান ১৮৪
১৩. দবির শাহ্র গান ১৮৫
১৪. ঝড়ু শাহ্র গান ১৮৬
১৫. মাতু ফকিরের গান ১৮৭
১৬. মন্টু শেখের গান ১৯০
১৭. মেয়েলি গীত ১৯২

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ২০৩-২০৬

লোকউৎসব (folk festival) ২০৭-২৩২

১. নবান্ন উৎসব ২০৯
২. ভবানীপুরের ওরস ২১০
৩. সাহারবাটি এবাদতখানার ওরস ২১২
৪. বাদিয়াপাড়ার ওরস ২১৩
৫. পৌষ সংক্রান্তি ২১৩
৬. মহরম আশুরা ২১৫
৭. সাহারবাটির বৈশাখী মেলা ২১৭
৮. হরিসভার মেলা ২১৮
৯. বারুণীর মেলা ২১৯
১০. নিগমানন্দের জন্মতিথির মেলা ২২০
১১. বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা ২২২
১২. গোয়ালগ্রামের স্নানযাত্রার মেলা ২২৩
১৩. বাসন্তী মেলা ২২৩
১৪. চিৎলার অমর একুশে লোকমেলা ২২৪
১৫. বল্লভপুরের বড়দিনের মেলা ২২৬
১৬. নিত্যানন্দপুরের বড়দিনের মেলা ২২৮

www.pathagar.com

১৭. ভবরপাড়ার বড় দিনের মেলা ২২৯
১৮. পাকুড়িয়ার বড় দিনের মেলা ২২৯
১৯. মেহেরপুরের রথের মেলা ২২৯
২০. তারানগরের মাদার পিরের মেলা ২৩১

আচার-অনুষ্ঠান (ritual) ২৩৩-২৫২
১. লোকধর্ম কেন্দ্রিক আচার ২৩৩
২. মাজার, আখড়া, আশ্রমকেন্দ্রিক বাউলদের আচার ২৪৬
৩. দরগা, মাজারকেন্দ্রিক আচার ২৪৯
৪. কাত্যায়নী পূজা ২৫০

লোকখাদ্য (folk food) ২৫৩-২৫৬

লোকনাট্য (folk theatre) ২৫৭-২৬৬
লোকযাত্রা ২৫৭

লোকক্রীড়া (folk games) ২৬৭-২৭৬
১. লাঠিখেলা ২৬৮
২. হাডুডু ২৭০
৩. কুস্তি বা মাল খেলা ২৭১
৪. কানামাছি ২৭২
৫. ষোলো ঘুঁটি ২৭৩
৬. কড়ি খেলা ২৭৩
৭. দাড়িয়াবান্ধা বা ফুল খেলা ২৭৩
৮. কিতকিত খেলা ২৭৪
৯. লুকোচুরি ২৭৪
১০. বউ তোলা খেলা ২৭৫
১১. গোল্লাছুট বা ঘুপা খেলা ২৭৫

তন্ত্রমন্ত্র (chant) ২৭৭-২৭৮

ধাঁধা (riddle) ২৭৯-২৮৪

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ২৮৫-২৯৬

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার (folk belief) ২৯৭-৩০৬

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩০৭-৩১২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় মেহেরপুর, এক প্রাচীন জনপদ। "এ জেলায় রয়েছে প্রায় দুহাজার বছরের প্রাচীন ভূগোল এবং এই সঙ্গে রয়েছে বর্ণাঢ্য ইতিহাস। বিশেষ করে, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে মেহেরপুরের মুজিবনগর ধাত্রীপনার ভূমিকা পালন করার পর এ জেলার ইতিহাস হয়েছে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল।"[১]

তবে ইতিহাসের কোনো সোনালি অধ্যায়ে অবিভক্ত নদীয়ার এই প্রাচীন জনপদে লোকবসতি গড়ে ওঠে তা জানা যায় না। জনশ্রুতি আছে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় এখানে জনপদ গড়ে ওঠে। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। কুমুদনাথ মল্লিকের মতে, "কেহ কেহ এই স্থানটিকে মিহির-খনার বাসস্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন এবং মিহিরের নাম হইতে মিহিরপুর, অপভ্রংশে মেহেরপুর কল্পনা করেন।"[২]

নামকরণ সম্পর্কিত এ তথ্যটিও সম্পূর্ণরূপে অনুমান ও কল্পনানির্ভর। জনশ্রুতি নির্ভর এই অনুমানের বিপরীতে ড. আশরাফ সিদ্দিকীরও আরেকটি জনশ্রুতি রয়েছে। তিনি লিখেছেন :

The town was founded in the 16th century by a dervish (mendicant) named Meher Ali Shah, after whom the town was named.[৩]

কিন্তু দরবেশ মেহের আলীর নামে যে মেহেরপুর-এর নামকরণ করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও কোনো সঠিক তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। ড. আশরাফ সিদ্দিকীর অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় ইতিহাসচর্চার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক গবেষক ও লেখক অধ্যাত্মসাধক শাহ ভালাই ওরফে মেহের আলী শাহ-এর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি দাঁড় করাতে চেয়েছেন। 'মেহেরপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

দরবেশ মেহের আলী শাহ এই নামটি এ অঞ্চলের প্রাচীন মানুষেরা প্রায়ই জানেন। তবে বাল্যকালে তাঁর ডাকনাম ছিল শাহ ভালাই।

ইয়ামন শহরে খ্যাতিময় কেনিয় বংশে তিনি ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩ রজব দিনগত রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হযরত আবু নওয়াজেশ হেযাবী এবং মাতার নাম সৈয়দা মার্জিয়া বানু।

মেহেরের পিতা একজন উচ্চস্তরের আলেম ছিলেন। তাঁর বাল্যনাম রাখা হয়েছিল 'ভালাই'। চার বছর বয়সে মামার সার্বিক তত্ত্বাবধানে তিনি মক্তবে অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন।

www.pathagar.com

মেহেরপুর জেলার মানচিত্র

সেখানে তিনি কোরআনে হাফেজ হন, সেই সাথে শরিয়ত, হকিকত, হাদিস ও তাছাউফ, তফসির ও ফেকাশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন। এরপর স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশে আসেন। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি ১৬৫৯ সালের দিকে এ অঞ্চলে এসে উপস্থিত হন। এ সময়ে এ অঞ্চলে তেমন লোকালয় গড়ে ওঠেনি। অত্যন্ত প্রতাপশালী খোন্দকার ইসাহাক তখন বসবাস করতেন বর্তমান মেহেরপুর শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত শেখ পাড়ায়। মেহের আলী শাহ ইসাহাকের বাড়িতে সাময়িক ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে নিজ ব্যক্তিত্বের বলে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কালাচাঁদপুর মাঠের মধ্যে বিশাল বৃক্ষরাজির ছায়াতলে নিজের আস্তানা গড়ে তোলেন।[৪]

মেহেরপুর শহরের কালাচাঁদপুরে শাহ ভালাই-এর দরগা রয়েছে—এটা সত্য। কিন্তু মেহের আলী শাহ-এর বাল্যনাম যে শাহ ভালাই—এ বিষয়ে মতদ্বৈধতা ও বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন, শাহ ভালাই হলেন লোকচেতনা প্রসূত সত্যপির, মানিক পির, সোনাপির-এর মতো কোনো এক লৌকিক পির। মধ্যযুগের বাঙালি কবি এবং দোভাষী পুথি রচয়িতারা লৌকিক পিরদের ছায়া অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন এবং নানাভাবে পিরস্তুতি করে তাদের মহিমা প্রচার করেছেন। 'সত্যপীরের পাঁচালি,' 'মানিক পীরের গীত,' 'কালু-গাজী চম্পাবতী'-তে লৌকিক পিরদের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব পির লোকমানস প্রসূত হলেও বাংলার লোকজীবনে এদের প্রভাব অপরিসীম। অনুরূপভাবে এ জনপদের শিক্ষাদীক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন, দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠী কল্পনা দিয়ে 'শাহভালা'কে পির বা দরবেশ হিসেবে তৈরি করেছে। অতঃপর কল্পনার রথে করে তাকে ইয়েমেন থেকে বাংলাদেশের এক নিভৃত পল্লিতে নিয়ে আসা হয়েছে। 'শাহ ভালা' নামে যেহেতু কোনো খানদানি ছাপ নাই, তাই তার নাম দেওয়া হয়েছে 'দরবেশ মেহের আলী শাহ'। এসবই আসলে কিংবদন্তি এবং এর সপক্ষে কোনো প্রামাণিক দলিল বা সূত্র নেই। এ প্রসঙ্গে আহমদ শরীফ-এর একটি মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। "বাঙালি ঐতিহ্য ও বংশগৌরব-লোভী। খান্দানে বিশ্বাসী। বাঙালির কোনো নিজস্ব ঐতিহ্য নেই। সৃষ্টি করতে পারেনি বলেই তারা আরবের মরুভূমি, সাহারায়, গোবি মরুভূমিতে ঐতিহ্য সন্ধান করে বেড়িয়েছে।"[৫]

তিনি আরও বলেছেন : সাতশ বছরে একজন দরবেশও মুসলমান সমাজ তৈরি করতে পারেনি। তাদের সব দরবেশ আল-মাদানি, আল-বোখারি, সমরখন্দি। মেহেরপুর নামকরণ যে দরবেশের নামে করা হয়েছে, তিনিও ইয়েমেনি। কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনি'তে তাই মোহিত রায় মন্তব্য করেন : "মেহেরপুর নামকরণ নিয়ে দুটি মত প্রচলিত। দুটিই স্থানীয় জনশ্রুতি নির্ভর, ইতিহাস আশ্রিত নয়। কোনো প্রামাণ্য সূত্র নেই।"[৬]

আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা মেহেরপুর। গাংনী, মেহেরপুর সদর এবং মুজিবনগর—এই তিন উপজেলা মিলিয়ে এ জেলার মোট আয়তন ৭১৬ বর্গকিলোমিটার। তিন উপজেলার মধ্যে ৩৩৯.৩২ বর্গকিলোমিটার বিশিষ্ট গাংনী আয়তনে এবং জনসংখ্যার হিসেবে বৃহৎ উপজেলা। মেহেরপুর জেলায় তিনটি উপজেলার অধীনে রয়েছে ১৮টি ইউনিয়ন, ২টি পৌরসভা, ১৯৯টি মৌজা এবং ২৫৯টি

www.pathagar.com

গ্রাম (২০০১ সালের শুমারি অনুযায়ী)। এ জেলার আবাদযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ ৬০১৮৩ হেক্টর। জলাভূমির পরিমাণ ১৩৫৯ হেক্টর এবং বনভূমির পরিমাণ ১০ হেক্টর।

মেহেরপুর জেলা ২৩.৩৫'° থেকে ২৩.৫'° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৩৬'° থেকে ৮৮.৫৬'° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

ছোট্ট এ জেলার উত্তরে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানা, দক্ষিণে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর, দামুড়হুদা থানা, পূর্বে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানা ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানা, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। মেহেরপুরের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রায় ৬০ কিলোমিটার ভারতীয় সীমান্ত রয়েছে।

আয়তনে ছোট হলেও মেহেরপুর এখন জেলা। তার আছে ৩ উপজেলা, ২ পৌরসভা, ১৮ ইউনিয়ন। জেলা-পরিচয় প্রাপ্তির আগে প্রাচীন জনপদ মেহেরপুরের ছিল ভিন্ন পরিচয়। কখনো বাগোয়ান, কখনো রাজাপুর পরগনার অধীনে শাসিত হয়েছে মেহেরপুর। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানি লাভের ফলে মেহেরপুরও চলে যায় কোম্পানির শাসনে। স্থানীয় জমিদারের মদদে সংঘটিত নীলবিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ১৮০৩ সালে মেহেরপুরে গাংনী থানা নদীয়া জেলা থেকে অবমুক্ত হয়ে যুক্ত হয় যশোর জেলার সঙ্গে। ১৮৫৪ সালে মহকুমার মর্যাদা লাভ করে মেহেরপুর ; তবে যশোর নয়, নদীয়া জেলার অধীনে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে ভাগ হয়ে যায় মেহেরপুর মহকুমাও। এর দুটি থানা পড়ে ভারতে, দুটি পাকিস্তানে। মহকুমা পরিচয় হারিয়ে মেহেরপুর থানা যুক্ত হয় চুয়াডাঙ্গা মহকুমার সঙ্গে। গাংনী থানাকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৫১ সাল থেকে মেহেরপুর আবারও মহকুমা ১৯৮৫ পর্যন্ত। তারপর থেকে জেলা। অধীনস্থ উপজেলা দুটি গাংনী ও মেহেরপুর সদর। ২০০৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর সদরের ৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত হয় নতুন উপজেলা মুজিবনগর। মেহেরপুর জেলার মোট উপজেলার সংখ্যা দাঁড়াল তিনটি।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে মেহেরপুর জেলা প্রাচীন গঙ্গাখাতের মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত। গাঙ্গেয় অববাহিকার অন্তর্গত সমতলভূমিই হচ্ছে এ অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমুদ্রগর্ভ থেকে কতো বছর পূর্বে এ অঞ্চল জেগে উঠেছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে সমুদ্র থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মেহেরপুর জেলার অধিকাংশ এলাকাই সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়ে ১০.৫ মিটার উপরে অবস্থান করছে।

এখানকার ভূমির ধরন মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু প্রকৃতির। পশ্চিমে প্রাচীন গঙ্গার শাখানদী ভৈরব এবং পূর্বে ভৈরবের শাখানদী মাথাভাঙ্গার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে মেহেরপুর জেলার অবস্থান। জেলার অধিকাংশ স্থানই চুনযুক্ত পলল ও অতি ক্ষারীয় মাটি দ্বারা গঠিত। মাটির সাধারণ রং খাকি বা হালকা বাদামি বা গৈরিক বর্ণ। এ জেলার উত্তরাংশ আংশিক উঁচু, সেই সঙ্গে মাথাভাঙ্গার প্রাক্তন গতিপথ ও অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ পরিবেষ্টিত। আবার মেহেরপুরের দক্ষিণাংশ ভৈরবের আবদ্ধভূমি বেষ্টিত। এগুলো

www.pathagar.com

স্থানীয়ভাবে বিল, হাওড়, দহ বা ঘোপ হিসেবে পরিচিত। অতি বর্ষণ বা নদীর মিশ্র প্লাবন ছাড়া এ অঞ্চল মোটামুটিভাবে প্লাবনমুক্ত।

মেহেরপুর জেলা মূলত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় শুষ্কপ্রায় জলবায়ুর অন্তর্গত। গ্রীষ্মকাল উষ্ণতা ও আর্দ্রতাযুক্ত হলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪ সেন্টিমিটার। বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৯° সে. হলেও কখনো কখনো মে মাসের তাপমাত্রা ৪৩° সে. অতিক্রম করে যায়।

মেহেরপুর জেলা সম্পূর্ণই কৃষিনির্ভর। জেলার অনাবাদী ভূমির পরিমাণ মোট ভূমির শতকরা ১১ থেকে ২০ ভাগের বেশি নয়। কৃষিযোগ্য ভূমির অধিকাংশই ব্যবহৃত হয় ধান, পাট ও অন্যান্য রবিশস্য উৎপাদনে। ২০/২৫ বছর যাবৎ প্রচুর পরিমাণে তামাকও উৎপাদিত হচ্ছে। এ অঞ্চলের প্রধান কৃষিজ পণ্য ধান, পাট, গম, আখ, আলু, সবজি এবং বেশ কিছু মৌসুমি ফল। আম, কাঁঠাল, লিচু ও কলা হচ্ছে প্রধান মৌসুমি ফল।

গ. জনবসতির পরিচয়

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মেহেরপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ৫,৮৭,৬২০ জন। এ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলার আনুপাতিক হার প্রায় সমান সমান। পুরুষের সংখ্যা ৩,০১,০৬০ জন এবং মহিলার সংখ্যা ২,৮৬,৫৬০ জন। অধিকাংশ পরিবারই এখানে কৃষিনির্ভর। কৃষিক্ষেত্রে পুরুষশ্রমিকের পাশাপাশি নারী শ্রমিকেরাও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এ জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান হলেও হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও এখানে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করে। সংখ্যায় অঙ্গুলিমেয় হলেও এখানে কয়েক ঘর বাগদি ও ব্যাধ উপজাতিও বাস করে। নিম্নে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার জনসংখ্যার চিত্র তুলে ধরা হলো :

উপজেলা	মুসলিম	হিন্দু	খ্রিষ্টান	বৌদ্ধ	অন্যান্য	মোট	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
মেহেরপুর	২.৫২,৩২৩	৪,১৯৯	১১৪	০১	০৫	২,৫৬,৬৪২	০.৯৮%
গাংনী	২,৯৫,৪৫৮	২,৭২৬	১,৩১৩	-	১১০	২,৯৯,৬০৭	১.০৬%
মুজিবনগর	৯২,৯৭০	৯৪৫	৫২০০	১৩	১৫	৯৯,১৪৩	০.৯৭%

মেহেরপুর জেলার মোট জনসংখ্যার ৯৭.৫৫% মুসলমান, হিন্দু ১.১৫%, বৌদ্ধ ০.০০৪%, খ্রিষ্টান ১.২৫%, অন্যান্য ০.০৪৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.৮৬% (২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। সাতচল্লিশপূর্ব যে কোনো সময়ের জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত চিত্রের সঙ্গে বর্তমান চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করলে সবার আগে চোখে পড়বে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা হ্রাসের ব্যাপারটা। দেশভাগের পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে নিজেদের অস্তিত্বকে নিরাপদ ভাবতে পারেনি বলেই হিন্দুরা ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করেছে। আবার পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ যখন বিসর্জিত প্রায় হয়ে ওঠে, তখনও হিন্দুদের দেশত্যাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবেই সীমান্তবর্তী জেলা মেহেরপুরের জনসংখ্যা থেকে হিন্দুদের

www.pathagar.com

উপস্থিতি দৃশ্যত হ্রাস পেতে থাকে বরং সেই তুলনায় খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এবং বার্ষিক বৃদ্ধির হার অনেকাংশেই স্থিতিশীল অবস্থানে আছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পেশাগত দিক থেকে এরা কৃষি-নির্ভরতা কমিয়ে অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ পেশাগ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে গাংনী উপজেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। এই হার অব্যাহত থাকলে এই উপজেলার অর্থনীতি ও কৃষিতে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করে।

ঘ. সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ

১৯৪৭-এ দ্বিখণ্ডিত হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ভূগোল; বিভক্ত হয় আউল-বাউল, ফকির-বৈষ্ণবদের দেশ নদীয়া, দ্বিখণ্ডিত হয় তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমা। রাজনীতি সব পারে, সব পেরেছে—চিরবন্ধুদের মাঝে এনে দিতে পারে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল আর যুদ্ধের তাণ্ডব, শত্রুদের মধ্যে আনতে পারে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মিলনোৎসব। এই রাজনীতি ১৯০৫ সালে বিভক্ত করে হাজার বছরের আবহমান বাংলা ও তার ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারকে, আবার এই রাজনীতিই ১৯১১ সালে দ্বিখণ্ডিত বাংলার মাটি, বাংলার জলকে এক ও ঐক্যবদ্ধ করে। রাজনীতি কেবল ভূখণ্ডকেই যুক্ত ও বিভক্ত করে না; যুক্ত ও বিভক্ত করে ভাষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে। সাতচল্লিশের দেশভাগ বিভক্ত করে দেয় মেহেরপুরকে এবং তার সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের গৌরবময় স্রোতকে। এ দুস্রোত দুভাগে ভাগ হয়ে ঢোকে দুদিকে, করিমপুর-তেহট্টের মৃদু-ক্ষীণ অথচ বর্ণিল স্রোতটি প্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গে। আর মেহেরপুর-গাংনীর উত্তাল তরঙ্গময় স্রোতটি প্রবেশ করে পূর্ব বাংলায়। সাতচল্লিশের দ্বিখণ্ডনের কারণে মেহেরপুরের অখণ্ড রূপৈশ্বর্যকে আবিষ্কার করা যায়নি, যা পাওয়া গেছে তা কেবলই ধূসর, বিবর্ণ শ্মশানভূমি, যেখান থেকে যেন 'লক্ষ্মী অন্তর্হিত' হয়ে গেছে।

তবু প্রাচীন এ জনপদটির রয়েছে সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতির কিংবদন্তিতুল্য ইতিহাস। ভরতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল', কবি হরিঠাকুরের গান, ড. ইরফান হাবিবের ইতিহাস, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'Hindu Castes and Sects' (1896), দীনেন্দ্র কুমার রায়ের (১৮৬৯-১৯৪৩) 'পল্লি চরিত্র', 'পল্লিচিত্র' গ্রন্থে মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক ও সামজিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিবরণ আছে।

সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এ জনপদে সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার নির্মাতা নাগরিক পরিমণ্ডলের বিদগ্ধজনেরা নয়, এর স্রষ্টা পালাকার, কবিয়াল, লোককবি, বয়াতি, আউল-বাউল-মরমি সাধকেরা। এই ব্রাত্য-মন্ত্রহীন, অক্ষরজ্ঞানহীন সাধকেরাই তাদের গান-ধ্যান, স্বপ্ন-কল্পনা দিয়ে এ জনপদের অতুল-বৈভবময় সংস্কৃতিজগতের বুনিয়াদটি রচনা করেছেন। যুগ যুগ ধরে এরা শুনিয়েছেন দুঃখ জয়ের অবিনাশী গান। আর এসব কিছুর উপরেই রচিত হয়েছে মেহেরপুরের আলোক-উজ্জ্বল সংস্কৃতির সৌধটি।

www.pathagar.com

ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল

আয়তনে ছোট জেলা হলেও গঙ্গা অববাহিকার সমতল পললভূমির মধ্যে মেহেরপুর অত্যন্ত প্রাচীন জনপদ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় এই জেলা বর্তমানে প্রায় নদীশূন্য হয়ে পড়েছে বলা চলে। এটাই আজকের বাস্তবতা। অধিকাংশ জনপদ এবং জনবসতি একদা যে নদীপ্রবাহকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রামগুলোর দৈর্ঘ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই তা বুঝা যায়। এ জেলার বেশিরভাগ গ্রামই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। অর্থাৎ দক্ষিণ প্রবাহী নদীগুলোর দুই তীর জুড়েই মানুষ ঘর বেঁধেছে, বসবাস শুরু করেছে, গড়ে তুলেছে লোকালয়। শুধু নদীই নয়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘির উঁচু পাড়েও বসতি স্থাপন করেছে এ অঞ্চলের মানুষ। গ্রামের নামের শেষে যেমন ডাঙ্গা (ভোলাডাঙ্গা, মদনাডাঙ্গা), দহ (আমদহ, শালদহ, মালসাদহ) সেই প্রমাণই বহন করে। অনেক গ্রামেই আছে পুকুরপাড়া। এই পাড়াগুলো পুকুরকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা গ্রামের নাম দিঘির পাড়া। যেখানেই মানুষের বাস, অনিবার্যভাবেই সেখানে দিনে দিনে গড়ে উঠেছে মসজিদ-মন্দির, গড়ে উঠেছে খেলার মাঠ, সামজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই সব মিলিয়েই মানুষের সামাজিক জীবন। যাপিত এই সামাজিক জীবনের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে লোকজ সংস্কৃতির অমূল্য উপাদান। এই উপাদান তৈরিতে এ অঞ্চলের নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির, গির্জা, সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানাদি পালন করেছে বিরাট ভূমিকা। মেহেরপুর জেলার প্রধান-অপ্রধান বেগবতী সব নদীই আজ নানাবিধ ভূপ্রাকৃতিক কারণে নাব্যতা হারিয়ে মৌসুমি জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে বটে তবু এতদঞ্চলের ভাগ্যবঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত জনগণের শোষণ-বঞ্চনা ও লড়াই-সংগ্রামের সাথে, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্নের সাথে এই সব নদীই জাগ্রত সত্তার মতো মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

একদা শুধুমাত্র নদীপথেই ছিল সমগ্র ভূ-ভারতের সঙ্গে মেহেরপুরের যোগাযোগ। কথিত আছে, ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে দরবেশ খান জাহান আলী ভৈরব নদীপথে বাগেরহাট যাবার সময় মেহেরপুরের বাগোয়ানে যাত্রাবিরতি করেন। তার সংগী চারজন আউলিয়া এতদঞ্চলে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাগোয়ানের অদূরে বর্তমান চারুলিয়া নামক স্থানে থেকে যান। এই চার আউলিয়ার অবস্থানের স্থানটিই পরে চারুলিয়া (চার+আউলিয়া) নামে পরিচিত লাভ করে। চার আউলিয়ার মধ্যে একজন হচ্ছেন দরবেশ মেহের আলী শাহ। তিনি মেহেরপুরে চলে আসেন। অনেকে মনে করেন তাঁর নাম অনুসারেই হয়েছে মেহেরপুরের নামকরণ। ড. আশরাফ সিদ্দিকী জনশ্রুতির বরাত দিয়ে জানাচ্ছেন :

The town was founded in the 16th century by a dervish (mendicent) named Meher Ali Shah, after whom the town was named.

মেহেরপুর জেলার সবচেয়ে প্রাচীন নদী হচ্ছে ভৈরব। ১৫৮৯ সালে মোঘল সেনাপতি মানসিংহ যশোরের প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য নদীপথেই মেহেরপুরের বাগোয়ানে এসে ভবানন্দ মজুমদারের সহযোগিতা গ্রহণ করেন এবং ভৈরব হয়েই যশোরে যান। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যে এ তথ্যের সমর্থন মেলে :

মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে।

www.pathagar.com

এমন অনুমান খুব অযৌক্তিক হবে না যে বিখ্যাত মঙ্গলকাব্য অন্নদামঙ্গলের মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানে গ্রামবাংলার যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে তা এই মেহেরপুর অঞ্চলেরই ষোড়শ শতকের সামাজিক জীবনের ছবি এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'—এই বর প্রার্থনা করে যে ঈশ্বর পাটনী, সেও হয়তো বা এই ভৈরবপারেরই কোনো অখ্যাত খেয়ামাঝি। বাগোয়ানের অদূরেই ভবানন্দ মজুমদারের নামে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম 'ভবানন্দপুর' এই সব অনুমানকেই যেন বা সমর্থন করে। নবাব যেখানে নেমেছিলেন, ভৈরবতীরের সে স্থান এখনো 'নবাবঘাট' নামে পরিচিত।

জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অব কুষ্টিয়া জানাচ্ছে ১৭৫০ সালে নবাব আলীবর্দী খান নদীপথে মৃগয়ায় আসেন বর্তমান মেহেরপুরের বাগোয়ান পরগনায়। নদীপথে মানে ভাগীরথী থেকে ভৈরব হয়ে তাঁর বজরা আসে বাগোয়ান পর্যন্ত। তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত হয়ে নবাব সপারিষদ আতিথ্য গ্রহণ করেন এক বিধবা গোয়ালিনীর। আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে নবাব বিধবার একমাত্র পুত্রকে বাগোয়ান পরগনার রাজত্ব দান করেন এবং রাজা গোয়ালা চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন। গোয়ালা চৌধুরী এলাকার রাস্তাঘাটের এবং মেহেরপুর শহরেরও উন্নতি সাধন করেন। সড়ক পথের উন্নয়ন তাঁর জন্য কাল হয়ে দেখা দেয়। ঐ রাস্তা ধরেই বর্গিদস্যুরা হানা দেয় মেহেরপুরে, লুণ্ঠন করে ধনসম্পদ, এমন কি ভূতলে আশ্রয়কক্ষ নির্মাণ করেও রক্ষা পাননি গোয়ালা চৌধুরী, বর্গিনেতা রঘুজি ভোঁসালার হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে মেহেরপুরসহ সমগ্র নদীয়া অঞ্চলে নীলকরদের আগমন ঘটে নদীপথেই। এ জেলার প্রধান-অপ্রধান সবগুলো নদীর তীরবর্তী দুতিনটি গ্রাম পর পর গড়ে তোলে নীলকুঠি। সাধারণ কৃষকের রক্তে-ঘামে উৎপাদিত হয় উচ্চমূল্য নীল। নদীপথেই তা চলে যায় ইংল্যান্ডে। এই নীলচাষ এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবনে বিরাট অভিঘাত সৃষ্টি করে। নীলকর সাহেবদের তোষণকারী এক প্রকার বাঙালি উমেদার শ্রেণি তৈরি হয়। সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও এই শ্রেণির মানুষেরা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়। দীনবন্ধু মিত্র রচিত বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ'-এ এই অঞ্চলের অত্যাচারিত শোষিত মানুষেরই হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। এই নাটকের গুপে দেওয়ান আসলে এই মেহেরপুরেই মহেশ মুখুজ্যে। এ জেলার শুষ্কপ্রায় নদী তীরের নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনো এ অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়ের শোষণ-বঞ্চনা ও লড়াই-সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। নীলকর জেমস হিল আজ নেই, কিন্তু তার নামে রচিত লোকপ্রবাদ এখনো এতদঞ্চলে শোনা যায় :

জমির শত্তুর নীল
জাতির শত্তুর হিল।

দিনে দিনে কালের স্রোতে হারিয়ে গেছে নদীর স্রোত। মেহেরপুর জেলার কোনো নদীকেই এখন আর নদী মনে হয় না। ভূ-প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে সব নদীই ডানা গুটিয়েছে। কেবল বর্ষাকালের অতি বর্ষণে এই সব নদী আবারও পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে অতি বর্ষণ আর বন্যার সুযোগে এই শুষ্কপ্রায় নদ-নদী, খাল-বিল জাগ্রত এক সত্তায় উদ্ভাসিত হয়েছে; পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আগ্রাসী অগ্রযাত্রা রুখে দাঁড়িয়েছে, বুকের বিস্তার দিয়ে গড়েছে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ; এ অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে নদীই যেন

www.pathagar.com

বা হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় ফ্রন্ট। মেহেরপুরের নদীগুলোর বহুবিচিত্র বর্ণময় অতীত আছে, উজ্জ্বল বর্তমান নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রধান-অপ্রধান নদীর বহু শাখা-প্রশাখা প্রবাহিত হয়েছে মেহেরপুরের উপর দিয়ে। কিন্তু সব নদীই আজ মৃতপ্রায়। নদীর বুকে পলি জমতে জমতে জন্ম নিয়েছে এ অঞ্চলের উর্বরা পললভূমি। নদীতে নাব্যতা নেই, তবু এ জেলার উলেখযোগ্য নদীখাতগুলোর বিবরণ এবং সেই সঙ্গে নদীখাতগুলোর প্রভাব কেমন করে এতদঞ্চলের লোকসংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে নিম্নে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ভৈরব নদী

মেহেরপুর জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান নদী ভৈরব। জলাঙ্গী ও চন্দনা নামে যে সহোদরা নদী প্রমত্তা পদ্মা থেকে বেরিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে, তারই এক শাখানদী জলাঙ্গী একদা (পশ্চিমবঙ্গে) ভৈরব নামে প্রবাহিত হয়ে মেহেরপুর জেলার শোলমারিতে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অতপর দীর্ঘ ৩৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে স্পর্শ করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে, ভৈরব একটি তীর্থ নদ। ...এক সময় ইহা নামের অনুরূপ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে বিরাজ করিত। সেই ভয়ঙ্কর রূপ যখন ছিল, তখন ভৈরব পশ্চিম বাংলার মুরটি গ্রামের পাশ দিয়ে জলাঙ্গী নদীতে প্রধান উৎসস্থল হিসেবে রেখে শোলমারি গ্রামে সীমান্ত পেরিয়ে মেহেরপুর জেলার কাথুলি, কুতুবপুর, গোভীপুর, মেহেরপুর, যাদবপুর, রাধাকান্তপুর, মোনাখালি, দারিয়াপুর, বলভপুর, রতনপুর, রসিকপুর, কার্পাসডাঙ্গা হয়ে দর্শনার কাছে মাথাভাঙ্গা নদীকে অতিক্রম করে যশোরের বারোবাজার হয়ে খুলনার রূপসার সঙ্গে মিশে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

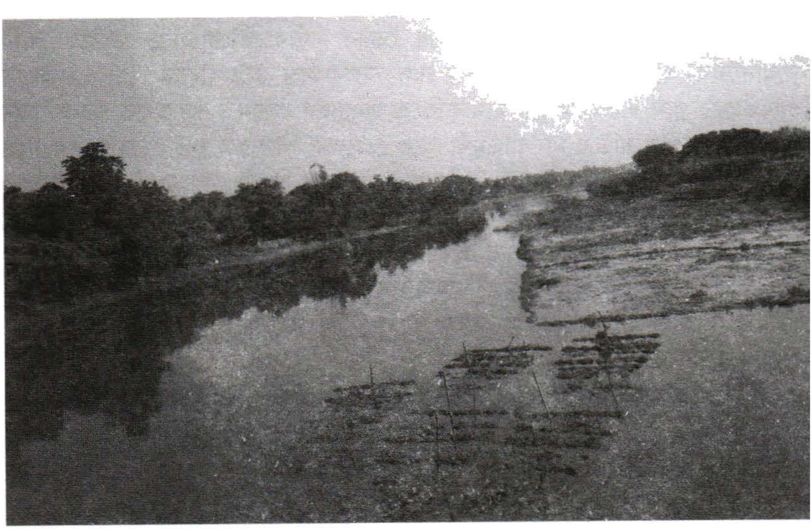

ভৈরব নদী

www.pathagar.com

ভৈরবের যৌবনদিনে নদীপথের সুবিধা পেয়েই একদা যেমন দূর আরবভূমি থেকে ইসলাম ধর্মপ্রচারকেরা এতদঞ্চলে এসেছেন, ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি স্থায়ীভাবে বসবাসও করেছেন; তাদের প্রচারিত ধর্মের বাণী এবং স্থায়ী উপস্থিতি, আচার-আচরণ এ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছে, ঠিক তেমনই ঘটনা ঘটেছে খ্রিষ্টান মিশনারি পাদ্রিদের বেলাতেও। এই ভৈরব নদীপথেই ইউরোপ থেকে মিশনারি সাহেবরা এসে ভৈরব তীরবর্তী বলভপুর, রতনপুর, ভবেরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে গড়ে তোলেন খ্রিষ্টান পল্লি। ধর্মান্তরের পূর্বেও যারা এ অঞ্চলের মানুষ ছিল, ধর্মান্তরের পরে তাদের জীবনাচারে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। দিনে দিনে গড়ে ওঠে মিশ্র এক সংস্কৃতি। হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এ অঞ্চলের মানুষের উদার নৈতিক মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে।

ভৈরব নদী মেহেরপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতেও ভূমিকা পালন করেছে। নদী সন্নিহিত এলাকায় মানুষের জীবনধারণ এবং জীবনযাপনের রীতি পদ্ধতি সব কিছুতেই নদীর প্রভাব পড়ে। ভৈরব তীরবর্তী মেহেরপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। নদীকে ঘিরেই গড়ে ওঠে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। যেমন ভৈরব তীরবর্তী কাথুলি-কুতুবপুরের জেলে সম্প্রদায় বৃহস্পতিবার মধ্যদুপুরে ধরা মাছ কিছুতেই নিজেরা খায় না। তাদের বিশ্বাস—এর ফলে অকল্যাণ হয়। এমন কি ওই সময় তারা নৌকা বাইতেও রাজি নয়। প্রায় দুআড়াইশ বছর পূর্বে কাথুলির ভৈরবতীরে নির্মিত শিবমন্দির এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুমান করা হয় রাজা গোয়ালা চৌধুরীর শাসনামলে মেহেরপুরের বিভিন্ন প্রান্তে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বেশ কয়েকটি শিবমন্দির তৈরি হয়। আলমপুর, শ্যামপুর, বলভপুর, কাথুলি প্রভৃতি স্থানে নির্মিত এ সব মন্দিরের গায়ের ইটে যে টেরাকোটার কাজ দেখতে পাওয়া যায়, তা সে আমলের স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন বহন করে চলেছে। কুতুবপুরে ভৈরব নদীর তীরে গড়ে উঠেছে স্বামী নিগমানন্দের আশ্রম। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮০ সালে ভৈরবতীরের গ্রাম রাধাকান্তপুরে মামাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হবার পর সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কার ঘটিয়ে মানবাভিমুখী করে তোলেন, পিতৃভূমি কুতুবপুরে আশ্রম গড়ে তোলেন। বাংলাদেশ তো বটেই, ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বর্ধমান, পুরুলিয়া, হাওড়া প্রভৃতি স্থান থেকে কৌতূহলী মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভৈরব নদীপথেই ভূ-ভারতের হাজার হাজার মানুষ কুতুবপুরে আসেন, তাঁরা আবার নিজ এলাকায় স্বামী নিগামনন্দের মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ভৈরবের ঢেউয়ের সঙ্গে নিগামনন্দের মানবতাবাদী দর্শনের হাওয়া যুক্ত হয়ে এতদঞ্চলের মানুষের মনে উদার নৈতিকতার প্রভাব পড়ে।

নিগমানন্দ সরস্বতীর উদ্যোগেই কাথুলিতে গড়ে ওঠে উচ্চ বিদ্যালয়। নদীপথে বহু দূর-দূরান্তের ছাত্ররা এখানে এসে ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে সে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নেই। দেশ বিভাগের পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ভৈরব নদীর পশ্চিমপারের গ্রামগুলোতে উদার লোকধর্মের চর্চা শুরু হয় প্রায় দুআড়াইশ বছর আগে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের অবজ্ঞা ও ঘৃণা সাধারণ মানুষকে মানবিক

www.pathagar.com

চেতনা সমৃদ্ধ লোকধর্ম খুঁজে নিতে বাধ্য করে। সাধারণ মানুষেরা সাধনভজনের তত্ত্বকথা বুঝে অথবা না বুঝেই হোক বাউল আশ্রমের লোকধর্মের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজেছে, মানুষ ভজে মুক্তির পথ খুঁজেছে। সে কারণেই ভৈরবের পশ্চিমে ইছাখালিতে আরজান শাহ, রাজাপুরে চেরাগ শাহ, ফতেপুরে দৌলত শাহ, ঝাঁ ঝাঁ হরিরামপুরে আজমত শাহ উদার মানবতার বাণী ছড়িয়ে আলোকিত করেছেন এ অঞ্চলের মানুষের মনের আঁধার। বিশেষ করে ভৈরবপারে যাদবপুরের কালী শাহর (কলিম উদ্দীন শাহ) কথা এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়। তাঁর আশ্রমের শীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছে দূর-দূরান্তের নানান রকম মানুষ। তারা জাতপাত খোঁজেনি, খুঁজেছে 'ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার' সেই মানুষকে।

মেহেরপুরের মলিক-মুখুজ্যে উভয় জমিদার পরিবারে ছিল সংস্কৃতিচর্চার রেওয়াজ। মল্লিকবাড়ির আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত নাটমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনো সে কথাই ঘোষণা করে। ভৈরববক্ষে ভেসে কলকাতা থেকে অনেক আমন্ত্রিত অতিথিও যেমন মেহেরপুরের নাটক উপভোগ করতে আসতেন, তেমনি সেকালের নামি-দামি অনেক অভিনেত্রীও এখানে এসেছেন ভৈরব নদীপথেই। শুধু মেহেরপুর শহরেই নয়, ভৈরব তীরবর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম সোনাখালি, রাধাকান্তপুর, দারিয়াপুর প্রভৃতি স্থানে সেই দুশ বছর আগেই চলত নাট্যচর্চা। গ্রামীণ সংস্কৃতি বিনির্মাণে এ ধরনের নাট্যচর্চা, নানান রকম খেলাধুলাচর্চার ভূমিকা ছিল অনন্য। ভৈরব এখন মরা নদী বটে, এক সময় এই নদীতেই আয়োজন হতো বিশাল নৌকাবাইচের। দুপারের গ্রামবাসী আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে উপভোগ করেছে ঢ্যাসে বাইচ।

ভৈরবের দক্ষিণমুখী অভিযাত্রায় বলভপুরে এসে খানিকটা দিকবদল ঘটে। কিছুটা পূর্বদিকে মোড় নিয়ে ভৈরব এগিয়ে চলে বাগোয়ান, রতনপুর, রসিকপুরের পাশ দিয়ে, বোয়ালমারী পৌঁছে উত্তরদিকে মহাজনপুর থেকে আশরাফপুর পর্যন্ত গিয়ে আবারও পূর্বমুখী হয়ে মেহেরপুর জেলা ছেড়ে প্রবেশ করে চুয়াডাঙ্গা জেলায়। এতদঞ্চলের অনেক পুরনো দিনের শিক্ষিত মানুষ অনুমান করেন, অন্নদামঙ্গল কাব্যের ঈশ্বর পাটনী রতনপুর কিংবা রসিকপুর ঘাটের খেয়ামাঝি ছিলেন।

ভৈরবপারের গ্রাম কুতুবপুর থেকে ১৯২৬ সালে নিগমানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে মাসিক পত্রিকা 'আর্যদর্পণ' প্রকাশিত হয়। দারিয়াপুরে শুধু নাট্যচর্চা নয়, নিয়মিত সাহিত্যচর্চাও হয়। অমরেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় অনিয়মিত মাসিক পত্রিকা 'পল্লিশ্রী' প্রকাশিত হয় ১৯৩৫-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই ভৈরবপারে নদীয়া সাহিত্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। জলাঙ্গী থেকে ভৈরবের উৎপত্তিস্থলে পলিজ অবক্ষেপন জমে নদী হিসেবে নাব্যতা হারিয়েছে অনেক আগেই, তবে এই ভৈরব এতদঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে মেহেরপুর শহরে ভৈরব সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী নামের একটি সংগঠন দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিয়ে আসছে।

মাথাভাঙ্গা

ভৈরবের পর মেহেরপুরের উল্লেখযোগ্য নদী হচ্ছে মাথাভাঙ্গা। মাথাভাঙ্গাই পদ্মার দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা। বিচিত্র এই নদীর গতিপথ, দুচারটি গ্রাম পেরোলেই তার নাম

www.pathagar.com

পাল্টে যায়, স্বভাবও যায় খানিকটা বদলে। অবশ্য মেহেরপুর জেলাবাসীর সঙ্গে এ নদীর সম্পর্ক ততটা নিবিড় নয়। বরং বলা যায় দূর আত্মীয়ের মতো। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার উত্তরে জলাঙ্গী নদীর উৎসমুখের প্রায় ১৬ কিলোমিটার পূর্বে পদ্মা থেকে উৎসারিত হয়ে দর্শনার পাশ দিয়ে চুয়াডাঙ্গা হয়ে আলমডাঙ্গা স্টেশনের আট কিলোমিটার পশ্চিমে এসে কুমার ও মাথাভাঙ্গা নামে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে। তারই একটি শাখার সঙ্গে মিলিত হয়েছে দৌলতপুর থানার মধ্য থেকে কাজীপুর ও মঠমুড়া ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম ছুঁয়ে বেরিয়ে আসা মাথাভাঙ্গা নদীর ধারা। এ নদী মেহেরপুর, কুষ্টিয়া এবং চুয়াডাঙ্গা তিনটি জেলারই স্পর্শ পেয়েছে। মাথাভাঙ্গার জলবেষ্টনীই মেহেরপুর এবং কুষ্টিয়া জেলার মধ্যে সীমানা প্রাচীরের কাজ করেছে। এ দুটি জেলার মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র সড়কটিতে খলিশাকুন্ডি নামক স্থানে মাথাভাঙ্গা নদী পারাপারের জন্যে শতাব্দীব্যাপী খেয়া নৌকার প্রচলন ছিল, পরে কাঠের পুল, তারও পরে বেইলি ব্রিজ এবং বর্তমানে কংক্রিটের স্থায়ী সেতু নির্মিত হয়েছে। কিন্তু মাথাভাঙ্গার দুইপারের মানুষের মুখে মুখে একদা এই খেয়া পারাপার নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য লোকগীতি। নদীর দুই পারেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় অসংখ্য লালনভক্ত মানবতাবাদী মরমি কবি : খলিশাকুন্ডির রব ফকির, আকবপুরের মাতু বিশ্বাস এবং গোয়ালগ্রামের গোলাম রব্বানী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরাই গানে গানে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সঞ্চারিত করেছেন। মাথাভাঙ্গা নদী গাংনী উপজেলার চরগোয়ালগ্রাম নামক গ্রামের কাছে এসে ইংরেজি 'U' (ইউ) আকৃতি ধারণ করে প্রবাহিত হওয়ার কারণে এক জায়গায় নদীকে উত্তর-প্রবাহী মনে হয়। তাই এই স্থানটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র স্থানের এবং এখানকার নদীর জল পবিত্র গঙ্গাজলের মর্যাদালাভ করে। তাই ঐ লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন জায়গার হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এই গোয়ালগ্রামে এসে মাথাভাঙ্গায় নেমেই গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করতেন। এ উপলক্ষে গোয়ালগ্রামে নদীপারে মাসব্যাপী যে স্নানযাত্রার মেলা হতো, তাতে সানন্দে অংশগ্রহণ করত হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। উৎসবমুখর হয়ে উঠত মাথাভাঙ্গাপারের জনজীবন। এই মাথাভাঙ্গাপারেই গড়ে ওঠে হারু সর্দার, ছেরু সর্দারের দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে লাঠি চালিয়ে ব্রিটিশ সরকারের রায়ে তারা সাজা ভোগ করেছেন, কিন্তু কিছুতেই লাঠি ত্যাগ করেননি। লাঠিখেলাকে জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, গোয়ালগ্রামের লাঠিয়ালরা তাদের মধ্যে অন্যতম।

শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেললাইন চালু (১৮৬২) হবার পূর্বে মাথাভাঙ্গা নদীপথেই কলকাতার সঙ্গে কুষ্টিয়া অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের যাবতীয় নীলকর এই নদীপথেই তাদের নীল কলকাতায় পাঠাত। ব্রিটিশ আমলেই মাথাভাঙ্গা নদী নাব্যতা হারাতে থাকে। ফলে নীলকররা পড়ে সংকটে। সরকারের কাছে দেনদরবার করে তারা ১৮২০ সালে মাথাভাঙ্গা সংস্কারেরও উদ্যোগ নেয়। উইলিয়াম হান্টারের এক প্রতিবেদনে জানা যায় রবিনসন এবং মে নামক দুজন নদী সংস্কারকের ছয় বছরের প্রচেষ্টাতেও বিশেষ কোনো ফল হয়নি। পরে আর কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। দিনে দিনে পলি জমার কারণে

www.pathagar.com

মাথাভাঙ্গার বুক অনেকাংশে ভরাট হয়ে এলেও এ নদীর মূল প্রবাহ এখনো সামান্য গতিশীল রয়েছে। আর এই নদী সন্নিহিত এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে এখনো প্রভাব বিস্তার করে চলেছে এই মৃতপ্রায় নদী।

কাজলা

মেহেরপুর জেলার ছোট এক নদীর নাম কাজলা। এ নদীর উৎপত্তি এবং বিস্তার গাংনী উপজেলার মধ্যেই সীমিত। কাজীপুর ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা নদী থেকে বেরিয়ে এ নদী নওপাড়া, ভাটপাড়া, সাহারবাটি, শ্যামপুর, গাড়াডোব হয়ে আমঝুপিতে বাঁক বদল করে এক সময় মিলিত হয় ভৈরবের সঙ্গে। কাজলা নদীর দুই পারের বিভিন্ন গ্রামে ইংরেজ নীলকরেরা গড়ে তোলে অনেকগুলো নীলকুঠি। তার মধ্যে আমঝুপি নীলকুঠি রক্ষণাবেক্ষণ সরকারিভাবে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে হলেও অন্যান্য কুঠি বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার পথে। তবে ভাটপাড়ায় অবস্থিত দ্বিতল কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র নদীটির নাব্যতা অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। এখন পুরো কাজলার বুকেই চাষাবাদ হয়। তবু এই এলাকার লোককবি কাজলার অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে ছড়া কাটে, গান বাঁধে, এমন কি এ কালের কবিও লেখেন স্মৃতি জাগানিয়া নানান কবিতা। প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে সাহারবাটি গ্রামের গীতিকবি আব্দুল হামিদের একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

নাও ভাসিয়ে যেয়ো মাঝি
কাজলা নদীর জলে
কলসি কাঁখে আসবো আমি
  জল ভরনের ছলে॥
পাল উড়ায়ে পূবাল বায়ে
নাও ভিড়ায়ো অচিন গাঁয়ে
ফুল-ফসলে ভরা সে গাঁ
  চন্দ্রতারায় জ্বলে॥
সেই না গাঁয়ের বটের তলে রাখাল বন্ধুর বাঁশি
পরান আমার আকুল করে গলে পরায় ফাঁসি।
মধুঝরা পাখির গানে
ঢেউ খেলে গো অবুঝ প্রাণে
সেই গাঁয়েতে যেতে শুধু
  মনটা আমার বলে॥

আবার এই কাজলা নদীকে নিয়ে আধুনিক কালের কবি রফিকুর রশীদ লিখেছেন অসামান্য কিশোর কবিতা। কবির শৈশব-কৈশোর জোড়া অনেক স্মৃতির সংগী কাজলা নদীকে নিয়ে লেখা কবিতার অংশবিশেষ এ রকম:

দূর আকাশের পাখিদের আমি শুধাই দুহাত নেড়ে
বলতে পারিস কাজলা কোথায়? কেন সে গিয়েছে ছেড়ে?

www.pathagar.com

কাজলার কথা মনে নেই বুঝি! কাজলা নামের নদী
এই যে এখানে একদা নীরবে বয়ে যেত নিরবধি ।
হোক ছোট নদী, তবু তার সাথে কত ছিল মাখামাখি
শৈশব জোড়া স্মৃতির পসরা বলতো কোথায় রাখি!
হায় প্রিয় নদী, খেয়ালি কাজলা, কোনো অভিমানে তুই
কোন সুদূরে চলে গেলি বল, এত ব্যথা কোথা থুই?
নদী যদি শুধু নদীই হতোরে কথা ছিল নাকো মোটে
তোরই স্মৃতি আজো বুকের বাগানে শত ফুল হয়ে ফোটে ।
তুই ছিলি প্রিয় বন্ধু আমার সারাটি কিশোরবেলা
এত স্মৃতি আছে তোরই সাথে মিশে, কিছুই যায় না ফেলা!
(কাজলা আমার : আকাশ জোড়া মায়ের আঁচল)

ছেউটি

মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অপর একটি ছোট নদীর নাম ছেউটি নদী । স্থানীয় মানুষ বলে মরা গাঙ । ছেউটি মূলত মাথাভাঙ্গারই একটি ক্ষীণকায় শাখা । এ নদীর দুই প্রান্তই এখন মৃত । মাথাভাঙ্গা নদীর সরু একটি শাখা করমদি গোঁসাইডুবি পাড়ার কাছে ইছামতি নামে একদা বেরিয়ে এসে দেবীপুর হয়ে চলে যায় তেরাইলে । সেখান থেকে 'ছেউটি' নাম ধারণ করে মালসাদহ, হাড়িয়াদহ, মহিষাখোলা, বারাদি গ্রামের পাশ দিয়ে দীনদত্তের কাছে এসে আবারও মাথাভাঙ্গায় পড়ে । এ নদীর দক্ষিণের এই মুখটিও বহু আগেই পলি ভরাট হয়ে রুদ্ধ হয়ে গেছে । অথচ এই ছেউটি পারের প্রবীণ মানুষেরা এখনো একটি প্রবাদ মুখে মুখে বয়ে চলেছে 'ছেউটে তো নয় কেউটে ।' একদা হয়তো ছেউটি নদীর উন্মত্ত ঢেউ কেউটে সাপের মতো ফণা তুলতো । জনশ্রুতি আছে, এই নদীতে বাণিজ্যবহর ভাসিয়ে চাঁদ সওদাগর নাকি এসেছিলেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে । চাঁদ বেনে কন্যার ইচ্ছা পূরণের জন্যে এক রাত এক দিনের মধ্যে যে বিশাল পুকুর খনন করিয়েছিলেন, সেই পুকুরপাড়ে গড়ে ওঠা গ্রামের নাম হয়েছে বেনেপুকুর বা বানিয়াপুকুর ।

খাল-বিল

বস্তুতপক্ষে, মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আর কোনো প্রবহমান জীবিত নদী নেই বললেই চলে । আছে কেবল নদীর স্মৃতি । আছে নদী নিয়ে নানা লোকবিশ্বাস, জনশ্রুতি । তবে একথা সত্যি—প্রাকৃতিক বৈরিতার কারণে বর্তমানে এ জেলা নদীশূন্য হয়ে পড়লেও একদা এ অঞ্চলে জনবসতি গড়ে উঠেছে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরকে ঘিরে, আবার এই নদীপথেই বহু দূরদূরান্ত থেকে এখানে এসেছে ধর্মের সুমহান আহ্বান, এসেছে বাইরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে খুলে গেছে সম্ভাবনার দুয়ার । প্রধানত ভৈরবই পালন করেছে এ দায়িত্ব । মেহেরপুরের অদূরের একটি গ্রামের নাম 'বন্দর'ই প্রমাণ করে যে, ভৈরব তীরবর্তী এই স্থানে দেশি-বিদেশি বাণিজ্যতরী বা জাহাজ এসে নোঙর করত । হয়তো এখানেই গড়ে ওঠে ব্যবসা-

www.pathagar.com

বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। অন্যান্য নদীগুলো পলি অবলেপনের মাধ্যমে ভূ-প্রকৃতিতে আনে পরিবর্তন, শক্ত মাটির উপরে জনবসতি গড়ে তোলার সুযোগ করে দেয়। পলি ভরাটের মধ্য দিয়ে নদী শুকিয়ে খাল-বিল-দহ-ডামোশ হয়, তার চতুর্দিকেও গড়ে ওঠে জনবসতি। এই ধরনের গ্রামগুলো উত্তর-দক্ষিণে লম্বা না হয়ে আকৃতিতে হয় গোলাকার বা চতুর্ভূজ। আর যেখানেই জনবসতি, সেখানেই ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি সব মিলিয়ে মানুষের জীবনযাপন।

মেহেরপুর জেলায় যেমন পুকুরপাড়ে গড়ে ওঠা গ্রামের নাম হয়েছে বানিয়াপুকুর, জোড়পুকুর কিংবা পদ্মপুকুর, তেমনি আবার বড় বড় খাল-বিলকে ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রামের নাম হয়েছে চাঁদবিল, নোনার বিল, পদ্মবিল, পাটাপুকুরবিল প্রভৃতি। পুকুর বা বিলের নামে শুধু জনবসতি গড়ে গ্রাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা-ই নয়, লোকমুখে চলতে চলতে নানা রকম কিংবদন্তিও সৃষ্টি হয়েছে এইসব পুকুর-খাল-বিল নিয়ে। রচিত হয়েছে অনেক রকম লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার। গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের ৭৬ বিঘা আয়তনের পদ্মবিল। এই বিলের সৌন্দর্যমুগ্ধ মাইলমারীর অশীতিপর পল্লিকবি ছহির উদ্দীন পদ্মবিলের স্মৃতি নিয়ে রচনা করেছেন অনবদ্য কবিতা। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

উদাসী পথিক চলেছ কোথায় একবার শোনো ভাই
সবিনয়ে জানাই একবার এসো মাইলমারী গাঁয়।
যেথায় দেখিবে ছোট গ্রামখানি পদ্মবিলের তীরে
সেথায় তুমি একটু এসো—আমার মাথার কিরে।
হরেক রকম দৃশ্য দেখে ভরে যাবে তব মন
পদ্মফুলের ঝিকিমিকি আর অলিদের গুঞ্জন।
সকালে বিকালে কুলবধূরা কলসি ভরে জলে
সখীটারে তার ইশারাতে ডেকে মনের কথাটি বলে।
ক্ষণে ক্ষণে এই জলপিপি আর বালিহাঁসেদের খেলা
পানকৌড়ি আর মাছরাঙাগুলো ডুব দেয় সারাবেলা
দুপুরের কালে বিলের ঐ কূলে বাউলের সেই গান
উদাসী হাওয়ায় ভেসে চলে যায় আকুল করিয়া প্রাণ।
সন্ধ্যার ক্ষণে ঐ দূর বনে ডাহুক বসিয়া ভাই
ডাহুকিরে তার ডাকে ঘন ঘন কুহু কুহু কহু রাই।
আসিবে যে ভাই আসিবে গো তুমি আমাদের এই গ্রামে
ওমরের মতো উদার হয়ে পরিচিত ধরাধামে।

চ. শিক্ষার হার

শিক্ষাক্ষেত্রে মেহেরপুর জেলার অবস্থান অত্যন্ত পশ্চাদপদ। সীমান্তবর্তী এই জেলার হিন্দু অধিবাসীদের অনেকেই ছিল শিক্ষিত। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা দেশত্যাগ করার ফলে এ জেলার শিক্ষার হার সহসাই বেশ নিম্নগামী

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে। তারপর দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনামলে ধীরে ধীরে শিক্ষার কিছুটা বিস্তারলাভ ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কারণে এ জেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো অনেকাংশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে পিছিয়ে পড়া এই জনপদেও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৮.৪০ ভাগ। এর মধ্যে পুরুষ ৪০.৮০ এবং মহিলা ৩৫.৯০%। শতকরা হারে মেয়েরা খানিকটা পিছিয়ে থাকলেও শিক্ষার গুণগত মানের বিবেচনায় সাম্প্রতিক সময়ে এ ক্ষেত্রে মেয়েদের উৎকর্ষ এবং সাফল্য বিশেষভাবে নজরে পড়ে। নিম্নে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার শিক্ষাচিত্র তুলে ধরা হলো :

উপজেলা	শিক্ষার হার	পুরুষশিক্ষা	নারীশিক্ষা
গাংনী	৩৬.৫০%	৩৮.৭০%	৩৪.১০%
মুজিবনগর	৪০.২০%	৪১.৫০%	৩৯.৭০%
মেহেরপুর	৩৮.৪০%	৪০.৮০%	৩৫.৯০%

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

ভৈরবের পূর্বপারে গড়ে ওঠে পুরানো শহর মেহেরপুর। মেহেরপুরের প্রাচীন দালানকোঠা এবং তার স্থাপত্যশৈলী এ শহরের প্রাচীনত্বেরই পরিচয় বহন করে। ১৮৬৯ সালে যে শহর পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে, তার প্রাথমিক স্তর নিশ্চয় অনেক আগেই রচিত হয়ে থাকবে। দীনেন্দ্রকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখের রচনায় মেহেরপুর শহরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা বেশ চমকপ্রদ। মল্লিক আর মুখুজ্যে—দুই প্রতাপশালী জমিদারের বাস ছিল মেহেরপুরে। মল্লিকবাড়িতে পাহারাদারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন বলরাম হাড়ি। ভৈরবতীরে মালোপাড়ায় তার জন্ম, বেড়ে ওঠা। কথিত আছে, জমিদার মল্লিকের দেওয়া মিথ্যে অপবাদ এবং ব্রাহ্মণদের বৈষম্যমূলক আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ঘর ছাড়েন তিনি। বহু বছর পর আবার যখন মেহেরপুরে ফেরেন তখন তিনি অন্য বলরাম, অন্তজ শ্রেণির অবহেলিত অস্পৃশ্য মানুষের জন্য নতুন এক লৌকিক ধর্মমতের প্রবর্তক তিনি। ভৈরবপারেই গড়ে ওঠে তাঁর আশ্রম। ভক্ত-শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে ওঠে দ্রুত। পশ্চিম বাংলার নিশ্চিন্তপুরসহ বহু গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর ধর্মমত। মালোপাড়ার এই আশ্রম এবং সমাধিমন্দিরকে ঘিরে প্রত্যেক বারুণী তিথিতে বিরাট মেলা হয়।

ভাষা, সাহিত্য, সংগীতের মতো স্থাপত্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প ও প্রত্ন নির্দশনের মধ্য দিয়েও একটি জনপদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মবোধ ও বিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য এ অঞ্চলের লোকজীবনের আচার-আচরণে পার্থক্য দেখা যায়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হিন্দু-সংস্কৃতি ও

www.pathagar.com

মুসলমান-সংস্কৃতির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মেহেরপুর অঞ্চলের স্থাপত্য ও প্রত্ন নিদর্শন বিশ্লেষণ করলে এ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। "মুসলমানদের কাছে স্রষ্টা রূপে নয়, অরূপেই আরাধ্য। কিন্তু হিন্দুরা সাকার ও বহু দেবতাবাদে বিশ্বাসী। দেবালয় হতে দেবমূর্তি, পূজারতি, নৈবেদ্য ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের ধর্মাচারে বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায়। মসজিদ ইসলাম ধর্মচর্চার পবিত্র স্থান। মসজিদের নির্মাণশৈলী মন্দির থেকে ভিন্ন। এতে কোনো দেব মূর্তি অঙ্কিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফুলফল, লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা অথবা ক্যালিওগ্রাফির কারুকার্য খচিত হয়। এগুলো মুসলিম সংস্কৃতির অঙ্গ।...ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানবমন স্ব স্ব বিধি বিধান ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী মসজিদ, মন্দির ও মঠের গঠন প্রক্রিয়া ও পরিবেশ গড়ে তুলেছে, এগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটেছে।"[৭] মেহেরপুর জেলার স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর নির্মাণ কৌশল ও গঠন পদ্ধতি এবং এসবের গাত্রে অঙ্কিত কারুকার্য বিশ্লেষণ করে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা যায়। এ জেলায় বৌদ্ধ যুগের কোনো প্রত্ন নিদর্শন নাই তবে পাল, সেন ও নবাবি আমলের প্রত্ন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। মেহেরপুর শহর থেকে ৮ কিমি. দক্ষিণে আমদহ গ্রামে প্রায় এক বর্গমাইলের স্থাপত্যকীর্তির নিদর্শন পাওয়া গেছে। পশ্চিমে নদীখাত, যা এক সময় প্রবহমান ছিল। প্রত্নস্থলের চারিদিকে এক সময় পরিখা ছিল, কিন্তু পরিখার পর প্রাচীর বেষ্টনী ছিল না।

বীরু মোল্লার মসজিদ

www.pathagar.com

বর্তমানে প্রত্নস্থানটি কৃষিজমিতে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য পোড়ামাটির টালি ইট, ভাটা ইট জমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রত্নস্থলটি খনন করা হলে এর স্থাপত্যশৈলীসহ এ অঞ্চলের লোকজীবন ও সংস্কৃতির নানা অজানা দিক উন্মোচন করা সম্ভব হতো। "আমদহের স্থাপত্য কীর্তির ধ্বংসাবশেষকে গোয়াল চৌধুরীর সাথে বর্গী দস্যুদের যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসগৃহ বলে মনে করা হয়।"[৮]

মেহেরপুর শহর থেকে ১৫ কিমি. দক্ষিণে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামে নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬-১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে সাতটি শিবমন্দির এবং তৎসন্নিকটে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এক বিঘা পরিমাণ জমির উপর অবস্থিত এই মন্দিরটি এখন পোড়ামাটির টালি ইটে পরিপূর্ণ। মন্দিরটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে এর আকার-আয়তন নির্ণয় করা মুশকিল। তবে বর্গাকৃতির মন্দিরটির আয়তন ছিল ১৬×১৬ ফুট এবং দেওয়ালগুলো ছিল ৩$^{১}/_{২}$ ফুট প্রশস্ত। স্থানীয় অধিবাসীরা জানায় বল্লভপুর মন্দির নানা আকৃতির টেরাকোটা ইট দিয়ে তৈরি। মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত আছে পদ্মফুল, নৃত্যরত যুবতীসহ বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবেত্তাগণ মন্দিরটিকে শিবমন্দির হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এটি বৌদ্ধ মন্দির কিংবা নাথযোগী সম্প্রদায়ের উপাসনালয়ও নয়। তাছাড়া মন্দিরের শিখর দেশের ত্রিশূল প্রমাণ করে যে, এগুলো ছিল শিবমন্দির। এতে প্রতীয়মান হয়, নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার ও সভাষদবর্গ শিবের উপাসক ছিলেন কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুরা শিবের পূজারী ছিলেন না, পরবর্তীকালে তারা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। "১৮৪০ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত সময়ে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর এবং খাস কলকাতা মহানগরে... সব শ্রেণির হিন্দু ও গরিব মুসলমানকে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।"[৯]

ফলে বল্লভপুর, ভবরপাড়া, রতনপুর, কার্পাসডাঙ্গা খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়। মিশনারিদের সহায়তায় এই তিন গ্রামে পাশ্চাত্য স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে চার্চ স্থাপন করা হয়। বল্লভপুর গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত মেহেরপুরের প্রাচীনতম জনপদ বাগোয়ান গ্রাম। এ গ্রামের সন্তান ভবানন্দ মজুমদার ছিলেন নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এ গ্রামে রয়েছে নদীয়ারাজের পূর্বসূরি জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের পোড়ামাটি দ্বারা নির্মিত আট চালা শিবমন্দির। এছাড়াও রয়েছে দরবেশ খানজাহান আলীর সমসময়ে প্রতিষ্ঠিত শেখ ফরিদের দরগা। এটিই এ অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন।

মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ার বলরামের সমাধিমন্দির, মেহেরপুর-কাথুলী সড়কে রাজা গোয়ালা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত আঠারো শতকের আট চালা শিবমন্দির (বর্তমানে নিগমান্দ সরস্বতীর অনুসারীদের সারস্বত আশ্রম), নায়েব বাড়িমন্দির প্রভৃতি প্রত্ন নিদর্শনে আঠারো শতকের হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছাপ লক্ষ করা যায়। পাল, সেন, মোগল এবং ইংরেজ আমলে স্থানীয় জমিদার, অমাত্যবর্গ, রাজকর্মচারী, ফকির-দরবেশ এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের উদ্যোগে মেহেরপুরের গ্রামেগঞ্জে স্থাপত্যশিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। নির্মাণশৈলী, অলংকরণ ও পদ্ধতিতে মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের সাথে হিন্দু

www.pathagar.com

স্থাপত্যশিল্পের বিস্তর ফারাক রয়েছে, তথাপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের মিলও আছে। মসজিদের সাথে মন্দিরকে ফারাক করার জন্য নির্মাতারা গম্বুজ বর্জন করেছেন, কিন্তু বাংলা চালাঘরের আদলকে ত্যাগ করতে পারেননি। হিন্দু ও মুসলিম নির্মাতারা বাংলা চালাঘরের আদলে মসজিদ, মন্দির ও দরগা নির্মাণ করেছেন। মেহেরপুর বড়বাজারের শাহ ভালাই-এর দ্বিতীয় দরগা এবং পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার দরগাকে কাঠামো ও কারুকার্যের দিক দিয়ে মন্দির থেকে আলাদা ভাবা যায় না। বঙ্গীয় অলংকার ও স্টাইল হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের মতো মুসলিম স্থাপত্যশিল্পকেও প্রভাবিত করেছে।

ইংরেজ আমলে নির্মিত বল্লভপুর চার্চ (১৮৪৭), ভবরপাড়া রোমান ক্যাথলিক চার্চের (১৯২৪) নির্মাণশৈলী ও রীতিতে পাশ্চাত্য রীতি অনুসরণ করা হয়নি। তবে এতে প্রযুক্তি, অলংকরণ ও স্টাইলে দেশীয় রীতির সাথে পাশ্চাত্য রীতির সমন্বয় ঘটেছে। ১৮৬১ সালের আদমশুমারি অনুসারে মেহেরপুর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হলেও এ অঞ্চলে কোনো প্রাচীন মসজিদ বা মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের বীরু মোল্লার কারুকার্য মণ্ডিত মসজিদটি আঠারো শতকের মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন হিসেবে টিকে আছে। মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ হওয়ায় তারা মসজিদ কিংবা ধর্ম প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে পারেনি। W.W Hunter-এর 'A Statistical Account of Bengal' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, নদীয়া তথা মেহেরপুর অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন প্রান্তিক চাষি, ক্ষেতমজুর, জেলে, তাঁতি, কলু (তেল প্রস্তুতকারক), নলুয়া (মাদুর প্রস্তুতকারক) প্রভৃতি। এ থেকে বোঝা যায় যে, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা এবং নিম্নবর্গীয় শ্রেণির আধিক্যের কারণে মেহেরপুরে মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামি রীতি ও অনুশাসনের সাথে পরিচিত ছিলেন না এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মতো তাঁরাও বিভিন্ন লোকধর্মের অনুসারী ছিলেন। এদের কেউ কেউ লৌকিক পিরদের মাজার বা দরগায় যেতেন। ফলে আর্থসামাজিক কারণেই এ অঞ্চলের মুসলমানরা কোনো ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মাণ করেনি বা করতে পারেনি। তবে বিভিন্ন দরগা এ অঞ্চলের মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছাপ বহন করে চলেছে।

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে মহোত্তম ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আর শ্রেষ্ঠতম অর্জন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মুহূর্তে মেহেরপুরে রচিত হয় ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১-এ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। শপথ গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই আম্রকাননটি পরিণত হয় সংগ্রাম, স্বাধীনতা ও বিজয়ের অবিনাশী স্মারকে। এই আম্রকাননই সেইদিন বাঙালিকে দেখিয়েছে মুক্তির পথ, দান করেছিল বর্বরতা, গণহত্যা আর অন্যায়ের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রদীপ্ত চেতনা। সেদিন মুজিবনগরের ছায়াঢাকা, পাখিডাকা আম্রকানন এক অলৌকিক চেতনায় অবগাহন করে বাঙালিকে শুনিয়েছিল মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার মহামন্ত্র। "মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে সারা বাংলাদেশের অন্য নাম হয়ে উঠেছিল মুজিবনগর। সেই ইতিহাস নির্মাতা মুজিবনগরকে ধারণ করে মেহেরপুর গর্ব ও শ্লাঘা অনুভব করে।"[১০]

কেবল মুক্তিযুদ্ধে নয়, বাঙালির সকল আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিদ্রোহে মেহেরপুরের রয়েছে অনন্য ভূমিকা। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে (১৭৬০-১৮০০) মেহেরপুর-এর সন্ন্যাসী ও ফকির তথা মরমি সাধকেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধসংগ্রামে অংশ নেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দ্বৈত শাসন ও শোষণ, রাজনীতি এবং তীর্থভ্রমণ ও ধর্মানুষ্ঠানের উপর কর আরোপের ফলে ফকির-সন্ন্যাসী এবং কৃষক ও কারিগররা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফকির মজনু শাহ, মুসা শাহ, পরাগল শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সোবহান শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্‌স, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, কৃপানাথ, রামানন্দ গোঁসাই, পীতাম্বর, শ্রীনিবাস প্রমুখ ফকির-সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে ইংরেজ শাসনবিরোধী প্রতিরোধসংগ্রাম গড়ে ওঠে। তবে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মূল নায়ক ও সংগঠক ছিলেন ফকির মজনু শাহ। ১৭৬০ সালে সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলায় ও নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এলাকায় সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ লক্ষ করা যায়।

নদীয়ার কৃষ্ণনগর এলাকায় ফকির-সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তা নিকটবর্তী মেহেরপুরে ছড়িয়ে পড়ে। মেহেরপুরের গাংনী থানার বেতবাড়িয়া গ্রামে এক বিরাট আশ্রম গড়ে তোলেন হিন্দুযোগী ইন্দুভূষণ। তার সাথে বগুড়ার মহাস্থানগড়ের ফকির-সন্ন্যাসীদের যোগাযোগ ছিল। ১৭৭০-৭১ খ্রিষ্টাব্দে ফকির মজনু শাহ বৃহত্তর সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং এসময় বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল বগুড়ার মহাস্থানগড়।[১১]

মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে ফকির-সন্ন্যাসীদের মধ্যে যারা কৃষিকাজ ও কারিগরি পেশাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, তারা মূলত এ আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। এ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই অংশ নিয়েছিলেন। ফকির-সন্ন্যাসীরা এ গণবিদ্রোহের নেতৃত্বে থাকলেও এর চরিত্র ছিল অসাম্প্রদায়িক। এ বিদ্রোহ মেহেরপুরের লোকজীবন ও লোকমানসকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করে।

ওহাবি আন্দোলন (১৮৩১), ফরায়েজি আন্দোলনসহ (১৮৩৮-১৮৪৭) উনিশ শতকের বিভিন্ন ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে মেহেরপুরসহ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, যশোর অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এসব আন্দোলন শুধুমাত্র ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না। বরং ধর্মকে আশ্রয় করে এগুলো ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। সকল ধরনের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত ওহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব সৈয়দ নেসার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) গ্রহণ করলে মেহেরপুর অঞ্চলের মুসলমান চাষিরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এ আন্দোলনের মূল প্রতিপক্ষ হিন্দু জমিদাররা হওয়ায় এটা সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করে এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়।

www.pathagar.com

মেহেরপুরে ওহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন কুমারখালির আফিল উদ্দীন বিশ্বাস ও আজিম উদ্দীন মোল্লা। ওহাবি আন্দোলনের মতো ফরায়েজি আন্দোলন ছিল একটি ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। হাজী শরিয়তুল্লাহ্র নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মুসলমানরা যাতে শুদ্ধভাবে ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। মেহেরপুরসহ যশোর, ফরিদপুর, পাবনা অঞ্চলে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমান চাষিদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে বাগোয়ান, পিরোজপুর, করমদি ছাড়া বেশির ভাগ গ্রামে মসজিদ ছিল না এবং আজান শোনা যেত না। বেশির ভাগ মুসলমান নামাজ পড়তেন না এবং রোজাও রাখতেন না। এছাড়াও জীবনচর্চা ও পোশাক-পরিচ্ছদে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সাথে নিম্নবর্গীয় মুসলমানদের কোনো পার্থক্য ছিল না। অনেক মুসলমানের নাম থেকেও বোঝা যেত না তারা হিন্দু না মুসলমান। পিরোজপুর মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বীরু মোল্লা এবং করমদি গোঁসাইডুবি পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করেন হাজী দশরথ আলী।

ওহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলনের ফলে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে ভক্তিবাদী সহজিয়া ইসলামের স্থলে ইসলামের কট্টরপন্থি ধারা বিস্তার লাভ করে। ফরায়েজি আন্দোলনের অভিঘাতে মেহেরপুর অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান মিলিত ঐতিহ্যের আলোকে গড়ে ওঠা ধর্মের সহিষ্ণু ও সমন্বয়বাদী ধারাটি দুর্বল হয়ে পড়ে।

লড়াই-সংগ্রামের বাতিঘর মেহেরপুরে নীল বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। নদীয়া জেলার চৌগাছা, চুয়াডাঙ্গার শালঘর-মধুয়ার নীল বিদ্রোহের সূচনা হলে মেহেরপুর এলাকার সাধারণ মানুষ ও কৃষকরা এ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং নিজ নিজ এলাকায় নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে প্রবল প্রতিরোধ। মেহেরপুরে নীলকর বিরোধী প্রতিরোধসংগ্রামে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন স্থানীয় জমিদার মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ভাই নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

চুয়াডাঙ্গার কার্পাসডাঙ্গা, ছয় ঘরিয়া, পুড়োপাড়া, ভালাইপুরে কুঠি স্থাপনের পর মেহেরপুর দখল করতে এলে নিশ্চিন্তপুর কনসার্ণের নীলকর জেমস হিলকে বাধা দেন মুখুজ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে মেহেরপুরের কৃষকরা। "মথুর বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবকৃষ্ণ বাবু গ্রামস্থ রামমোহন মৈত্র, ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বুদ্ধিমান ও বলশালী লোকের সহায়তায় বহু সুশিক্ষিত অস্ত্রধারী ও বরকন্দাজ সৈন্য লইয়া দ্বাদশ বর্ষ জেমস হিলকে মেহেরপুর বেদখল রাখিয়াছিলেন।"[১২]

নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ১২৬০ বঙ্গাব্দে জেমস হিল মেহেরপুর অঞ্চল দখল করে নেন এবং নীলকুঠি স্থাপন করে কৃষকদের উপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করেন। আমঝুপি, রসিকপুর, রতনপুর, ভাটপাড়া, সিদুরকোটা, তেরাইল, ষোলোটাকা, কসবা, ভাটপাড়া প্রভৃতি গ্রামে কুঠি স্থাপন করা হয়। নিষ্ঠুর প্রজাপীড়ক ছিলেন জেমস হিলের মন্ত্রী মহেশ মুখোপাধ্যায় যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে 'মহেশ গুপে' নামে খ্যাত। মেহেরপুর অঞ্চলে জেমস হিলকে নিয়ে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে :

www.pathagar.com

'কাজের শত্রু ঢিল, জমির শত্রু নীল, জাতির শুত্রু হিল'। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও মেহেরপুরের জনগণের ভূমিকা রয়েছে।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা ও খলিফার মর্যাদা রক্ষার লক্ষ্যে মওলানা শওকত আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখের নেতৃত্বে 'সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটি' গঠিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশে এর শাখা খোলা হয় এবং আন্দোলনকে জোরদার করার তৎপরতা চালানো হয়। ১৯২০ সালের শেষের দিকে গাড়াডোবের জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ (১৮৭০-১৯৩৭) এর নেতৃত্বে গঠিত হয় খেলাফত কমিটি। 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক রেয়াজউদ্দীন আহমেদ (তেঁতুলবাড়িয়া) এ কমিটির সাথে যুক্ত হন। "খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদেও পরিবর্তন ঘটে। ধুতির বদলে লুঙ্গি, সাধারণ টুপির পরিবর্তে তুর্কি টুপি পরিধান করা শুরু হয়।"[১৩]

খেলাফত আন্দোলনের সমসাময়িক অসহযোগ আন্দোলনে মেহেরপুরের হিন্দু এলিটদের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক ও স্বতঃফূর্ত। স্বদেশি আন্দোলনের কর্মীরা বিলেতি পণ্য বর্জনের আহবান নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। মেহেরপুরে অসহযোগ ও স্বদেশি অন্দোলনে নেতৃত্ব দেন গাংনী মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধাংশু বাগচী, গাঁড়াডোবের মনি সান্যাল, শিবকালি লাহিড়ী, মেহেরপুরের পরিমল বাগচী, বিজন বসু, বিভূতি বাবু, তেহট্টের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার ঘটে, মেহেরপুরও এর বাইরে ছিল না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবাষ্পে মেহেরপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপরীতে একটি আসাম্প্রদায়িক ও গণমুখী রাজনীতির ধারাও এ অঞ্চল গড়ে ওঠে যার নেতৃত্ব দেন কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা। চল্লিশের দিকে অসাম্প্রদায়িক গণমুখী রাজনীতির বিকাশে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তারা হলেন—কংগ্রেস নেতা বল্লভপুরের আশুতোষ উকিল, দারিয়াপুরের প্রমথনাথ বিশ্বাস, ডা. নগেন্দনাথ, গাঁড়াডোবের মনি সান্যাল, কম্যুনিস্ট নেতা মাধব মোহান্ত এবং মুসলিম লীগ নেতা অ্যাডভোকেট আব্দুল হান্নান প্রমুখ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বাষট্টির ছাত্র-আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে এ জনপদের সর্বস্তরের মানুষ সাহসী ভূমিকা পালন করে।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে সারা দেশের অন্য নাম ছিল মুজিবনগর তথা মেহেরপুর। ইতিহাসনির্মাতা মুজিবনগরকে ধারণ করে মেহেরপুর মুক্তিযুদ্ধে অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সেই অর্থে মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের মুখবন্ধ। আমাদের মুক্তিসংগ্রাম যদি কোনো মহাকাব্য হয়, তাহলে মুজিবনগর যেন সেই মহাকাব্যের কাননে ফোটা এক রক্তপলাশ। বাঙালির অগ্নিশপথের তীর্থভূমি ইতিহাসনির্মাতা মুজিবনগরকে রাজনৈতিকভাবে না হলেও সংস্কৃতিগতভাবে সবাই মেনে নিয়েছে।

www.pathagar.com

ঝ. ধর্ম ও দর্শনচর্চার ইতিহাস

ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় বাঙালির যাপিত জীবনের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নিবিড়। ধর্ম তার শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ-সভ্যতা, রাষ্ট্র বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। তবে সে ধর্ম বিশুদ্ধ ইসলাম, ব্রাহ্মণ্য কিংবা বৌদ্ধ নয়, বরং সর্ব ধর্মের মিলনজাত রূপান্তরিত লোকধর্মই তার জীবন ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। বাঙালির সুদীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব নানা ধর্ম, বিশ্বাস ও লোকাচার এবং দর্শনের প্লাবনে সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তা।

"সে (বাঙালি) তর্ক করে, যুক্তি মানে, কিন্তু হৃদয়বেদ্য না হলে সে জীবনে আচরণ করে না। তাই সে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম ধর্ম মুখে যতটা গ্রহণ করেছে, অন্তরে ততটা মানেনি। সে তার জীবন জীবিকার অনুকূল করে রূপান্তরিত করেছে ধর্মকে। এভাবে দেশে লৌকিক ধর্মই কালে কালে বাঙালির জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে।"[১৪]

অবিভক্ত নদীয়ার প্রাচীন জনপদ হিসেবে মেহেরপুরের লোকজীবন, আধ্যাত্মিক চিন্তা, দর্শনচর্চা ও সংস্কৃতিতে নদীয়ার লোকধর্মগুলোর রয়েছে অনিবার্য প্রভাব। এসব লোকধর্মের প্রভাবে এ জনপদে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানা যায়, 'মহামানবের মিলন তীর্থ' এই নদীয়ায় বাংলার অধিকাংশ লোকধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ। ৩৪১৪ বর্গমাইল আয়তনের (১৮৭১ খ্রিঃ আদমশুমারি অনুযায়ী) এই জেলায় কর্তভর্জা (কল্যাণীর ঘোষপাড়া), সাহেবধনী (চাপড়া), বলরামী (মেহেরপুর), খুশি বিশ্বাসী (দেবগ্রাম ভাগা), বৈষ্ণব (নবদ্বীপ), লালনিক বাউলদের (ছেঁউড়িয়া) সাধনক্ষেত্র অবস্থিত। এই নদীয়াতেই পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে নববৈষ্ণব ধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব। তিনি মানুষকে নতুন করে বাঁচার পথ দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই, মানুষ অমৃতের সন্তান। তার প্রেম ভক্তিবাদ ষোড়শ শতকে নদীয়ার মেহেরপুরকে তো বটেই, সব বাঙালির চিত্তে ভাবজোয়ার এনেছিল, সেই ভাবজোয়ারে বাঙালি ফিরে পেয়েছিল অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি। চৈতন্যের জ্ঞান, ভক্তি ও মানবতার বাণী অবলম্বনে পার্ষদেরা রচনা করেন চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ ও অজস্র বৈষ্ণব ও পদাবলি। পরবর্তী প্রায় দুশ বছর চলে ভাবের জোয়ার, এই জোয়ারে ভাসে নদীয়ার মেহেরপুর, ভাসে বাংলাদেশ। চৈতন্যের ভাবরসের ধারায় সিক্ত মেহেরপুর নিবাসী কবি ও সাধক জগদীশ গুপ্ত রচনা ও সংকলন করেন 'শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত', 'লীলাস্তবক', এবং 'শ্রীচৈতন্য লীলামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ। তাঁর উত্তরসূরি কবি রমণীমোহন মল্লিক রচনা করেন চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি। চৈতন্যকে 'অনন্তরূপ অনন্তাবতার' জেনে এ অঞ্চলের অসংখ্য নামগোত্রহীন পদকর্তা বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছেন। বৈষ্ণবীয় ভাবরসের ধারাটি মেহেরপুরে আজও বহমান আছে। চৈতন্য প্রবর্তিত রসের ধারাটি টিকিয়ে রাখার জন্য এ অঞ্চলের বৈষ্ণব ও রসসাধকগণ মেহেরপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠা করেন হরিসভা মন্দির, এই মন্দিরে নিত্য চলে হরিনাম সংকীর্তন।

www.pathagar.com

চৈতন্য প্রবর্তিত নববৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে আঠারো শতকের শেষে মেহেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় লৌকিক গৌণ ধর্ম বলরামী সম্প্রদায়। এই ধর্মের প্রাণপুরুষ ও প্রবর্তক ছিলেন বলরাম হাড়ি। মেহেরপুর নিবাসী বিখ্যাত লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : "বাঙ্গালা ১১৯০ বা ১১৯৯ সালে বলরামের জন্ম হয়।...১২৫৭ সালের ৩০ অগ্রহায়ণ অনুমান পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।"[১৫]

এই ধর্মের অনুসারীরা অধিকাংশই ছিলেন হাড়ি, ডোম, বাগদি, মুচি, বেদে, নমশূদ্র, মুসলমান, মালো এবং মাহিষ্যা। এরা গঙ্গাজলের মহিমা কিংবা সংস্কৃত মন্ত্রের পবিত্রতা মানতো না। বলরামীরা সৎ শুদ্ধ জীবনযাপনে আগ্রহী এবং গুরুবাদে আস্থাহীন। এই সম্প্রদায় সংখ্যায় অল্প হলেও এখনও তারা সাধন-ভজন নিয়ে বেঁচে আছে। এই সম্প্রদায়ই সম্ভবত বাংলার একমাত্র লৌকিক ধর্ম যারা তাদের সূচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের নিম্নবর্ণের শূদ্র ও অন্ত্যজ জাতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ছাড়া কাউকে তাঁদের ধর্মবলয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি। ১৯৮৫ সালে বলরাম হাড়ির সর্বশেষ সেবাইত বৃন্দাবন হালদারের মৃত্যুর পর মেহেরপুর অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের অনুসারীদের আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবুও প্রতি বছর বারুণী তিথিতে বলরামের সমাধিমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় বলরামীদের মেলা। আর এই মেলার মধ্য দিয়েই বার বার ফিরে আসেন অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যদের এই মহান সাধক, যিনি উনিশ শতকের উচ্চ ধর্ম বিশেষত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এমনকি বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে তাঁর মতকে দাঁড় করিয়েছিলেন। কালের যাত্রায় বলরামী ধর্মের এই ধারাটি ক্ষীয়মান ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তবু অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যদের জীবন ও সংস্কৃতিতে বলরামের উপস্থিতি আছে প্রবলভাবে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে জন্মেছিলেন এক মহান সাধক ও সংস্কারক নিগমানন্দ সরস্বতী (১৮৮০-১৯৩৭)। তাঁর বাল্যনাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং পৈতৃক নিবাস মেহেরপুরের কুতুবপুর গ্রামে। তিনি শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এক নতুন ধর্মমত। তিনি নিজ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় (১৯৩৩) এবং গাংনীর কাথুলী গ্রামে একটি বিদ্যালয় (১৯৩২) স্থাপন করেন। তিনি গৃহী হয়েও ছিলেন সন্ন্যাসী; আশ্রমিক হয়েও ছিলেন মানবপ্রেমে ব্যাকুল ও ব্রতী এক সাত্ত্বিক পুরুষ। তিনি বলেছেন : "সংসার আশ্রম কঠোর ও ভীষণতর জানি তথাপি সংসার-আশ্রম জীবের উন্নতির সোপান। ক্রোধের বশে, দুঃখে বা অভিমানে কাপুরুষের ন্যায় সংসার ত্যাগ সন্ন্যাসের সাধনা নয় স্বার্থ-সাধনের নামান্তর।" তাঁর ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বাণী আজও এ অঞ্চলের মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাঁর ভাবাদর্শের আলোকে মেহেরপুর শহর ও কুতুবপুর গ্রামে দুটি সারস্বত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বিভিন্ন লোকধর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের একটি স্রোত চতুর্দশ শতক থেকে মেহেরপুর অঞ্চলে বহমান রয়েছে। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া দখল করে সর্ব প্রথম মুসলিম শাসনের সূচনা করেন এবং এরপর থেকে মেহেরপুরে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে মুসলিম শাসকদের চেয়ে পির ও সুফিদের ভূমিকা ছিল বেশি। সুফি বা

www.pathagar.com

পিরদের অতুলনীয় ব্যাক্তিত্ব, উদার ধর্মমতে মুগ্ধ হয়ে এবং জাতিভেদ প্রথা থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে মেহেরপুরের প্রাচীন গ্রাম বাগোয়ানে সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। বাগোয়ান অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন দরবেশ শেখ ফরিদ। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৪ শতকে বাগোয়ান পরগনা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। তবে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ষোড়শ শতকের দরবেশ শাহ ভালাই। এছাড়াও শাহ এনায়েত, শাহ আলাই, হযরত বাগু দেওয়ানের মতো লৌকিক পির এবং গাংনী থানার বাওট গ্রামের পির সোলায়মান (১৮৮৫-১৯৮০) খন্দকার কেরামত হোসেন, বাদিয়াপাড়ার মো. মহসীন, মেহেরপুরের ভবানীপুরের মুন্সী নায়েবউদ্দীন-এর মতো সাধকদের প্রচেষ্টায় মেহেরপুর অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটে। তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের বাণী, দর্শন ও রীতিনীতি প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন গ্রামে ছুটে বেড়িয়েছেন এবং গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন দরগা, আস্তানা, খানকাহ। শেখ ফরিদের দরগা (বাগোয়ান), শাহ ভালাই-এর দরগা (কালাচাঁদপুর), শাহ আলাই-এর মাজার (গোদি সুবিদপুর), বাগু দেওয়ানের মাজার (যাদবপুর), মহসীন পিরের খানকাহ (বাদিয়াপাড়া) প্রভৃতি আসলে পির-দরবেশদের একনিষ্ঠ ধর্মকৃত্যেরই পরিচয় বহন করে। তাঁদের মহত্ত্ব, আত্মত্যাগ, ধর্মানুরাগ ও মানবসেবায় সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হয়ে এবং ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বায়াত গ্রহণ করেছে, মুরিদ হয়েছে। এসব পির দরবেশ ও সুফিরা তাঁদের কর্মকাণ্ড কেবল ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁরা নিজেদেরকে নানা জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত করে মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং 'নানা মত পথের সন্ধান দিয়ে' সাধারণ মানুষের চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। মেহেরপুরের লোকমানস ও লোকজীবনে এঁদের অবস্থান ও প্রভাব এত দৃঢ় যে এঁরা প্রায় দেবতায় পরিণত হয়েছে'। গোরচাঁদ যেমন হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পির, তেমনি মেহেরপুরের শাহ ভালাইও ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যেমন পাঁচ পিরের পূজা দেয়, তেমনি মেহেরপুরে হিন্দু-মুসলমান সকলে শাহ ভালাই-এর দরগা, শাহ আলাই-এর মাজারে মানত করে, সেজদা ও প্রণাম জানায়। উনিশ শতকের ওয়াহাবি, তরিকায়ে মহাম্মদীয়ার মতো ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, শিক্ষার প্রসার, মৌলবাদী দলগুলোর সুফিবাদ-বিরোধী প্রচারমূলক তৎপরতা সত্ত্বেও মেহেরপুরের লোকজীবন ও সংস্কৃতি থেকে এসব পির-দরবেশের বিস্ময়কর প্রভাব মুছে ফেলা যায়নি।

ঞ. শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস

পণ্ডিতের শাস্ত্র, দর্শন, স্মৃতিশাস্ত্র, শিল্প-সাহিত্যচর্চার পীঠস্থান নদীয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে পালন করেছে অনন্য ভূমিকা। রামায়ণকার কৃত্তিবাস, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৫-১৮৫৮), অক্ষয় কুমার দত্ত, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩), গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ কাঙাল হরিনাথ মজুমদার

www.pathagar.com

(১৮৩৩-১৮৯৬), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩), ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র (১৮৬১-১৯৩৯), নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), কবি-ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখর কর (১৮৬১), দীনেন্দ্র কুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৫-১৮৯২) প্রমুখ ছিলেন অবিভক্ত নদীয়ার সন্তান। বাউল-শিরোমণি লালন সাঁই-এর সাধনক্ষেত্র ছিল বৃহত্তর নদীয়া। নবদ্বীপ সন্নিহিত এলাকা এবং নদীয়া জেলার মহকুমা হিসেবে মেহেরপুরের রয়েছে শিল্প-সাহিত্যচর্চার গৌরবময় ইতিহাস। নবাবি আমল থেকে এখানে টোল-চতুষ্পাঠী মক্তব-মাদ্রাসা ছিল। কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১৭৯১-১৮৪৪), বৈষ্ণব পদকর্তা জগদীশ্বর গুপ্ত (১৮৪৫-১৮৯২), রমণীমোহন মল্লিক, দীনেন্দ্র কুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩), উজীর উদ্দীন আহমদ (১৮৬১- ?), আব্দুল হামিদ কাব্যবিনোদ, মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩৭) প্রমুখ সুসাহিত্যিক মেহেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখেন। এদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন দীনেন্দ্র কুমার রায়, জগদীশ্বর গুপ্ত ও মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীন। দীনেন্দ্র রায় ছিলেন খ্যাতনামা সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও অনুবাদক। "১৯০০ সালে তিনি বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক হন। এ সময় তিনি 'নন্দন কানন' মাসিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।"[১৬]

বহুমাত্রিক পরিচয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক দীনেন্দ্র রায় সম্পর্কে শিশির কুমার দাস বলেন, "তাঁর সৃষ্টি অতি সহানুভূতিশীল। অনেক পরিমাণেই তিনি বাস্তবানুগ, খুঁটিনাটি তথ্যের প্রতি তাঁর আসক্তি, অত্যধিক ভাবালুতা তার দোষ। কিন্তু বাস্তব বর্ণনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের শুধু পূর্বসূরীই নন—শরৎচন্দ্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট। বিভূতিভূষণের পল্লিজীবনের ঘটনাগুলোতে যেমন অতি তুচ্ছ ঘটনাকে আশ্রয় করে গভীর অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তেমনিই দীনেন্দ্র কুমারে।" তাঁর লেখা 'পল্লিচিত্র', 'পল্লি বৈচিত্র্য,' 'পল্লিকথা' প্রভৃতি গ্রন্থে মেহেরপুর তথা বাংলার লোকজীবন ও সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে গভীরভাবে।

কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (১৭৯১-১৮৪৪) ছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র রাজা গিরীশ চন্দ্র রায়ের সভাকবি। মহারাজ তাঁকে 'রসসাগর' অভিধায় ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক, বহু ভাষাবিদ, রসবোধসম্পন্ন পণ্ডিত এবং স্বভাবকবি। চৈতন্য-উত্তর বিখ্যাত পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্নের পঞ্চম উত্তরপুরুষ এই সাধককবির জন্ম হয় মেহেরপুরের বাঁড়িবাকা গ্রামে এবং মৃত্যু নবদ্বীপে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

জগদীশ্বর গুপ্ত ও রমণীমোহন মল্লিক ছিলেন বৈষ্ণব ধারার কবি ও সাধক। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যের পণ্ডিত জগদীশ্বর গুপ্ত ছিলেন পেশায় মুন্সেফ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, লীলাস্তবক, চৈতন্য লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের সংকলক ও টিকাকার। কবি রমণীমোহন মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন মেহেরপুরের বিখ্যাত মল্লিক পরিবারে। বৈষ্ণব সাহিত্যের পণ্ডিত রমণীমোহন মল্লিকের সাহিত্যচর্চার সময়কাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। 'চণ্ডীদাস' 'জ্ঞানদাস', 'বলরাম দাস' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি টিকাসহ সম্পাদনা করেন। জগদীশ্বর গুপ্ত, রমণীমোহন মল্লিকের মতো মুন্সি শেখ জমিরুদ্দীন, রেয়াজউদ্দীন

www.pathagar.com

ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য রচনা করেন। শিল্পসৃষ্টির জন্য নয় বরং ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে উনিশ শতকীয় মুসলিম পুনর্জাগরণের পথিকৃৎ মুন্সি জমিরুদ্দীন ছিলেন একাধারে ইসলামপ্রচারক, সমাজসংস্কারক, ভাষাবিদ, অনুবাদক এবং সুসাহিত্যিক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর রচিত ধর্ম সম্পর্কিত প্রবন্ধ, জীবনী, অনুবাদ, গজল প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে। 'গ্লোরি অব ইসলাম' (১৯২৯), 'মেহের চরিত' (১৩১৫), 'শোকানল' (১৩১৬), 'কোথা চলি গেলে' প্রভৃতি গ্রন্থ মেহেরপুরের এই কৃতী পুরুষকে বাংলা সাহিত্যের একটি মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। সাধক নিগমানন্দ সরস্বতী (১৮৮০-১৯৩৭) দর্শন ও অধ্যাত্মচর্চার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনাও করেছেন। 'সুধাংশুবালা' তাঁর আত্মজৈবনিক উপন্যাস।

বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই সাহিত্যচর্চার লক্ষ্যে মেহেরপুরে নানা প্রকার সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। ভৈরব তীরবর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম দারিয়াপুরে শিল্প-সাহিত্য অনুরাগী হীরালাল বিশ্বাসকে সভাপতি করে ১৩১৯ সালের ১ বৈশাখ (১৯১২ খ্রি.) 'নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী' নামে একটি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এই সংগঠন ১৯১৩ সাল (১ বৈশাখ ১৩২০) থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক উঁচু মানের একটি মাসিক পত্রিকা বের করে। পত্রিকাটির প্রকাশক হিসেবে অবিনাশ চন্দ্র বিশ্বাস এবং সম্পাদক হিসেবে সতীশচন্দ্র বিশ্বাস দায়িত্ব পালন করেন। কৃষ্ণনগর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 'সাধক' জনপ্রিয় পত্রিকা হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। 'সাধক'-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মেহেরপুরের শিল্প-সাহিত্যচর্চার জগতে নেমে আসে দুযুগের অন্ধকার। বাংলা ১৩৪২ সালে পল্লিসাহিত্য সেবার ব্রত নিয়ে প্রকাশিত হয় অমরেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় মাসিক 'পল্লি শ্রী'। সাধকের মতো 'পল্লি শ্রী'ও উচ্চ শ্রেণির সাময়িক পত্র ছিল। প্রমথচন্দ্র রায়ের মেহেরপুর কমলা প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো।

লেখক দীনেন্দ্র কুমার, কবি অজিত দাস, অমরনাথ বিশ্বাস প্রমুখ নিয়মিত 'পল্লি শ্রী'তে লিখতেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয়নি। লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, সংবাদপত্র ও সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশনার ক্ষেত্রে এ জেলার ছিল গৌরবময় ভূমিকা। দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনায় শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হিন্দুরা দেশত্যাগ করায় মেহেরপুরের শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রকাশনা ও বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনে নেমে আসে গভীর অন্ধকার ও শূন্যতা। এই অন্ধকার ও শূন্যতা এত গভীর হয় যে, তার ছায়া প্রায় দুযুগ মেহেরপুরের শিল্পাঙ্গনকে ঢেকে রাখে।

অন্যদিকে মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, সৃজনশীল ও মননশীল কর্মকাণ্ডের প্রতি অনাগ্রহের কারণে পুরো পাকিস্তান আমলে শিল্প-সাহিত্যচর্চা লক্ষ করার মতো ছিল না। যারা সাহিত্যচর্চার সাথে যুক্ত ছিলেন তারা তেমন প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন না। তাছাড়া সাম্প্রদায়িকতা তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল ভিত্তি হওয়ায় তারা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়তে পারেননি। তবে মুক্তিযুদ্ধের পর

www.pathagar.com

মেহেরপুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। যে মধ্যবিত্তের মানসলোক পাকিস্তানি অপশাসন ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ও গাঢ় ছায়ার নিচে পথ হারিয়েছিল, সেই মধ্যবিত্ত নতুন করে আত্মপরিচয় আবিষ্কার করে শিল্প-সাধনায় নিজেদেরকে যুক্ত করল। সে চিনল লালন-হাসন, রবীন্দ্র-নজরুলকে, চিনল বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে।

ট. খাদ্যশস্য

মেহেরপুর জেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য হচ্ছে ধান, গম, ছোলা, মুগ, মসুর, কলাই প্রভৃতি ডাল জাতীয় শস্য, ইক্ষু, ভুট্টা এবং মৌসুমি শাকসবজি। এ অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাসও গড়ে উঠেছে এই সব খাদ্যশস্যের উপরে নির্ভর করে। শুধু খাদ্যাভ্যাস বলেই নয়, এতদঞ্চলের সামাজিক অনুষ্ঠানাদি এবং মৌসুমি আনন্দ-উৎসবেও ব্যবহৃত হয় স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন এই সব খাদ্যশস্য এবং তার উপকরণাদি।

কৃষিকাজের জন্য মেহেরপুর জেলার আবাদযোগ্য জমিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। ১. শরৎকালের আউশ ধান উৎপাদনের উপযোগী উঁচুজমি, আউশ ধানের পর আবার মুগ, মসুর, ছোলা, কলাই, ইক্ষু প্রভৃতি রবিশস্য চাষের যোগ্য জমি; ২. মরা নদীর তলদেশ বা তলানি পড়া বিলের নিচু জমি; ৩. শীতকালীন আমন ধান এবং বেশ কিছু রবিশস্য চাষাবাদের যোগ্য সাধারণ নিচু জমি। এই জেলার ভূমি প্রধানত পলি এবং অধিক পরিমাণে পটাশ ও ফসফরাসযুক্ত বেলে কাদামাটি দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ কৃষক বলে বাইলি মাটি বা বেলেমাটি। এই বেলেমাটি ছাড়া বেলে দোআঁশ এবং এঁটেল মাটিও দেখা যায়। এই মাটিতে চাষাবাদ করে ফসল ফলানো, সেই ফসল কাটা, মাড়াই করা, ঘরে তোলা প্রতিটি অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই এলাকার কৃষকের আনন্দ-বেদনার আবেগ উচ্ছ্বাস; কৃষকের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফসল ফলানোর স্বপ্ন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি। প্রভাতবেলায় লাঙল কাঁধে মাঠে যাওয়া, গরুর পিছনে হেঁটে হেঁটে মাটি চাষ করা, মাঠের আইলে বসে পান্তাভাত খাওয়া এবং পাখপাখালির জন্যে ছড়িয়ে দেওয়া, বুঁদিয়া (পোয়াল বা বিচুলি দিয়ে প্রস্তুত আগুন জ্বালিয়ে রাখা দণ্ড বিশেষ) থেকে আগুন নিয়ে হুঁকো টানা, গরুর গাড়িতে তুলে মাঠের ফসল বাড়িতে আনা, কোনো অবসন্ন মুহূর্তে প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠা; ঢেঁকিতে ধান ভানা, নতুন ধান ওঠার পর ঘরে ঘরে পিঠেপুলির আয়োজন, পৌষ মাসে পুষল্লা কিংবা বৈশাখ মাসে বৈশাখি উৎসব—এ সবই মেহেরপুর জেলার মানুষের কাছে অত্যন্ত পরিচিত দৃশ্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বদলে গেছে অনেক কিছু। কৃষিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগার ফলে গরুর লাঙল প্রায় হারাতে বসেছে, ট্রাক্টর বা কলের লাঙ্গলের যান্ত্রিক শব্দে জেগে ওঠে গ্রামীণ জনপদ। শুধু জমিচাষই নয়, ফসল কাটা, ফসল মাড়াই, পরিবহণ, ধান ভানা, চিড়ে কোটা, গম পেষাই সব কিছুতেই পড়েছে যান্ত্রিক প্রভাব। ফলে ফসল কাটার গান, ঢেঁকি মোঙ্গলানোর গান, নবান্নের গান-এ সবই এখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

বৈশাখ মাসে বৃষ্টি না হলে বৃষ্টিপ্রত্যাশী কৃষক পরিবারে ব্যাঙের বিয়ে দেওয়ার লৌকিক সংস্কার উঠে গেছে অনেক আগেই। এমন কি 'আল্লা মেঘ দে পানি দে' বলে আর জারিও গাওয়া হয় না। এখন যান্ত্রিক উপায়ে ভূগর্ভস্থ পানি তুলে কৃষিকাজে লাগানো হচ্ছে, ইরি-বোরো জাতের উচ্চফলনশীল বীজ থেকে অধিক হারে ধান উৎপাদন হচ্ছে প্রায় সারা বছরই। ফলে 'বৈশিক মাসের বিষ্টি/আউশ ধানের ইষ্টি' এ প্রবাদও ভুলতে বসেছে অনেকেই। তবে সংস্কারপ্রসূত অনেক প্রবাদ এখনো এ জেলার গ্রামজনপদে চালু আছে। যেমন-বেহিসেবি বাঁশ কাটার ফলে বাঁশঝাড়ের ক্ষতি হয় বলে সপ্তাহের একটি দিন বাঁশ কাটা বন্ধ রাখতে সৃষ্টি হয়েছে প্রবাদ :

বিষ্যুদবারে কাট্‌লি বাঁশ
বাঁশঝাড়ের সর্বনাশ।

এ অঞ্চলের খাদ্যশস্য, খাদ্যাভ্যাস, চাষাবাদ, কৃষি উপকরণ নিয়েও সাধারণ মানুষ মুখে মুখে অনেক প্রবাদ-প্রবচন রচনা করেছে। আমরা প্রচলিত লৌকিক ছড়ার মধ্যে দেখেছি, বর্গীর ভয়ে ভীত দরিদ্র কৃষক খাজনার দায়ে কাতর কণ্ঠে মিনতি জানাচ্ছে- 'আর কটা দিন সবুর কর, রসুন বুনেছি।' রসুন যে অর্থকরী ফসল সে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ জেলায় প্রচলিত একটি প্রবাদে :

বুন্‌লি রসুন নদীর ধারে
তার সাতে চাষ কিবা পারে!

যন্ত্র নির্ভর কৃষিব্যবস্থা চালু হবার আগে এ জেলার চাষাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই লৌকিক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠেছিল। কাঠের তৈরি লাঙল, জোয়াল, গরুর গাড়ি, মই, মাথাল, দা, কোদাল, নিড়ানি, কাস্তে, পাটের দড়ি, সবই ছিল লোকজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সকালে উঠেই লাঙল কাঁধে মাঠে যাওয়া, অবসরে গাছের ছায়ায় বসে পান্তা খাওয়া, হুক্কার তামাক সবাইকে নিয়ে ভাগ করে খাওয়া, সবার আগে ফসল উঠলে সবাইকে তার ভাগ দেওয়া, অতঃপর নতুন ধানের চাউল দিয়ে পিঠেপুলি, ক্ষীর-পায়েস তৈরি করে সবাই মিলে খাওয়া এবং বিলানোর মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের যে লোকজ ঐতিহ্য গড়ে ওঠে, তা এখন এক রকম হারাতেই বসেছে।

ঠ. মসজিদ, মন্দির ও গির্জা

মসজিদ ও মন্দির হচ্ছে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়। মেহেরপুর জেলায় প্রাচীনকালের মসজিদের অস্তিত্ব খুব বেশি নেই। সত্যি বলতে কি সেকালে অর্থ-বিত্ত-প্রভাবশালী মুসলমানের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। তাছাড়া সাধারণ মুসলমানের অন্তরে যেমনই থাকুক ধর্মবিশ্বাস, বাইরে তার প্রাতিষ্ঠানিক প্রাধান্য ছিল খুবই কম। ফলে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তারা মনোযোগী হয়নি। এ জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে ১১৭০ বঙ্গাব্দে, মুজিবনগর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে। এ গ্রামের ইসলাম প্রচারক বীরু মোল্লা এ মসজিদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঐ গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গীয় বারুইদের মাঝে সে যুগে মসজিদ প্রতিষ্ঠা একটি বৈপ্লবিক ঘটনা বই কী! প্রায় সমসাময়িককালে গাংনী উপজেলার করমদি

www.pathagar.com

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় গোসাঁইডুবি পাড়ার মসজিদ। সহজেই অনুমান করা যায় প্রাচীন এই মসজিদগুলো এতদঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় এখন প্রত্যেক গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য মসজিদ গড়ে উঠেছে। মসজিদের মতোই এ জেলার প্রাচীন মন্দিরগুলো একদা এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

বল্লভপুরের খ্রিষ্টান মিশনের সামান্য দক্ষিণে তিনটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। কেউ কেউ অনুমান করে—মন্দিরের সংখ্যা সাতটি ছিল। মঠ আকৃতির প্রধান মন্দিরটি মাটির তলায় ডুবে থাকায় জানালাপথে ভেতরের কিছুটা দেখা যায়। এটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। অন্য দুটি মন্দিরের প্রায় পুরোটাই মাটির তলে। বিভিন্ন আকৃতির টেরাকোটা ইটে নির্মিত এই মন্দিরগুলো। সেই ইটে ফুটে আছে সিংহ, বাঘ, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তু, পদ্মফুল এবং অজন্তা স্টাইলের নৃত্যরত যুবতীর চিত্র। প্রধান মন্দিরটির চূড়ার নিচে আলো প্রবেশের জন্যে ঝরোকা আছে। সাত ফুট পুরু মন্দিরের দেওয়াল। এ মন্দিরে কোনো দেবদেবীর চিত্র পাওয়া যায় না। সেজন্যে কেউ কেউ এটিকে নাথযোগী সম্প্রদায়ের উপাসনালয় বলেও মনে করেন। প্রাচীন এই মন্দির ছাড়াও এ জেলার বিভিন্ন গ্রামে একাধিক মন্দির অযত্নে অবহেলায় ধ্বংস হতে চলেছে। কেবল মেহেরপুর শহরের কালীমন্দিরটি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ফলে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আছে।

মেহেরপুর জেলায় হিন্দু-মুসলিমের পাশাপাশি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও কম নয়। বল্লভপুর, রতনপুর, ভবরপাড়া, আনন্দবাস-মুজিবনগর উপজেলার এই সব গ্রামে এবং গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দপুর, পাকুড়িয়া, যুগিন্দা, চিৎলা, গাংনী, চৌগাছা প্রভৃতি গ্রামে তাদের বাস প্রায় আড়াইশ বছরের। বল্লভপুর, ভবের পাড়া, রতনপুর, নিত্যানন্দপুর, যুগিন্দা, চৌগাছা প্রভৃতি গ্রামে নির্মিত গির্জাগুলো ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদিন। এইসব গির্জাবাড়িকে ঘিরে খ্রিষ্টানদের মধ্যে গড়ে উঠেছে নানান রকম লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। গির্জাবাড়ির প্রার্থনাধ্বনি বাঙালির সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় যোগ করেছে ভিন্নতর মাত্রা।

বীরু মোল্লার মসজিদ

মেহেরপুর শহর থেকে ১২ কিমি. দক্ষিণ-পশ্চিমে পিরোজপুর গ্রামে শাহ এনায়েতের দরগা অবস্থিত। এর পাশে রয়েছে বাংলা ১১৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত বীরু মোল্লার মসজিদ। মসজিদের আশেপাশে রয়েছে হিন্দু বারুইদের বসবাস। মসজিদটি সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি ও কাহিনি চালু আছে।

পিরোজপুর নিবাসী আবু সৈয়দ (৮০) বলেন, "দাদার মুখে শুনেছি মসজিদটি নাকি জ্বিনেরা নির্মাণ করেছে। প্রথমে গ্রামের লোক মসজিদটির পত্তন দেয়। পরে গ্রামের লোক হঠাৎ দেখতে পায় রাতারাতি মসজিদ হয়ে গেছে।" অলংকার ও কারুকার্যখচিত এই ঐতিহ্যবাহী মসজিদটিকে ঘিরে গড়ে ওঠা কিংবদন্তি পিরোজপুরসহ এ জেলার লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে।

www.pathagar.com

আশরাফপুর চালতলাপাড়া মসজিদ

বাজার থেকে চাল তুলে এনে সেই চাল বিক্রি করে পাড়ার অধিকাংশ লোক জীবিকা নির্বাহ করতো বলে মেহেরপুর জেলার আশরাফপুর গ্রামের এই পাড়াটির নাম চালতলাপাড়া। ভৈরব তীরবর্তী এ পাড়ায় ১৮৮৩ সালের জুন মাসে (বাংলা ১২৯০ সাল) প্রতিষ্ঠা করা হয় বিখ্যাত চালতলাপাড়া মসজিদ। মসজিদটিকে মুসলিম ঐতিহ্যের স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ মসজিদে এক সময় আশরাফপুর, ভবানন্দপুর, যতারপুরের মুসল্লিরা নামাজ আদায় করতো। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ইসলামি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আইনুদ্দীন শেখ ৬২ বিঘা জমি ওয়াক্‌ফ করে দেন এবং সরকার কর্তৃক তিনি মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন।

পরবর্তীকালে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন যথাক্রমে জইনুদ্দীন শেখ, নইমুদ্দীন, শামসুদ্দীন খন্দকার, মোশারফ হোসেন। আশরাফপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক কাজী আমিনুল ইসলাম (৯২) মোতাওয়াল্লী ছিলেন। কাজী আমিনুল ইসলামের পুত্র বর্তমান মোতাওয়াল্লী কাজী হাবিবুল ইসলাম বলেন, "মসজিদের অধিকাংশ জমি বেহাত হয়ে গেছে, শুধু ১০ বিঘা জমি মসজিদের দখলে আছে।"

তিনি আরও জানান যে, তার কাছে মসজিদের নামে আইনুদ্দীন কর্তৃক দানকৃত ওয়াক্‌ফ এস্টেটের দলিল, ডকুমেন্ট সংরক্ষিত আছে। মসজিদের সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে মারামারি, হানাহানি হয়েছে। এসব কিছু এড়ানোর জন্য অনেক ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অন্য মসজিদে নামাজ আদায় করেন। এলাকাবাসীর দাবি, ঐতিহ্যবাহী এ মসজিদের সম্পত্তি ধর্মীয় ও মানবকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হোক।

মেহেরপুর-কাথুলী সড়কের শিবমন্দির

রাজা ভবানন্দ মজুমদারের সময় অর্থাৎ সতেরো শতকের দিকে মেহেরপুর কাথুলী সড়কে নির্মাণ করা হয় একটি শিবমন্দির। মন্দিরটিকে ঘিরে নানা কিংবদন্তি চালু আছে। অবিভক্ত নদীয়ার ঐতিহ্যবাহী মন্দিরগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। নদীয়া জেলার অধিকাংশ মন্দিরের মতো এটিও চারচালা বিশিষ্ট।

প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায় এর নির্মাণকাল সম্পর্কে জানা যায় না। তবে সতেরো শতকের কোনো এক সময় নির্মিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। স্থানীয় ইতিহাসচর্চার সাথে যুক্ত সৈয়দ আমিনুল ইসলাম ও নুরুল ইসলাম বলেন, "মন্দিরটি আঠারো শতকে নির্মিত এবং এর নির্মাণ কাজে অনুদান প্রদান করেছেন নবাব আলীবর্দী খান।" মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দুধারে অপরূপ টেরাকোটায় রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য উৎকীর্ণ। শান্তিপুরের জলেশ্বর মন্দির, কৃষ্ণনগরের চৌধুরী পাড়ার মন্দির-এর মতো মেহেরপুরের শিবমন্দিরটি বাংলা চালা রীতিতে নির্মিত। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ভাস্কর্য, মূর্তি ও অলংকরণ রীতিমতো বিস্ময়কর। সম্প্রতি মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সামনে দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করার ফলে এর সৌন্দর্য ঢেকে গেছে। নিগমানন্দ সরস্বতীর অনুসারীরা এখন এই মন্দিরকে সারস্বত আশ্রম হিসেবে ব্যবহার করছে। মন্দিরটিকে মেহেরপুর জেলার গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্মারক হিসেবে গণ্য করেন ফোকলোরবিদ ও ইতিহাসবিদরা।

www.pathagar.com

চালতলাপাড়া মসজিদ

বলরাম হাড়ির মন্দির

www.pathagar.com

নায়েব মুন্সীর মাজার

নিগমানন্দ সরস্বতীর আশ্রম

www.pathagar.com

করমদি গোসাঁইডুবি পাড়ার মসজিদ

বিল পার হবার সময় জলে ডুবে এক বৈষ্ণব গোসাঁই-এর দেহাবসান হয় বলে বিলটির নাম গোসাঁইডুবির বিল। এর পাড় ঘেঁষে গড়ে ওঠা পাড়াটির নাম গোসাঁইডুবি পাড়া। গাংনী থানাধীন করমদি গ্রামের এই পাড়ায় হাজী দশরথ আলী নামে এক প্রভাবশালী মুসলমান ১৫০ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মসজিদ। জেলার প্রাচীন এ মসজিদটিকে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন বলে মনে করা হয়। মসজিদটি বর্তমানে পরিত্যক্ত আছে। তবে মসজিদ সংলগ্ন এলাকাটিকে পবিত্র স্থান বলে অনেকে মনে করেন। তাই প্রতি বছর মসজিদপ্রাঙ্গণে তফসির-মাহফিলের আয়োজন করা হয় এবং মাহফিলে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হয়।

বড়বাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির

মেহেরপুর পুরাকীর্তিতে সমৃদ্ধ জেলা। বাগোয়ানের সন্তান ভবানন্দের আমলে এ এলাকায় কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতকে নদীয়ায় মন্দিরের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলে মেহেরপুরে অনেকগুলো মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। আলমপুর, শ্যামপুর ও কাথুলীর শিবমন্দির ঐ আমলের বলে মনে করা হয়। সতেরো ও আঠারো শতকে নির্মিত অধিকাংশ মন্দিরই বিলীন হয়ে গেছে। যেসব মন্দির টিকে আছে তার মধ্যে মেহেরপুর বড় বাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরটি অন্যতম। এ মন্দিরকে নাটমন্দির বলা হয়। প্রয়াত গোপাল সাহার স্ত্রী পাচু বালা দাসী বাংলা ১৩৪৬ সালের ২০ আশ্বিন মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। এই মন্দিরে কালীমূর্তি এখন নিত্য পূজিতা। মন্দির সংলগ্ন বাজারটি কালীবাজার নামে পরিচিত। প্রতি বছর বৈশাখ সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। এই মেলাটি মেহেরপুরের লোকঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। মন্দিরটি সম্পর্কে দীনেন্দ্র কুমার রায় 'সেকালের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, "সরস্বতী পূজা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী উৎসব, যাত্রা, ঢপ, কবির লড়াই জনসাধারণ দিবারাত্রি সে উৎসবে মত্ত।" এই মন্দিরের সামনে অনুষ্ঠিত অন্য একটি উৎসব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : "সেই বহুদিন পূর্বে যখন হেলির ধূমকেতু উঠিয়াছিল—সেই সময় তাঁহারা (জমিদার যুবকরা) বাউল সজিয়া কালীমন্দিরের সম্মুখে নাচিতে নাচিতে যে গান গাইয়াছিলেন, তাহা এতকাল পরেও যেন আমার কানে বাজিতেছে। সেই গানটি এইরূপ :

নিশিদিন মরি ভেবে, ওমা শিবে।
উঠলো পুবে লম্বা তারা।
তারার ল্যাজ লম্বা ভারী, সন্দো করি,
হরি হরি বল গো তোরা।

বলরাম হাড়ির আখড়া

আঠারো শতকের শেষ দিকে মেহেরপুরের মালোপাড়ায় অস্পৃশ্য হাড়ি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বলরাম হাড়ি নামে এক ধর্মসংস্কারক ও আধ্যাত্মসাধক। 'বলরামী সম্প্রদায়' নামে একটি লৌকিক ধর্ম তিনি প্রবর্তন করেন। এই ধর্মের অনুসারীরা

www.pathagar.com

ছিলেন ডোম, বাগদী, মুচি, হাড়ি, নমশূদ্র এবং কেউ কেউ মুসলমান। এরা সংস্কৃত মন্ত্রের মহিমা এবং গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করতেন না। বলরাম হাড়ি ১২৫৭ বঙ্গাব্দের ৩০ অগ্রহায়ণ মৃত্যুবরণ করেন। "মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যদের আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার দেহ সমাহিত বা অগ্নিতে দগ্ধ না করা হয়। তারা যেন শিয়াল শকুনির ক্ষুন্নিবারণের জন্য কোনো নির্জন স্থানে সংরক্ষিত হয়। তাহার অন্তিম আদেশ পালিত হইয়াছিল।"[১৭]

তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পর তাঁর আখড়ায় একটি মন্দির ও ভবন নির্মাণ করা হয়। এই মন্দির ও ভবন সংলগ্ন এলাকাটি বলরাম হাড়ির আখড়া নামে পরিচিত। মেহেরপুর মালোপাড়ায় অবস্থিত মন্দির সংলগ্ন ভবনে বলরামের খড়ম, লাঠি, ছাতা এবং শয্যা সংরক্ষিত আছে। বলরামের ভক্তরা দূরদূরান্ত হতে এগুলো দেখতে আসে। চৈত্র মাসের একাদশী, জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি এবং কার্তিক মাসের একাদশীতে আখড়ায় উৎসব হয়। তবে চৈত্র মাসের বারুণী তিথিতে সবচেয়ে বড় উৎসব হয়। এই উৎসব উপলক্ষে বলরামের ভক্তবৃন্দ তিন দিনব্যাপী মচ্ছব-এর আয়োজন করে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত গায়কেরা বলরামের নামে সংকীর্তন পরিবেশন করে। প্রথম দিন 'অন্ন মচ্ছব' দ্বিতীয় দিন 'চিড়া মচ্ছব' এবং শেষ দিন 'লুচি মচ্ছব'-এর মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ভক্তরা আখড়ায় সঞ্চিত পুরাতন 'আমানি' বলরামের প্রসাদ বলে পান করে। জনশ্রুতি আছে, এই আমানি পান করলে দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয়।

পয়লা মাঘ বেলতলায় আরেকটি উৎসব হয়। এ উৎসবটা অনেকটা পোষলার মতো। এ উৎসেব ভক্তরা চাল, ডাল, গাছের ফল এক সঙ্গে মিশিয়ে রেঁধে খায়। এদিন বেলতলায় মেয়েরা ষষ্ঠীপূজার মতো চালন দেয়। চালনে মুড়ি, মুড়কি, গুড়ের পাটালি থাকে। একটি ধুতি ও শাড়ি বেলগাছে জড়িয়ে দেওয়া হয়। বলরাম হাড়ি বলতেন, জগতে দুটি জাত—প্রকৃতি আর পুরুষ। প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ নারী-পুরুষ রূপে সাজানো হতো বেলগাছটিকে। হাড়িরামের আখড়ায় একটি করে বেলগাছ থাকতে হয়। হাড়িরামীরা বেলকে আদ্যশক্তির গুণ বলে মনে করে। আর বেলতলায় থাকা মানে আদ্যশক্তির স্নেহছায়ায় থাকা, মানে জগজ্জননীর কোলে থাকা।

বলরামীরা মেহেরপুরের মালোপাড়ার এ আখড়াকে নিত্যধাম মনে করেন। কর্তাভজাদের নিত্যধাম ঘোষপাড়া, বৈষ্ণবদের নবদ্বীপ তেমনি বলরামীদের মেহেরপুরের বলরাম হাড়ির মন্দির। তাই বলরামীদের গানে পাওয়া যায় :

দিব্য যুগে যে হাড়িরাম,
মেহেরপুরে তার নিত্যধাম॥

নিগমানন্দ সরস্বতীর আশ্রম

শাঁখাশিল্পের জন্য ভৈরব তীরবর্তী গ্রাম কুতুবপুরের প্রসিদ্ধি ছিল। এক সময় মহরম উপলক্ষে বিশাল মেলা বসতো। কুতুবপুর আজ এক শ্রীহীন গ্রাম। এখন গ্রামটিকে চেনে হিন্দুধর্মের মহান সাধক নিগমানন্দ সরস্বতীর পৈতৃক নিবাস হিসেবে। নিগমানন্দের জন্ম বাংলা ১২৮৭ সালের শ্রাবণী ঝুলন তিথিতে (আগস্ট ১৮৮০) মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর গ্রামে। তাঁর পিতা ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নিষ্ঠাবান

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ। ধর্মীয় পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণকারী নিগমানন্দের বাল্যনাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রথম যৌবনে ছিলেন নিরীশ্বরবাদী এবং প্রথাগত ধর্মে অবিশ্বাসী। কিন্তু স্ত্রী সুধাংশুবালার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর জীবনদর্শন বদলে যায়। দেবতা, ঈশ্বর, ধর্ম ও পরকালে অবিশ্বাসী নলিনীকান্ত হয়ে ওঠেন প্রবলভাবে ধর্মবিশ্বাসী এবং অধ্যাত্মসাধক। তাঁকে নিয়ে অনেক কাহিনি, কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি আছে, তিনি তন্ত্রসাধক বামাক্ষ্যাপার রূপে তারাপীঠ মহাশ্মশানে শবসাধনার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করে পরলোকগত স্ত্রী সুধাংশুবালার রূপে মহামায়ার দর্শন পান এবং বিশ্বরূপ দর্শন করেন। অধ্যাত্মজ্ঞান ছাড়াও বেদ, বেদান্ত, দর্শন সম্পর্কেও ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। সনাতন ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করার কারণে স্বামী সচ্চিদানন্দ নলিনীকান্তকে 'নিগমানন্দ' নাম প্রদান করেন। পরবর্তীতে তিনি শঙ্করাচার্যের দ্বারা 'পরমহংস' অভিধায় ভূষিত হন। এরপর এই মহান সাধক নিগমানন্দ সরস্বতী 'পরমহংস' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ১৩৪২ সালের ১৩ অগ্রহায়ণ (নভেম্বর ৯৩৭ খ্রি.) দেহত্যাগ করেন। কোনো উত্তরসূরি না থাকায় নিগমানন্দের পৈতৃক ভিটেবাড়ি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাথুলী এন.এস. মন্দির-এর জমি বেদখল হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর নিগমানন্দের অনুসারী ও ভক্তরা তাঁর পৈতৃক ভিটে উদ্ধার করে সেখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রম কুতুবপুর শ্রী গুরুধাম নামে পরিচিত। প্রতিদিন সারা দেশের বিভিন্ন জেলা এবং ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের ভক্ত, অনুরাগীরা এই গুরুধামকে তীর্থস্থান মনে করে ভ্রমণে আসেন। শ্রাবণী ঝুলন তিথিতে প্রতি বছর গুরুধামে নিগমানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে গুরুধাম সংলগ্ন এলাকা লোকারণ্যে পরিণত হয়।

বল্লভপুরের প্রাচীন মন্দির

মেহেরপুর শহর থেকে ১৬ কিমি. দক্ষিণে মুজিবনগর উপজেলাধীন বল্লভপুর গ্রামে ১৬০৬-১৬০৭ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদার সাতটি শিবমন্দির ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৭২৮ সালে প্রকাশিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতং' গ্রন্থে মন্দিরটি সম্পর্কে একটি বিবরণ পাওয়া যায়। মন্দিরটি প্রথম খুঁজে বের করেন ১৯৭০ সালের মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা) তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী। কুমুদনাথ মল্লিক-এর 'নদীয়া কাহিনি'তে মন্দির সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এ গ্রামের মাঝপাড়ায় প্রায় এক বিঘা পরিমিতি অপেক্ষাকৃত উঁচুস্থানে সাতটি মন্দির ছিল। এখন সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত এবং জঙ্গলাকীর্ণ। পোড়ামাটির টালি স্তূপে স্থানটি পরিপূর্ণ। একদা প্রাচীর বেষ্টনী ছিল, এখন নেই।"

আমরা গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ বল্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বল্লভপুর নিবাসী রমেন মল্লিক (৬৩), চার্চ অব বাংলাদেশ, পরিচালক পল নিশীথ দাস, মিশন হাই স্কুলের শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস, মিশন হোস্টেলের ইনচার্জ অনুসোমা রেমাকে সাথে নিয়ে প্রত্নস্থলটি সরেজমিনে পরিদর্শন করি। প্রত্নস্থল পরিদর্শনে গিয়ে লক্ষ করি যে, সেখানে কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। তবে, রমেন মল্লিক বললেন, "চারচালা বিশিষ্ট একটি মন্দির এখানে ছিল। সংরক্ষণের অভাবে এটি

www.pathagar.com

ধ্বংস হয়ে গেছে।” স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে জানা যায়, জমির মালিক কর্তৃক ইট পর্যন্ত সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির তৈরি নানা মূর্তিও অলঙ্করণ মণ্ডিত ছিল। শ.ম. শওকত আলীর 'কুষ্টিয়ার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, “বল্লভপুর মন্দিরটি নানা আকারের টেরাকোটা ইট দিয়ে তৈরি। অধিকাংশ ইটে সিংহ, বাঘ, ঘোড়া, হাতি বিভিন্ন জীবজন্তু এবং পদ্ম, নৃত্যরতা যুবতী প্রভৃতি অংকিত ছিল।” মন্দিরগুলোকে স্থানীয় অধিবাসীরা মঠ বা বৌদ্ধ মন্দির হিসেবে গণ্য করলেও এটি ছিল শিবমন্দির। এর শিখরদেশে ত্রিশূল ছিল বলেও অনেকে জানান।

বল্লভপুরের মন্দির সম্পর্কে নানা জন নানা মত প্রকাশ করেছেন। তবে মন্দিরটি সংরক্ষণ করা গেলে মেহেরপুরের গৌরবময় ইতিহাসের অনেক তথ্যই জানা যেত।

ভবানন্দপুর মন্দির

রাজা ভবানন্দ মজুমদার বাগোয়ান-ভবানন্দপুর থেকে কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে রাজবাড়ি স্থাপনের আগে ভৈরবের উত্তর প্রান্তে তাঁর নামে ভবানন্দপুর রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজবাড়িটিকে ভবানন্দপুর কাছারি বলা হয়। এই কাছারি থেকে অনতিদূরে রাজা ভবানন্দ মজুমদার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এটি এখন ভবানন্দপুর মঠ নামে পরিচিত। মন্দিরটির নির্মাণশৈলী বৌদ্ধ মঠের মতো হলেও এটি আসলে মন্দির। মঠের নামানুসারে আশরাফপুর ভবানন্দপুরের মাঠটির নাম 'মঠের মাঠ'। এই মন্দিরটি সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণনা আছে। দেবী অন্নদা ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে অধিষ্ঠিত হয়ে এই মন্দিরে ঝাঁপি রেখেছিলেন বলে কবি কল্পনা করে লেখেন :

অন্নদা ভক্ত ভবানন্দ—

আপন মন্দিরে গেলো প্রেম ভরে কাঁপি।
দেখেন মেঝেয় এক মনোহর ঝাঁপি।
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা।

ভবানন্দ মজুমদার-এর রাজবাড়ির মতো মন্দিরটিও নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। ভবানন্দ ও সভাকবি ভারতচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দিরটিকে রক্ষণাবেক্ষণের দাবি করেছেন স্থানীয় জনগণ।

গির্জা

মেহেরপুর জেলায় হিন্দু-মুসলিমের পাশাপাশি খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও কম নয়। বল্লভপুর, রতনপুর, ভবরপাড়া, আনন্দবাস-মুজিবনগর উপজেলার এই সব গ্রামে এবং গাংনী উপজেলার নিত্যানন্দপুর, পাকুড়িয়া, যুগিন্দা, চিৎলা, গাংনী, চৌগাছা প্রভৃতি গ্রামে তাদের বাস প্রায় আড়াইশ বছরের। বল্লভপুর, ভবেরপাড়া, রতনপুর, নিত্যানন্দপুর, যুগিন্দা, চৌগাছা প্রভৃতি গ্রামে নির্মিত গির্জাগুলো ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদিন। এইসব গির্জাবাড়িকে ঘিরে খ্রিষ্টানদের মধ্যে গড়ে উঠেছে নানান রকম লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। গির্জাবাড়ির প্রার্থনাধ্বনি বাঙালির সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় যোগ করেছে ভিন্নতর মাত্রা।

www.pathagar.com

বল্লভপুরের গির্জা

ড. মুক্তিযুদ্ধ

বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা একাত্তরের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং মহোত্তম অর্জন যুদ্ধ শেষে বিজয় অর্জন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্ব স্তরের জনগণের মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উজ্জ্বল অভ্যুদয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা মেহেরপুর পালন করেছে অসামান্য ভূমিকা। একাত্তরের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। পাশাপাশি এদিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা অনুমোদন করা হয়। সেদিন থেকে বৈদ্যনাথতলা নামের ছায়াঢাকা, পাখিডাকা অখ্যাত গ্রামটি মুজিবনগর নামে পরিচিতি লাভ করে। মুজিবনগরের আম্রকানন সেদিন সমগ্র বাঙালিকে দেখিয়েছিল মুক্তির পথ, জুগিয়েছিল পাকিস্তানি বর্বরতা, গণহত্যা, নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই-এর প্রদীপ্ত চেতনা। একাত্তরের ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক আহমেদকে মন্ত্রিসভার সদস্য করে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের দক্ষ নেতৃত্বে নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং অর্জিত হয় বিজয় সূর্য।

www.pathagar.com

১৭ এপ্রিলের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সফল ও নির্বিঘ্ন করতে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন মেহেরপুরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী। তিনি এই অনুষ্ঠানের কথা জানতে পারেন ১২ এপ্রিল। এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন : "দিনের পর দিন মরণপণ যুদ্ধের পরও আমরা যখন কোনো স্বীকৃতি পাচ্ছি না, তখন আমাদের মনোবল ভাঙতে শুরু করে। এমন এক সংকটজনক দিনে আমরা খবর পেলাম, বাংলাদেশ সরকার ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করবেন।" শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মঞ্চ নির্মাণ, বাঁশের পাতা দিয়ে বেষ্টনী তৈরি, চেয়ার-টেবিল জোগাড় ও আমবাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি কাজে সহযোগিতা করে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন স্থানীয়ভাবে গঠিত সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা। এ প্রসঙ্গে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি দোয়াজ আলী মাস্টার বলেন :

"১৬ তারিখের দুপুরের মধ্যেই মঞ্চসজ্জার আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি হৃদয়পুর ক্যাম্প থেকে চলে এলো। বৈদ্যনাথতলা ইপিআর ক্যাম্পের চৌকি এনে মঞ্চ তৈরি হলো। সারারাত বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে সব আয়োজন সম্পন্ন হলো।"

অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন আনন্দবাস গ্রামের বাকের আলী এবং বাইবেল পাঠ করেন ভবের পাড়ার পিন্টু বিশ্বাস। এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ইপিআর-আনসারের একটি দল জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। ইপিআর-আনসার দলের সদস্যরা ছিলেন মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসী। শপথ অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। জাতীয় সংগীত পরিবেশনায় যারা অংশ নেন তারা সকলেই ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী।

১৭ এপ্রিলের শপথ গ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতে সময় লাগে মাত্র দুঘণ্টা। এই দুঘণ্টার সময়ে মেহেরপুরের মুজিবনগরের মাটিতে রচিত হয় ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তাই মুজিবনগর স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অবিনাশী স্মারক।

মুক্তিযুদ্ধের তীর্থভূমি মুজিবনগরের প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের আবেগ অপরিসীম। মুজিবনগরকে বুকে ধারণ করে ভৈরব বিধৌত, সাধক-দরবেশদের স্মৃতি বিজড়িত মেহেরপুর জেলার মানুষ অনুভব করে গর্ব ও অতুলনীয় গৌরব। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের ঐতিহাসিক স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার একটি স্মৃতিসৌধসহ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল মুজিবনগরে একটি জাদুঘর নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম. মনসুর আলী 'বঙ্গবন্ধু তোরণ'-এর ফলক উন্মোচন করেন। ১৯৮৮ সালে এরশাদ আমলে নির্মিত হয় 'মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ'। স্থপতি তানভীর কবির পাকিস্তানি শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের ২৩ বছরকে প্রতীকায়িত করেছেন উদীয়মান সূর্যের আদলে নির্মিত এই স্মৃতিসৌধের ২৩ রশ্মির দেয়ালে। কেন্দ্রে রয়েছে স্বাধীনতার প্রতীক লাল সূর্য। এই লাল সূর্য একই সঙ্গে ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনাকেও ধারণ করে।

www.pathagar.com

১৯৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর থেকে মুজিবনগরে উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিশীল হয়। কমপ্লেক্সের আওতাধীন মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র। বাংলাদেশে মানচিত্র, অডিটোরিয়াম, পর্যটন মোটেল ভবনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকে উৎসাহ, উদ্দীপনার সাথে ১৭ এপ্রিল উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে আম্রকানন জনসমুদ্রে পরিণত হয় এবং বিশাল মেলা বসে। আয়োজন করা হয় লোকগান, সার্কাস, যাত্রাপালার। কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞান প্রযুক্তিমেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

পাকবাহিনীর আক্রমণে মেহেরপুর

হাজার বছরের যাপিত জীবন পেছনে ফেলে বাঙালির জীবনে নেমে আসে ২৫ মার্চের ভয়াল কালো রাত্রি। এ রাতে পাকিস্তানি সেনারা নির্বিচারে নিধনযজ্ঞ শুরু করে। পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যার খবর সর্বপ্রথম মেহেরপুরে আসে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হকের মাধ্যমে মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরীর কাছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষয়টি জাতীয় পরিষদ সদস্য সহিউদ্দিন ও স্থানীয় নেতাকর্মীদের অবহিত করেন। সবাই মিলে অতি দ্রুত প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তৌফিক-ই-এলাহীর নির্দেশে আমঝুপি, বারাদী, রাজনগর, গাংনী এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও বন্দুক বাহিনী গঠিত হয়। ২৬ মার্চ মহকুমা প্রশাসক তার কার্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ২৭ মার্চ একদল বিক্ষুব্ধ জনতা অবাঙালি ইপিআর আকরাম খানকে হত্যা করে গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্ত ফাঁড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে।

মেহেরপুরে গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি

কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলা দখলদার বাহিনীর দখলে চলে যাবার পর ১৮ এপ্রিল তারা চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুর অভিমুখে রওনা হয় এবং আমঝুপিতে বর্বরোচিত হামলা চালায়। এতে অসংখ্য মানুষ নিহত হয় এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। আক্রান্ত জনসাধারণ ভিটেমাটি, ঘর-গৃহস্থালি ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয় নেয়। দেশত্যাগী যুবক-তরুণরা প্রশিক্ষণের জন্য আশ্রয় নেয় হৃদয়পুর যুব অভ্যর্থনা ক্যাম্প, বেতাই ক্যাম্প, শিকারপুর ক্যাম্প এবং করিমপুর ক্যাম্পে। মেহেরপুরের আওয়ামী লীগ নেতা সহিউদ্দীন, রমজান আলী আসকারী পটল, খাদেমুল ইসলাম বেতাই যুব ক্যাম্প, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (গাংনী) নুরুল হক শিকারপুর যুব ক্যাম্প, গাংনী থানা আওয়ামী লীগ নেতা হিসাব উদ্দীন করিমপুর ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করেন। এরা ছিলেন মেহেরপুর জেলার মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক এবং এদের নেতৃত্বে বিশাল মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনীর এই সদস্যরা মেহেরপুর জেলা এবং জেলার বাইরে দূরবর্তী রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন, কেউ কেউ শহীদ হয়েছেন। দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই বাহিনীই বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এ অংশ নিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

মেহেরপুর জেলার নির্যাতন কেন্দ্র, বধ্যভূমি, গণকবর এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মারক

ক. নির্যাতন কেন্দ্র

পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী গোটা বাংলাদেশকেই পরিণত করে এক বিশাল নির্যাতন কেন্দ্রে। ১৮ এপ্রিল পাকবাহিনী মেহেরপুরে ঢোকার পর যে সব নির্যাতন কেন্দ্র গড়ে তোলে তা নিম্নরূপ:

১. মেহেরপুর থানা পরিষদ : এটি জেলার প্রথম নির্যাতন কেন্দ্র।
২. মেহেরপুর সরকারি কলেজ : জেলার সর্ববৃহৎ নির্যাতন কেন্দ্র।
৩. ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
৪. কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল
৫. কালাচাঁদপুর ঘাট
৬. গাংনী থানা পরিষদ
৭. কাথুলি ভাটপাড়াকুঠি
৮. বামন্দী, তেরাইল নির্যাতন কেন্দ্র।

খ. গণহত্যা

পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় নয় মাসব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে। তারা একই দিনে একই স্থানে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে। মেহেরপুর জেলায় যেসব গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে ১৮ এপ্রিলের আমঝুপি গণহত্যা, ওয়াপদা মোড় গণহত্যা, ২৮ জুলাই জোড়পুকুরিয়া গণহত্যা, ২ জুন কাজীপুর গণহত্যা, বুড়িপোতা গণহত্যা, ১৭ মে শালিকা গণহত্যা, হিন্দা গণহত্যা, বাগোয়ান রতনপুর গণহত্যা, ১৫ আগস্ট ভাটাপাড়া কুঠি গণহত্যা উল্লেখযোগ্য।

গ. গণকবর

মেহেরপুর জেলায় যে সব গণকবর রয়েছে তা নিম্নরূপ:

১. মেহেরপুর কলেজ মোড়
২. মেহেরপুর কোর্ট বিল্ডিং
৩. সাহারবাটির টেপুখালি মাঠ
৪. কাজীপুর
৫. কোলা
৬. সোনাপুর
৭. বাগোয়ানের মাঝপাড়া
৮. বামন্দী।

ঘ. মেহেরপুর জেলার যেসব স্থানকে বধ্যভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে :

১. মেহেরপুর কলেজের উত্তরে বিস্তৃত খোলামাঠ
২. মেহেরপুর কলেজ হোস্টেলে এবং সংলগ্ন উত্তরপূর্বের বিস্তৃত খোলা মাঠ।
৩. বামন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪. ভাটপাড়া কুঠি

www.pathagar.com

৫. কালাচাঁদপুর ঘাট
৬. নাটুদাহ হাই স্কুল।

ঙ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মেহেরপুর জেলার অবদান অসামান্য। তথাপি মেহেরপুর জেলায় দু-তিনটির বেশি মুক্তিযুদ্ধের স্মারক নির্মিত হয়নি। জেলার মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সমূহের মধ্যে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ উল্লেখযোগ্য।

আর দ্বিতীয় প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন হচ্ছে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের দক্ষিণে কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহিদ স্মৃতিসৌধ। মুক্তিযুদ্ধের এই স্মারক বা স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয় মুক্তিযুদ্ধে নাম না জানা শহিদদের গণকবরের উপরে।

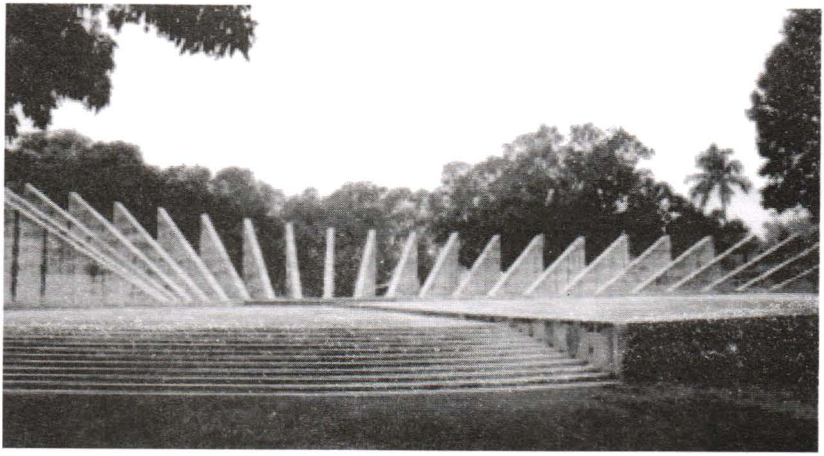

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

ঢ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আকালি বিশ্বাস (১৮৬০-১৯৩০)

মেহেরপুরের লোকগানের ধারায় এক অনন্য নাম আকালি বিশ্বাস। তিনি ছিলেন একাধারে কবিয়াল, পালাকার ও জারিগানের পদকর্তা। প্রত্যুৎপন্ন বাক-শিল্পী হিসেবে তাঁর সমসময়ে আকালি বিশ্বাসের বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর ছিল। তাঁর জন্ম মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে। আকালি বিশ্বাসের পিতা মাধব বিশ্বাস ছিলেন ভাবুক, রসিক এবং কবিগানের সমঝদার। তিনি আমদহ এলাকার তৎকালীন জমিদার রমণীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেরেস্তায় গোমস্তা হিসেবে কাজ করতেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য কবিগান, পালাগান ও ধুয়া-জারিগানের পদ। তিনি নিজে ছিলেন শক্তিমান কবিয়াল ও বয়াতি। গানের দল

www.pathagar.com

নিয়ে কলকাতা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, বীরভূম, নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কবির লড়াইয়ে, পালায় অংশ নিয়েছেন। আকালি বিশ্বাসের রচিত গানের বিশাল ভাণ্ডার তাঁর প্রপৌত্র প্রকৌশলী কবি ফজলুল হক সিদ্দিকীর সংরক্ষণে আছে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। আকালি বিশ্বাসের পুত্র গোলাপ বিশ্বাস (১৯০৩-১৯৬৮) পৌত্র বদর উদ্দীন বিশ্বাস (১৯২৯-২০০১) ছিলেন কবিয়াল ও পালাকার এবং প্রপৌত্র ফজলুল হক সিদ্দিকী একজন শক্তিমান কবি। আকালি বিশ্বাসের কবিগানের ধারাটি মেহেরপুরে আজও বহমান রয়েছে।

গোফুর মুন্সি (১৮৮১-১৯৪০)

লোকসংগীত সাধনা, বিশেষ করে কবিগান, পালাগান, ধুয়া-জারিগানের ক্ষেত্রে এক অনন্য নাম আব্দুল গোফুর মুন্সি। তিনি ১৮৮১ সালে মেহেরপুরের প্রাচীন জনপদ বাগোয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি ও বাকশিল্পী। তাঁর পরিচিতি মূলত জারিগানের পদকর্তা ও বয়াতি হিসেবে। তাঁর ধুয়া জারিগান এত লোকপ্রিয়তা অর্জন করে যে একশত বছর পরও মেহেরপুরের লোকজীবন ও সংস্কৃতিতে এগুলো টিকে আছে। "একশত বছরের অধিককাল ধরে তাঁর রচিত গান মেহেরপুরের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ভক্তজনের মুখে মুখে আছে। এখনো পর্যন্ত তাঁর গান গেয়ে অনেক ভক্ত ও গায়েন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।"[১৮]

গোফুর মুন্সির গানে বিবিধ প্রসঙ্গের স্পর্শ পাওয়া যায়। তিনি পানি, চাষা, হনুমান, কুকুর, ভেড়া, ফুল ইত্যাদি বিষয়ে পদ ও গান রচনা করেন। সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি এ পদগুলি রচনা করেন।

আরজান শাহ (১৮৮৫-১৯৫৮)

লালন-উত্তর মরমি ভাবুকতার অন্যতম প্রধান পুরুষ আরজান শাহ নদীয়া (বর্তমান মেহেরপুর) জেলার তেহট্ট থানার ইছাখালী গ্রামে ১৮৮৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, মদন বাউলের মতো আধ্যাত্ম সাধক, পদকর্তা, সুগায়ক ও বয়াতি। তাঁর পিতা মিঠুন বিশ্বাস ছিলেন সচ্ছল কৃষক এবং মাতা সানু বিবি ছিলেন স্নেহময়ী মমতাময়ী রমণী। মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত অনাগ্রহ ও সমসাময়িক প্রতিবেশগত কারণে আরজান শাহের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা বেশি দূরে এগোয়নি।

তবু ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। ইসলামি সুফিবাদ, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। আর এসব কিছুর সমন্বয়ে তিনি গড়ে তোলেন মানবতা ও মানুষ তত্ত্ব। তিনি ১৯৫৮ সালে নিজ গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। মৃত্যুকালে রেখে যান সহধর্মিণী কমলাজান, এক পুত্র, দুকন্যাসহ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা ও যশোর অঞ্চলের অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগীকে। তাঁর দুকন্যা লতিফা খাতুন ও জাহানারা খাতুন জীবিত আছেন। আরজান

www.pathagar.com

শাহের প্রথম কন্যা লতিফা খাতুন বললেন, "আমাদের কেউ খোঁজ নেয় না। বাবার মাজারটি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মাঝামাঝি স্থানে হওয়ায় মেরামতের অভাবে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অথচ এই সাধককে নিয়ে উৎসব হয় গৌঘাটা (নদীয়া), বেলডাঙ্গা (মুর্শিদাবাদ), ডোমপুকুর (মুর্শিদাবাদ) সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে"। তিনি দুঃখ করে বললেন, "মেহেরপুরের শিক্ষিত মানুষ বাবাকে চেনে না, কেউই বাবার গানগুলি সংরক্ষণের জন্য এগিয়ে আসেনি।"

আরজান শাহ ছিলেন যথার্থই একজন শক্তিমান পদকর্তা, সুগায়ক ও তত্ত্বজ্ঞ তিনি মধ্য বয়স থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অসংখ্য পদ ও গান রচনা করেন। কিন্তু তাঁর গানের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। বিহার-এর ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের অধ্যাপক বিমল মুখোপাধ্যায় বের করেন 'আরজান শাহ পদাবলি' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ। সংকলনটির প্রকাশক ছিলেন নদীয়ার পরানপুর গ্রামের সহজিয়া সংঘের প্রধান এনায়েতুল্লাহ বিশ্বাস। সংকলক আরজান শাহের গানেরই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন ইছাখালি গ্রামের সৈফতুল্লাহ মাস্টারের কাছ থেকে। মাস্টার সাহেব ছিলেন আরজান শাহের ভাবশিষ্য এবং পেশায় প্রাইমারি শিক্ষক। সংকলনটির একটি সংস্করণ কৃষ্ণনগর থেকে মুদ্রিত হয়। তবে এর কোনো কপি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। তাঁর গান মেহেরপুরের বিভিন্ন আখড়া-আশ্রম এবং সাধুসঙ্গে সাধু ভক্তরা গেয়ে থাকেন। এ গান ছাড়া কোনো আখড়া চলে না, সাধুসঙ্গ হয় না। লোকগবেষক আবুল আহসান চৌধুরী তাঁকে শক্তিমান পদকর্তা ও গায়ক হিসেবে শনাক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'উত্তর লালনিক পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় দুদ্দু শাহ (১৭৯৬-১৯০৭), কুবির গোসাঁই, যাদুবিন্দু, মেহের শাহ, পাঞ্জু শাহ (১৮০৫-১৯১৪), গগন হরকরা, গোসাঁই গোপাল (১৮৬৯-১৯১২), মনোমোহন (১৮৭৭-১৯০৯), ও আরজান শাহের (১৮৮৫-১৯৫৮)।'[১৯]

আরজান শাহ ছিলেন গূহ্য সাধন-ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসী এক জাতবাউল। যিনি প্রথাগত ধর্মের বাইরে দাঁড়িয়ে মানবতা, মানুষতত্ত্ব ও আনন্দময় জীবনের গান গেয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এই জাতবাউলের খোঁজ পাননি অধ্যাপক মনুসর উদ্দীনের মতো লোকসবেষণার পথিকৃৎ ও সংগ্রাহকেরা। আর সে কারণে 'হারামনি' তে স্থান পায়নি আরজান শাহসহ মেহেরপুরের বাউল-বৈষ্ণবদের উঁচুমানের গান ও পদাবলি। 'হারামণি'র অষ্টম খণ্ডে (১৯৭৬) প্রায় আট-নয় শ গান রয়েছে। কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা প্রভৃতি জেলার গান এতে স্থান পেয়েছে।'[২০]

কিন্তু মেহেরপুরের বাউলগান, কবিগান, জারিগান, বিশেষ করে আরজান শাহের গান এতে স্থান না পাওয়ার বিষয়টি মেহেরপুরের বাউল সাধকদের বিস্মিত করে। মেহেরপুরের বাউল সাধক আরফাত শাহ (৮৫) বলেন, শুনেছি হারামণিতে স্থান পেয়েছে বায়ান্ন-তিপান্ন জন মহৎ-মহাজন, সাধু গুরুর গান। কিন্তু আরজান শাহের গান এতে নেই। কেন যে নেই বুঝতে পারলাম না।

আরজান শাহ মনে করতেন, মানুষ প্রবৃত্তিসম্পন্ন জীব। মানুষের দেহে পশুদেহের মতো আহার, নিদ্রা, মৈথুন বিরাজ করে। মানবদেহে বিরাজিত পশু স্বভাব দূর করার

www.pathagar.com

জন্য আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন, আর এ সম্পর্কিত দীক্ষা দানের জন্য জগতে নবী-রসুল, মহাপুরুষগণ আসেন। মনকে বিষয়মোহের চক্র থেকে মুক্ত করতে না পারলে পশুজীবন প্রলম্বিত হয়। তাই আরজান শাহ মনকে বিষয় মোহ থেকে মুক্ত হয়ে মহামানব হয়ে ওঠার ডাক দিয়েছেন তার গানে, লোক কবিতায়।

বাউল সাধনা মূলত গুরুবাদী সাধনা। গুরু তাদের কাছে 'তন্ত্রের তন্ত্রী; 'মন্ত্রের মন্ত্রী'। আরজান শাহ শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নদীয়ার শরডাঙ্গা গ্রামের পাঞ্জু শাহর ঘরের সাধক চাঁদপতির কাছে। তাঁর গানের ভণিতায় চাঁদপতিকে খুঁজে পাওয়া যায়। দৈন্য ছাড়াও রচনা করেছেন অসংখ্য দেহতত্ত্বের গান। সকল সাধকদের মতো তিনিও দেহকে তীর্থের তীর্থ বলে মনে করেছেন। মানবদেহে পবিত্র নদী সরোবরের সন্ধান পেয়েছেন।

আরজান শাহ এক শুদ্ধতম সাধকের নাম, যিনি একাধারে বিশিষ্ট পদকর্তা, অগ্রগামী গায়ক এবং উঁচুদরের তত্ত্ব-বিশ্লেষক ছিলেন। জীবৎকালে রচনা করেন তিনশ'র মতো গান। এই মহামূল্যবান গানগুলির কথা ও সুর অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করা যায়নি। যদি সংরক্ষণ করা যেত তবে আমরা পেতাম লালন-গগন-পাঞ্জু-দুদ্দু শাহর মতো আরেক সাধক ও সুগায়ককে।

গরীব উল্লাহ শাহ (১৮৯৭-১৯৯৭)

মরমি ভাবুকতার শিরমণি লালন সাঁই-এর তিরোধানের সাত বছর পর মেহেরপুর জেলার গাংনীর সীমান্তবর্তী গ্রাম ভৈরবপাড়ের কাথুলীতে জন্মগ্রহণ করেন বয়াতি, বাকশিল্পী, বাউলসাধক গরীব উল্লাহ শাহ। পিতা খাতের আলী বিশ্বাস ছিলেন সচ্ছল কৃষক। এক সময় যাত্রাদলে মেয়েরা আসতো না বলে গরীবুল্লাহ পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। যাত্রা করতে গিয়ে তার গান শেখা। এরপর বাউল সাধকদের গান শুনে তিনি লালন ঘরানায় বায়াত হন। তারপর গানে গানে ভেসে বেড়ান আখড়ায়-আখড়ায় এবং নানা আসরে। ১৮৯৭ সালে জন্ম নেয়া এই বয়াতি, পদকর্তা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র চার ক্লাশ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগেই পড়াশুনা শেষ হয়ে যায়। যৌবনের প্রারম্ভে কুষ্টিয়ার মহেশকুণ্ডির লালন ঘরানার সাধক মহেশ পণ্ডিতের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

বাউলাঙ্গ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি অসংখ্য গান ও পদ রচনা করেন। তাঁর গান ও পদ সমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যায়নি। তবে বিভিন্ন আসরে বয়াতিরা গরীবুল্লাহ্‌র গান পরিবেশন করে।

গরীব উল্লাহ শাহ তার অধ্যাত্ম সাধনাকে নিরস তত্ত্বের গণ্ডির মধ্যে আটকিয়ে রাখেননি। বিচিত্র ভাবরসে তিনি তাঁর জীবন ও সাধন জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে জটিল বিষয়কে সহজ করে প্রকাশ করার শিল্পগুণ ও দক্ষতা তাঁর ছিল। ১৯৯৭ সালে গরীবউল্লাহ শাহ দেহত্যাগ করেন। তিরোধানের পর তাঁকে নিজ আখড়া বাড়িতে সমাহিত করা হয়। ১১ মাঘ তাঁর প্রয়াণদিবসে সাধু ভক্তরা ভৈরব তীরবর্তী কাথুলী আশ্রমে সাধু সঙ্গের আয়োজন করে।

www.pathagar.com

ওলিদাদ মুন্সি (১৯০৪-১৯৮৬)

মেহেরপুরের কবিগান, পালাগান, জারিগানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম ওলিদাদ মুন্সি (১৯০৪-১৯৮৬)। তিনি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন জমিদার নফর পাল চৌধুরীর নায়েব ছিলেন। তিনি পিতা গোফুর মুন্সির জারিগান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন এবং লোকসংগীতের এ ধারাটিকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলেন। তাঁর কৃতিত্বে ধুয়াজারি মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে দারুণভাবে লোকপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বাগোয়ান জারিগানের পীঠস্থানে পরিণত হয়। আজও তাঁর গান এ অঞ্চলের গায়েন ও লোকজীবনে মুখে মুখে ফেরে।

ফকির দবির উদ্দীন শাহ (১৯০৭-২০১১)

আখড়া বাড়ি, সাধন পীঠ, শোকার্ত ভক্তকূল, লালনের গান পিছনে ফেলে অসীমের পথে চলে গেলেন লালনের ছায়া ফকির দবির উদ্দীন শাহ। ৭ আগস্ট (২৩-শ্রাবণ ১৪১৮) বৃষ্টিস্নাত রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'শতাব্দীর সমান বয়সী' এই সাধক গায়কের আখড়া বাড়িটি ছিল সাধুর সাধবাজার।

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণকারী দবির শাহের পিতা তৈয়ব আলী ছিলেন এলাকার প্রভাবশালী জোতদার। আশৈশব সংসার বিবাগী দবিরের এক সময় নেশা ছিল বিভিন্ন আসরে পালাগান গেয়ে বেড়ানো আর গান বাঁধা। গানে গানেই শেষ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সব বিষয়-সম্পত্তি। অবশেষে আশ্রয় নেন মোফাজ্জল ফকিরের বাড়িতে। দবির শাহের গুরু মোফাজ্জেল শাহ আর দাদা গুরু সাধন শাহ। সাধন শাহের গুরুর নাম আব্দুল্লাহ। আর আব্দুল্লাহ লালনের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম। এক সময় গান বেঁধে ভক্তকূলকে তিনি শোনাতেন, অন্তিমকালে লালনের গান দিয়ে সাধন ভজন করতেন। মেহেরপুরের দিঘির পাড়ার সাধক আরাফাত শাহ (৮৫) বলেন, "দবির কোনো কাঁচা গান গাইতেন না, তত্ত্বওয়ালা ভারী ভারী গান গাইতেন এবং বাঁধতেন।"

গান-ধ্যান, জপ-তপে নিমগ্ন এই সাধক সহধর্মিনী সারোজান বিবিকে খুব ভালবাসতেন। অন্তিম অভিপ্রায় ছিল : ১০ অগ্রহায়ণ সারোজান বিবির প্রয়াণদিবসে সাধুসঙ্গটা বড় আকারে করা, ইচ্ছাটা তার পূরণ হলো না। দবির উদ্দীন শাহ সম্পর্কে আজাদুর রহমান লিখেছেন :

এখানে এসে দেখলাম
শাখা পরে শুয়ে আছে নদী
দুই কূল ছপ ছপ পানি
মধুমাস মধুময়
শামুকেরা চেটে খায়
রুপোলি সময় পড়ে আছে
নিহার বিন্দু জীবনেরই বিটপ
এসেছিলাম-বেসেছিলাম-চলে গেলাম।[২১]

www.pathagar.com

ছাকেন উদ্দীন (১৯১২-১৯৯৪)

মেহেরপুর জেলার প্রখ্যাত বয়াতি কবিয়াল ছাকেন উদ্দীনের জন্ম মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাধীন পাকুড়িয়া গ্রামে। তাঁর পিতা জেহের শেখ ছিলেন অবস্থাসম্পন্ন কৃষক। ছাকেনউদ্দীন মুখে মুখে গান বাঁধতে পারতেন এবং তা আসরে আসরে গেয়ে ফিরতেন। তিনি প্রায় দুশত পদ রচনা করেন। নানা বিষয় নিয়ে তিনি গান রচনা করেন যেগুলি ভাব ঐশ্বর্যে ছিল অসাধারণ। বয়াতিপুত্র অধ্যাপক সালাউদ্দীন বলেন : "বাবা অসংখ্য গান রচনা করেছেন, কিন্তু তার গানগুলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ করা যায়নি। তাঁর শিষ্য ধানখোলা গ্রামের আনেস এর কাছে কিছু গান সংরক্ষিত আছে।" ছাকেনউদ্দীন গান শিখেছেন গ্রামের অজিত কর্মকার এবং কসবার আজিজ মীরের কাছে। বয়াতি হলেও তিনি ছিলেন অধ্যাত্ম সাধক ও তত্ত্বজ্ঞ। প্রথম যৌবনেই তিনি মেহেরপুরের রাজাপুর গ্রামের ফকির করিম শাহর নিকট ফকিরি মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু করিম শাহ ও সাধু-দরবেশদের সাহচর্য লাভ করে তিনি রপ্ত করেন গুরুতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব, বৈষ্ণব পদাবলি, শরিয়ত-মারফতির ভেদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

তিনি মূলত কবিয়াল, ধুয়াজারির পদকর্তা ও গায়ক হিসেবে পরিচিত। তবে ধুয়া জারির গায়ক হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা। ছাকেনউদ্দীন মনে প্রাণে একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন। তার গানে যেমন ইসলামি সুফিবাদের প্রভাব আছে, তেমনি বৈষ্ণব পদাবলির ছাপও কম নেই।

বাংলার জারি গানের গায়ক ও পদকর্তারা অধিকাংশই মুসলমান। ধুয়া জারি গানের সফল গায়ক ও প্রবর্তক পাগলা কানাইও মুসলমান ছিলেন। নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে ছাকেনউদ্দীন গানে গানে মানুষকে নামাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ছাকেনউদ্দীন সারাজীবনে বিশাল সংগীতভুবন সৃষ্টি করেন যা সংরক্ষণ করে রাখা যায়নি। লোকরঞ্জন যা ব্যক্তিগত অনুভবের জায়গা থেকে তিনি যে সব পদ রচনা করেন সেগুলি ভাব ও শিল্পগুণে অসাধারণ।

দায়েম বিশ্বাস (১৩০৪-১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)

মেহেরপুরের কবিয়াল ও বয়াতিদের মধ্যে দায়েম বিশ্বাস ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর জন্ম মেহেরপুরের হিতিমপাড়া গ্রামের এক কবিয়াল পরিবারে। তাঁর পিতা ইছারুদ্দীন ছিলেন ধুয়াগানের নামকরা বয়াতি ও গীতিকার। পিতার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে দায়েম বিশ্বাস ধুয়া ও কবিগানে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেন। পূর্বে কবিগান ছিল হিন্দু পুরানভিত্তিক, তিনি কবিগানে মুসলিম ঐতিহ্য-ইতিহাসকে যুক্ত করে ভিন্ন ব্যঞ্জনা প্রদান করেন।

আসরে গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাৎক্ষণিক পদ রচনার অসাধারণ কবিত্বশক্তি তার মধ্যে ছিল। তাঁর দুই পুত্র রমজান আলী ও কমরুদ্দীন আসর মাতানো কবিয়াল হিসেবে তার জীবৎকালে খ্যাতি অর্জন করেন। দায়েম বিশ্বাসের গান, পদ, পাঁচালি, ছড়া ব্যতীত আজও মেহেরপুরের কবিগান ও ধুয়াগানের আসর জমে না।

www.pathagar.com

আজাদ শাহ্ (১৯১৫-১৯৮৭)

মরমি সাধক ও চারণ কবি আজাদ শাহের জন্ম নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার হরিপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। তাঁর পিতা জমাদার বিশ্বাস ছিলেন প্রভাবশালী জোতদার। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর আজাদ শাহ্ সপরিবারে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার সাহারবাটি গ্রামে চলে আসেন। তাঁর সময়ে তেহট্ট থানার গ্রাম এলাকায় আউল-বাউল, ফকির-দরবেশ, বৈষ্ণবদের বসবাস ছিল। শৈশবে বিভিন্ন ঘরানার সাধকদের সান্নিধ্য এবং বিভিন্ন লোকধর্মের প্রভাবে জগৎ-জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। নানা দিক থেকে নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। মনের মধ্যে জন্ম নেয় ঈশ্বর, পরকাল, শাস্ত্র, লোকাচার সম্পর্কে অনন্ত কৌতূহল। এই কৌতূহল আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে তিনি কখনও শাস্ত্রধর্মের প্রতি আস্থা রেখেছেন আবার কখনও ধর্মশাস্ত্র বিমুখ হয়েছেন। তবে ধর্মের মৌলিক সত্য আবিষ্কারে তিনি ছিলেন এক অনন্য পুরুষ।

আজাদ শাহের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশিদূর এগোয়নি ব্যক্তিগত অনাগ্রহের কারণে। তথাপি ধর্মদর্শন, বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। উচ্চমানের সাধক হিসেবে লালন শাহসহ অপরাপর মরমি সাধকদের জীবনাদর্শ, সুফিবাদ, অবতারবাদ, দেহাত্মবাদ, গুরুবাদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও তার জ্ঞান ছিল। তিনি ২৭-আগস্ট ১৯৮৭ (১০-ভাদ্র, ১৩৯৪) সাহারবাটি গ্রামে শিষ্য রশিদ ফকিরের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর ইসলামি শরা মতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। পরবর্তী দুই মাস পর পুত্র আবদুল মজিদ সমাধি নিজ বাড়িতে স্থানান্তর করেন।

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করেও আজাদ শাহ্ ছিলেন মানব ধর্মে বিশ্বাসী এক জাত বাউল। লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহ্, দুদ্দু শাহ্, কুবির গোসাঁই এর মানবতাবাদী ভাবদর্শনের উত্তর সাধক হিসেবে তিনি মনে করতেন :

মানুষ হয়ে মানুষ মানো।
মানুষ হয়ে মানুষ জানো।
মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতন ধন।

তিনি মানুষতত্ত্বকে সত্য জেনে 'মানুষের অন্বেষণ' করতে গিয়ে মেহেরপুরের ইছাখালি গ্রামের আরজান শাহ্-এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। আরজান শাহ্ ছিলেন সতীমা ঘরানার অধ্যাত্ম সাধক, সুগায়ক ও পদকর্তা। তবে তার মরমি ভাবনায় চিশতিয়া তরিকারও প্রভাব ছিল। আজাদ শাহ্ খিলকা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরের ভব গোসাঁই-এর কাছে।

সাধক আজাদ আক্ষরিক অর্থে গৃহী বাউল হলেও সংসারী ছিলেন না। সংসার ও পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী ছিলেন না, তাই সংসারের প্রতি তিনি কখনো আকর্ষণ বোধ করেন নি। তদুপরি স্ত্রী জমিলা খাতুনের অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক মৃত্যু তাঁকে দিশাহারা করে দেয়। সংসারের প্রতি মোহ একেবারেই হারিয়ে ফেলেন। সাধন-ভজন-আখড়া-আশ্রমে গান ও তত্ত্ব আলোচনায় খুঁজে পান জীবন-জগতের

www.pathagar.com

অর্থময়তাকে। তিনি প্রায় তিনশ গান ও পদ রচনা করেন। তাঁর সব গানের কথা, সুর অবিকৃতভাবে সংগ্রহ করাও যায়নি। সম্প্রতি আবদুল্লাহ আল আমিন 'আজাদ শাহের পদাবলি' নামে তাঁর গানের একটি সংকলন বের করেছেন।

বাউল ধর্ম মূলত গুরুবাদী ধর্ম। এই ধর্মে তত্ত্ব-দর্শন অপেক্ষা ভক্তিযোগ ও সাধনতত্ত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশি। "গুরুকে তারা দুই রূপে দেখে-মানব গুরুরূপে আর পরম তত্ত্ব বা ভগবান রূপে। তাদের গানে দুই রূপের নিদর্শন পাওয়া যায়। মানব গুরুর প্রতি ভক্তি নিষ্ঠা না হইলে সর্বোচ্চ গুরু ভগবানের অনুগ্রহ লাভ হয় না।"[২২]

তাঁর কাছে গুরু হলো অমূল্য সম্পদ, যিনি সকল শক্তির আধার, তিনি পারেন ভক্তকে পথ দেখাতে। এ কারণে বারবার গুরুর শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি।

বাউলরা মানবদেহকে পরম ধন হিসেবে কল্পনা করেন। বাউলের সাধনা মূলত দেহাত্মবাদী সাধনা। তাঁরা মনে করেন—'যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। দেহের মন্দিরেই তারা প্রাণের মানুষের সন্ধান করে। দেহের মাঝারে মনের মনুষ আলেক সাঁই, রসের মানুষ, সাঁই নিরঞ্জন-এর অধিষ্ঠান। মানব দেহের মক্কা-মদিনায় অধিষ্ঠিত আল্লাহ বিচিত্ররূপে তার লীলা প্রকাশ করেছেন। দেহের সাধন দ্বারাই অজানাকে জানা যায় বলে বিশ্বাস করতেন।

বৈষ্ণব দর্শনের সারাৎসার ও রস ফকির আজাদ শাহকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বৈষ্ণব কবিদের মতো তিনিও রাধা-কৃষ্ণের লীলারূপ নানাভাবে নানা ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন তাঁর গানে। রাধা-কৃষ্ণ ও সখীগানের রাগ-অনুরাগ, প্রেমভক্তি প্রকাশিত হয়েছে শৈল্পিকভাবে আজাদের পদাবলিতে।

শব্দ যদি গান বা কবিতার জয়শ্রী হয়, তাহলে আজাদের গান সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে শিল্প গুণে অনন্য। আটপৌরে ও সহজ সরল শব্দ ও তার গানে নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। যেমন,

তুমি এসো হে দয়াল দেখ বেহাল।
কাঙাল বলে আমার ফেলো না।
আবার, তরীর উপরে খুব রূপের ছটা, তলায় দেখি তক্তা ফাটা,
ডুবে মলো আজাদ বেটা, এখন আরজানের দিচ্ছে দোহাই।

এসব সহজ সরল ও আঞ্চলিক শব্দের মধ্যে কত যে অতলান্তিক তাৎপর্য ও নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে তা ভাবতে গেলে বিস্ময় জাগে। তিনি তাঁর গানে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি শব্দও ব্যবহার করেছেন অনায়াসে। আজাদ শাহের গান গেয়ে অনেকেই শিল্পী ও গায়ক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী সাহারবাটির রবিউল ইসলাম তাঁর গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন।

মাতু ফকির (১৯১৭-২০০৮)

মাতু ফকিরের পিতৃদত্ত নাম গোলাম রহমান, উত্তরকালে সাধক জীবনে মাহতাব চিশতি নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে অধ্যাত্ম সাধক, সুগায়ক ও পদকর্তা। তিনি ১৯১৭ সালের ৩০ জানুয়ারি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাথাভাঙ্গা

www.pathagar.com

বিধৌত আকবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হাজী এলাহী বক্সো বিশ্বাস ছিলেন মেদিনীপুর এস্টেটের জমিদার এবং ইসলাম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। জন্মসূত্রে মাতু ফকির পেয়েছিলেন উনিশ শতকীয় সামন্ত সংস্কৃতি ও ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলন প্রভাবিত ইসলামি ভাবাদর্শের উত্তরাধিকার। কিন্তু পারিবারিক প্রতিবেশের ঘেরটোপের মধ্যে নিজেকে আটকিয়ে রাখেননি। তার দ্রোহী মন শাস্ত্র-ধর্ম শাসিত সব ধরনের লোকাচার, আনুষ্ঠানিকতা এবং পারিবারিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তীক্ষ্ম অনুভব-অনুভূতি সম্পন্ন এই মানুষটি সব সময় সহজ, সাদাসিধে জীবনযাপন করতে পছন্দ করতেন। পোশাক-আশাক-অবয়বে তিনি তাঁর ধর্মভাবনা ও অধ্যাত্ম চিন্তাকে ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন। তাঁর দীর্ঘ চুল এবং পুরু গোঁফের তাৎপর্য ছিল বলেই মনে হয়। ইসলামি সুফি প্রবর্তনার সাধকদের মানবিক চেতনা এবং বাঙালি বাউল ধারার যোগী-সাধুদের সহজিয়া সাধনার সমন্বয়ে এক প্রতীকী মূর্তিকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন সারা জীবন। বিত্ত-বৈভব থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত অনাগ্রহ ও তৎকালীন মুসলমান সমাজের পশ্চাদমুখী ভাবনার কারণে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগেই পড়াশুনার পাট চুকে যায়। তবে আরবি, ফারসি ভাষার উপর বেশ দখল ছিল। কোরআন, হাদিস, ইসলামি ফিকাহ শাস্ত্র, হিন্দু পুরাণ, অবতারবাদ, বৈষ্ণব সাহিত্যে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান।

মুসলমান সমাজের চিন্তার দীনতা, কূপমণ্ডূকতা ধর্মীয় বিষয়ে স্থূলতা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেননি তিনি। পিতা এলাহী বকসো বিশ্বাস বাউল ধর্ম ও সংস্কৃতি বিরোধী ছিলেন প্রচণ্ডভাবে, তবু প্রথম যৌবন থেকেই তিনি আখড়া-আশ্রমে ঘুরেছেন এবং বাউলের আসরে বসে গান শুনেছেন। গানের তালিম নেন নিজ গ্রামের বাউল সাধক ও গায়ক আইজুদ্দীন ফকিরের কাছে। বাউল সাধক ও গায়ক বেহাল শাহ, অমূল্য গোসাঁই, শুকচাঁদ ফকির, নইমুদ্দীন শাহের গান শুনে তিনি মরমি ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হন। প্রথম যৌবন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি ছিলেন সত্যের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে অনুরাগী। তাই জগৎ-জীবনের সত্যকে আত্মস্থ ও উপলব্ধি করার জন্য ঘুরেছেন বিভিন্ন আখড়া-আশ্রম ও সিলসিলায়। মাতু ফকিরের ভাবশিষ্য হাটবোয়ালিয়া স্কুল ও কলেজের শিক্ষক আব্দুল মান্নান জানান, "মাতু ফকির প্রথম জীবনে খলিসাকুণ্ডির আব্দুল গফুর শাহের কাদেরিয়া তরিকায় বায়াত হন, পরবর্তীকালে কুষ্টিয়ার উদিবাড়ির চিশতিয়া তরিকার সাধক মনসুর আলী আল চিশতিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সুফি ধারার সাধক হলেও তাঁর মেলামেশা ছিল বেহাল শাহ, আরজান শাহ খোদাবক্সো শাহ, আজাদ শাহ এর মতো বাউল সাধকদের সাথে।" মাতু ফকির কেবল মরমি সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে সুগায়ক, সাধক ও পদকর্তা। লালন সাঁই, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, মেছের শাহের উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর গানে মানুষ ও মানবিকতার ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। মাতু ফকিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রেজাউল করিম বান্টু বললেন, "বাবা চিশতিয়া তরিকার সাধক হলেও আসরে-আখড়ায়-সাধু সঙ্গে গান গেয়ে বেড়াতেন। আসরে বসে গান বাঁধার মতো কবিত্ব শক্তি তাঁর ছিল। ছয় শতাধিক পদ তিনি রচনা করেছেন। অধিকাংশ গানে পির-পয়গম্বর, মসজিদ, দেল-কোরান, চৌদ্দ ভুবন, আঠারো মোকাম,

www.pathagar.com

নামাজ-রোজা, কল্পতরু, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।" শরিয়ত, মারফত, হকিকত, তরিকত প্রভৃতি সর্ববিধ বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। সব মরমি সাধকের মতো তাঁর গানের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গুরুবাদ। গুরুবাদে তিনি গুরুকে জীবনদাতা, অন্তর্যামী, জগৎস্বামী হিসেবে কল্পনা করেছেন।

গুরু যেহেতু সার্বভৌম শক্তির আধার, তাই কেবল তিনিই পারেন ভক্তকে ঘোর সংকট থেকে উদ্ধার করতে। তবে এর জন্য ভক্তকে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হয়। যেমন করেছিলেন হযরত আবুবকর (রা.) ও রাজা হরিশচন্দ্র।

মাতু ফকিরের অনেক গানই ভাব-ঐশ্বর্য ও ধ্বনি মাধুর্যে অনন্য। তাঁর গানগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে হয়তো আরেকজন লালন-পাঞ্জু-দুদ্দু-মেছের শাহকে পাওয়া যেতো। 'সুর দরিয়া-এপার-ওপার' অনুষ্ঠানের একটি পর্বে মাতু ফকিরের একটি গান আকুবপুরের গোলাম মোস্তফার কণ্ঠে শুনে সংগীতজ্ঞ ও সুরকার বাপ্পী লাহিড়ী এবং রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা মুগ্ধ হয়েছিলেন। গানটি হলো :

মা তোর লীলা বোঝা কঠিন
মাতৃরূপে এসব করো,
ধাত্রীরূপে নাড়ি কাটো।
মা তুমি সেজেছো কালি
ধন ভাণ্ডার লক্ষ্মীও বলি
কেন চাও মা পুত্র বলি।
ষষ্ঠীতে মা আসনে পায়
আবার দেখি পতিতালয়
বুঝতে সুজতে কেমন হয়
একী তোর লীলা বোঝা ভার।

মরমি সাধকেরা নারীকে জগজ্জননী, মহামায়ারূপে কল্পনা করেন। নারী ছাড়া সাধকের সাধন ভজনে সিদ্ধি লাভ হয় না। মাতু ফকির নারীকে মাতৃরূপে, শান্তি ও শক্তিরুপে কল্পনা করেছেন। দেবী দুর্গার উদ্দেশে নিবেদিত চণ্ডী পাঠ শুনেই সম্ভবত তিনি এ গান গেয়েছেন। চণ্ডীতে আছে : "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা নমস্তৈস্য নমঃ নমঃ। যা দেবী শক্তিরূপেন সংস্থিতা নমস্তৈস্য নমঃ নমঃ।" তবে মরমিদের গানের মর্ম কেতাবি জ্ঞান দিয়ে বোঝা যায় না, এর মর্মোদ্ধারের জন্য তত্ত্বজ্ঞ কামেল মুর্শিদের কাছে বায়াত হওয়া প্রয়োজন। তিনিও সারা জীবন জীবন-জগতের রহস্য, ধর্ম-অধর্মের ফারাক বোঝার জন্য শুদ্ধ প্রেমের রসিক হয়ে বারবার বিভিন্ন কামেল মুর্শিদের কাছে ছুটে গেছেন। শিক্ষা-দীক্ষা নিতে কখনও ছুটে গেছেন বাউল ঘরানার সহজিয়া সাধকদের কাছে, আবার কখনও শরিয়তপন্থি মওলানা কিংবা কাদেরিয়া-চিশতিয়া ধারার সুফিদের কাছে। অবশেষে বাউল-বৈষ্ণবদের সহজিয়া লোকদর্শনে স্নাত হয়ে থিতু হতে চেয়েছেন। তারপরও দিলের ধোঁকা কাটাতে পারেননি। নানা ধর্মমত ও দর্শনের অভিঘাতে নানা প্রশ্নবাণে নিজেকে বিদ্ধ করে সকল ধর্মের মর্মবাণীকে গানে গানেই প্রকাশ করেছেন।

www.pathagar.com

বাংলার বাউল ও মরমি সাধকরা চিরকাল ও অসাম্প্রদায়িকতা, মানবতা ও মানুষের গান গেয়েছেন। ধর্মের রূপক, উপমা ও প্রতীক ব্যবহার করে গান বাঁধলেও তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণরুপে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। তাই পাকিস্তানি রাষ্ট্রের অপদর্শন মাহিন শাহ, মাতু ফকিরেরা মানেননি। পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক রাজনীতি ছিল মরমি ভাবনা ও ভাবাদর্শের পরিপন্থি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মাতু ফকির 'পলিটিক্যাল মোটিভেটর' হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি সারা জীবন ছিলেন অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির একনিষ্ঠ সমর্থক ও কর্মী। লালন সাঁইজির যে গানটি তাঁর হৃদয়ে সব সময় বাজতো সেটি হলো :

এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যে দিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ খ্রিষ্টান
জাতি গোত্র নাহি রবে।

মানুষ ও মানবতার এই সাধক ১২-ডিসেম্বর ২০০৮ (২৮ অগ্রহায়ণ) দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী, পুত্র রেজাউল করিম, আনোয়ারুল করিম, এহসানুল করিম এবং অসংখ্য শিষ্য-ভক্তবৃন্দ। মাতু ফকিরের অছিয়ত অনুযায়ী তাঁকে ইসলামি শরা শরিয়ত মোতাবেক নিজ জমিতে সমাহিত করা হয়। প্রতি বছরে তাঁর প্রয়াণদিবসে সমাধিপ্রাঙ্গনে সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়।

হাবিল উদ্দীন বিশ্বাস (১৯২০-১৯৮৯)

কবিয়াল, বয়াতি ও পদকর্তা হাবিল উদ্দীন বিশ্বাস ১৯২০ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলাপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতার নাম ছমির বিশ্বাস। তিনি ছিলেন মেহেরপুর অঞ্চলের বড় মাপের কবিয়াল, বয়াতি ও সুরসাধক। মেহেরপুরেই ভবানীপাড়া গ্রামের কবিয়াল সুর্য নারায়ণ ভট্টাচার্যের কাছে কবিগান ও পালাগানের শিক্ষা নেন। হাবিল বিশ্বাস ধর্মে মুসলমান হলেও সূর্যবাবুর নাম করে সূর্য প্রণাম সেরে আসরে নামতেন। ভাষারীতিতে তিনি সনাতনপন্থি হলেও এই বয়াতি ও কবিয়াল যুক্তিতর্কে ও শাস্ত্র আলোচনায় ছিলেন পণ্ডিত। আসরে নামলে বোঝা যেত যে, তিনি কত বড়মাপের কবিয়াল ও বয়াতি ছিলেন। তাঁর গানের লেখ্যরূপ পাওয়া যায়নি। হাবিল বিশ্বাস রচিত ধুয়া মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে আজও চালু আছে।

তাঁর রচিত কয়েকটি পদ বেলতলাপাড়া নিবাসী আসকার আলী (৬০), সাহেব আলী (৩০)-এর কাছ থেকে পাওয়া গেছে। একটি গান :

ওগো গুরু দয়াময়, আমি তোমারে শুধাই
যখন দিন রজনী নাহি ছিল তখন ভানু কোথায় রয়॥
শুনবো বলে গুরুর কাছে রয়েছি আশায়॥
সাত রাতের নামটি বলো না, আমার শুনতে হয় বাসনা,
কোন নাম ধরে কাহার তরে ডাকে আরো রাব্বানা।
ভাণ্ড পুরে ছয়টি গহোর, কার নামে করে সাধনা॥

www.pathagar.com

ছয় গহোরে কি নাম ধরে, গুরুজি বলো আমারে।
মন মানুষের পাবো শরণ, কোন নাম নিলে পারে,
বিনয় করে বলো গুরু ভক্তের দ্বারে।

ধুয়ার আসরে 'উতর-চাপান' পদ্ধতিতে প্রশ্নমূলক ধুয়া পরিবেশন করা হয়। এসব প্রশ্নের জবাবে বয়াতির শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় ফুটে ওঠে। প্রশ্নমূলক একটি ধুয়ায় হাবিল বিশ্বাস গেয়েছেন :

শরিয়তের কয় চেহারা, মারফতের কয় মুকাম
ওরে জেনে শুনে কর দিনের কাম।
শরিয়তে ভাই মুরিদ হলে বল দেখি কার কাছে
শরিয়তের পিরের নামটি তোমার কাছে জানতে চাই।
এই ভবেতে উনি মাকে বিরাট বড় করিলো।
কিসে মা বড় হইল।
মায়ের আগে বাবার জন্ম দলিলে তাই লিখিল।
সত্য কি মিথ্যা কথা ভাই, আমি শুনি তাই ভাল।

প্রশ্নমূলক ধুয়াতে হাবিল বিশ্বাস ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিরোধ্য। তাঁর শাণিত প্রশ্নবাণে প্রতিপক্ষ বয়াতি কাবু হয়ে যেত। এক ধুয়ার আসরে তিনি হিতিমপাড়া নিবাসী বয়াতি ও কবিয়াল দায়েম বিশ্বাসকে বলেছেন :

শোন ও বয়াতি হবে গো কতি আজি জিজ্ঞাসি,
মাতা আমার লাগায় প্রেমরশি।
তাতে নাইকো মা দুষি
তখন কোনো প্রেমেতে মায়ের সাথে আপে খোদা উদাসী।
কোন প্রেমেতে মা বোল বলে নিরঞ্জন দিবানিশি॥
জান যদি নিরবধি বলো গো ষোলো আনা,
কোন রঙে বাবার গঠন,
আমি শুনবো তার বিনা।
কোন রঙে কারখানা গঠিল বারি রাব্বানা।
হাবিল বলে ওরে বেকুব মায়ের নিন্দা করো না।

হাবিল বিশ্বাস-এর গানের পদগুলি পাওয়া গেছে জারিগানের বয়াতি আসকার আলি, সাহেব আলি এবং তাদের দোহার শহিদুল, মিনারুল, আলহাজ আলীর কাছ থেকে। এরা সকলেই বেলতলাপাড়া নিবাসী এবং পেশায় কৃষিজীবী ও ক্ষেতমজুর। হাবিল বিশ্বাস ১৯৮৯ সালে নিজ গ্রামে দেহ ত্যাগ করেন।

মন্মথ রায়

কবিয়াল, সাধক মন্মথ রায়ের জন্ম ১৯২০ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামে। কবিয়াল ও পালাকার হিসেবে তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। তিনি দায়েম বিশ্বাস (হিতিমপাড়া) ও বেলতলাপাড়ার হাবিল বিশ্বাসের সাথে কবির লড়াই-এ অংশ

www.pathagar.com

নিয়েছেন। ১৯৫০-এর দশকে তিনি সপরিবারে নদীয়ার করিমপুরে চলে যান। স্বাধীনতার পর তিনি দেশ ও মাটির টানে আবার নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলে ভিটেমাটি ছেড়ে তিনি পুনরায় ভারতে চলে যান। তাঁর রচিত টপ্পা ও ধুয়া এখনো সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়নি।

গোলাম ঝড়ু শাহ (১৯২১-১৯৯৮)

লালন শাহের গান, বাণী, দর্শনকে সাধু-দরবেশদের আখড়া-আশ্রমে পৌঁছে দিতে যে সাধক অনন্য ভূমিকা পালন করেন তিনি গোলাম ঝড়ু শাহ। তিনি একাধারে আধ্যাত্ম সাধক, সুগায়ক, পদকর্তা ও দোতারা বাদক। ১৯২১ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলোকদিয়া গ্রামে এক হিন্দু ব্যাধ পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মহিম শাহ বাউল ছিলেন। কূল-ধর্ম ত্যাগ করে ঝড়ু শাহ বায়াত ও ভেক-খিলাফত গ্রহণ করেন ফকির জোনাব আলী শাহের নিকট। জোনাব আলী শাহের গুরু হরিয়াঘাটের খোদাবকসো সাঁইও পদকর্তা ছিলেন। আর খোদাবকসো সাঁই-এর গুরু মনিরুদ্দীন শাহ ছিলেন লালন সাঁই-এর সাক্ষাৎ শিষ্য। ঝড়ু শাহ গান শিখেছেন বাউল বেহাল শাহের নিকট। সেবাদাসী মূলাজান ফকিরানীর সাথে ফকিরি মতে বিয়ে করার পর মেহেরপুর শহর থেকে সামান্য দূরে ভৈরব তীরবর্তী যাদবপুর গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। ১৯৯৮ সালে দেহত্যাগের পর এ গ্রামেই তাকে ইসলামি শরা অনুযায়ী সমাহিত করা হয়। ঝড়ু শাহ প্রায় চার দশক ধরে নদীর তীরে বসবাস করেছেন, কিন্তু জীবনকে তিনি শাখায়িত হতে দেননি। নদীরা নদীপুত্রের জন্ম দেয়, পদ্মা গড়াই এবং গড়াই কালীগঙ্গা রূপে জন্ম নেয়। এভাবে নদীর মতো পুনর্জন্মের ফেরে তিনি নিজেকে আটকাতে চাননি। তিনি বিয়ে করলেও সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করেননি। লালন ফকিরেরও কোনো পুত্র-কন্যা ছিল না। লালনের গান ও দর্শনের একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে তিনি মনে করতেন, 'আত্মরতি খণ্ড করে' পুত্র কন্যারূপে পুনর্জন্ম হলে সাঁই নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ মেলে না। তিনি ভাল করে জানতেন 'না মরিলে মুক্তি তো নাই, জানে না সবাই।' এ তত্ত্বজ্ঞ সাধকের হাতে যাদুর কাঠি ছিল, আর সেই যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় দোতারায় উঠতো বাউল সুরের অপূর্ব মূর্ছনা। দোতারা বাজিয়ে আখড়ায় আখড়ায় গান গেয়ে বেড়ানোতেই তাঁর আনন্দ। গানে গানে তিনি গেয়েও বেড়িয়েছেন 'প্রাণের কান্না হাসি'। বাংলাদেশের বিভিন্ন আখড়া-সাধুসঙ্গে নয়, তিনি গান গেয়েছেন নদীয়া, বীরভূম, চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন আখড়া আশ্রম ও বাউল মেলায়। লালন সংগীতের তালিকাভূক্ত শিল্পী হিসেবেও তিনি গান করেছেন খুলনা বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে। তিনি গানও রচনা করেছেন। বেহাল শাহ, মকছেদ সাঁই, খোদা বক্স শাহ, মহেন্দ্র গোসাঁই, ইয়াছিন শাহ, কানাই শাহের সাথে' বিভিন্ন আসরে গান গাইতে গিয়ে এসব গান রচনা করেন। গুরুতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, আবতারবাদ, দেহতত্ত্বের উপর রচিত এসব গানে তিনি মরমি ভাবনার মর্মবাণীই তুলে ধরেছেন।

সকল মরমি সাধকের মতো ঝড়ু শাহ দেহতত্ত্ব দিয়ে জগৎ-জীবনের রহস্য বুঝবার সাধনা করেছেন। আর এভাবেই দারিদ্র্য-অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি আনন্দ ও

www.pathagar.com

অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর দেহতত্ত্ব আত্মরতি প্রসূত কিংবা আত্মসাধন সম্পৃক্ত নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত এই সাধককে সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি স্পর্শ করতে পারেনি। এজন্য বিয়ে করেছেন মুসলমান মুলাজান-এর সাথে, মেলামেশা করেছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সাথে। এই জাত বাউল সম্প্রদায় উর্ধ্ব মানুষ হিসেবে কোনো ধর্মই আনুষ্ঠানিকভাবে মানেননি। লালন সাঁইজি ছিলেন তাঁর কাছে পরমপুরুষ, 'কবি বেশে নবী'। লালন ও অন্যান্য মহৎ-এর গান ছিল তাঁর কাছে ধর্মীয় শ্লোকের মতো। ছেঁউড়িয়ায় লালনের মাজার তাঁর কাছে পবিত্র ভূমি।

ঝড়ু শাহ ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী এবং বড় মাপের সংগ্রাহক। তাঁর শিষ্য যাদবপুর গ্রামের মোহিদুল ইসলামের কাছ থেকে প্রাপ্ত গানের খাতায় দেখেছি অসংখ্য অপ্রচলিত সব গান ও পদ। গানের খাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন লালন শাহ, কুবির গোসাঁই, যাদুবিন্দু, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, দেলবার সাঁই, উজল চৌধুরীসহ অসংখ্য অখ্যাত সাধকের গান। লালন শিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের হাতের লেখা লালন গানের পাণ্ডুলিপি ঝড়ু শাহের নিকট সংরক্ষিত ছিলো। এ পাণ্ডুলিপি থেকে ২৫০ গানের মধ্যে ১১৬টি গান উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি লালনের গানের খাতাই আগলে রাখেননি, লালনের গানকে শুদ্ধ ও অবিকৃত ভাবে গাওয়ার চেষ্টা, করেছেন। লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন শাহ-উত্তর বেহাল শাহ, খোদাবকশ শাহ, অমূল্য গোসাঁইরা যেভাবে লালনের গান গেয়েছেন, তিনিও সেভাবে গেয়েছেন। লালনের গান বিকৃতভাবে গাওয়া হলে তিনি বিব্রত বোধ করতেন, কষ্ট পেতেন। ঝড়ু শাহর শিষ্যদের মধ্যে তৌহিদ সরকার (চাঁদবিল), উম্বাদ ফকির, আকলিমা সরকার, সালমা বেগম লালন সংগীতের খ্যাতনামা শিল্পী। তাঁর সর্বশেষ শিষ্য নাট্যকর্মী ও সংগঠক মোহিদুল ইসলাম বললেন, "এই মহান সাধক সারা জীবন লালনের গানের খাতা ও গানকে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁর গানের খাতাকে সংরক্ষণ করতে পারিনি। এমনকি তাঁর সমাধিটিও বাঁধিয়ে দিতে পারিনি।" ঝড়ু শাহ কোনো আখড়া বাড়ি প্রতিষ্ঠা করে যাননি। তবুও ২৭ ফাল্গুন প্রয়াণদিবসে তাঁর মাজারপ্রাঙ্গণে বসে সাধুর সাধ বাজার।

গোলাম রাব্বানী (১৯২৫-২০০৫)

মরমিসাধক, সুগায়ক, পদকর্তা গোলাম রাব্বানী নদীয়া জেলার করিমপুর থানার নাটনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জঙ্গলী মোল্লা ছিলেন জোতদার। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তার পরিবার মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার চরগোয়ালগ্রামে চলে আসেন। রাব্বানীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত হলেও তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। সাধক রাব্বানীর কন্যা বাছান ফকিরনির কাছ থেকে জানা যায়, সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি বাল্যকাল থেকে সংগীতপ্রিয় ছিলেন। বাউল-কবিগান-কীর্তনসহ নানা লোকসংগীতের আসরে যোগ দিতেন পারিবারিক বিরোধিতা সত্ত্বেও। প্রথম যৌবনে তিনি কীর্তন গাইতেন, পরে বাউলগানে ঝুঁকে পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি বাউলগুরু বেহাল শাহের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি বাউলগুরু বেহাল শাহের কাছে বাউলগানের তালিম গ্রহণের পর বিভিন্ন আখড়া-আসরে

www.pathagar.com

গান গেয়ে বেড়াতেন। গান গাওয়ার সুবাদে তাঁর সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে সাধক গায়ক কুষ্টিয়ার আবদুল করিম শাহ, আলমডাঙ্গার খোদা বকসো শাহ, গোলাম ঝড়ুশাহ, মেহেপুরের ঝাঁঝাঁর আজমত শাহের সাথে। বাউলতত্ত্ব ও দর্শনের প্রতি প্রগাঢ়ভাবে নিষ্ঠাবান এ সাধককে বৈরী প্রতিবেশের কারণে গান ছেড়ে দিতে হয়। আখড়া-আশ্রমে নেচে নেচে গান গাওয়া এই তত্ত্বজ্ঞ গায়ক গান ছাড়ার পর 'এই ভব কারাগারে' বেশিদিন থাকেন নি। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে (৮ অগ্রহায়ণ ১৪১২ বঙ্গাব্দ) নিজ গৃহে দেহত্যাগ করেন। সাধক গোলাম রাব্বানীর কন্যা বাছিয়া খাতুন এবং জামাতা রমজান আলী মাস্টার দুজনেই বাউল ফকির।

বাউল সাধক রমজান আলী জানালেন, রাব্বানী ফকির কেবল সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন শক্তিশালী পদকর্তাও। তিনি শতাধিক পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গানে গুরুতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মানবতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনপীঠ ঘোষপাড়া এবং লালন শাহের ছেঁউড়িয়ায় নিয়মিত যাতায়াত করতেন। লালন শাহ ও লালশশীর গানের প্রভাব তাঁর বিভিন্ন পদে লক্ষ করা যায়। তাঁর একটি গানে আছে :

পূর্ণ মানব আত্মা কবে পাবো।
আমার যত মনের আশা সকল আশা পূর্ণ হয়ে যাবে॥
সেই দিন আমার দাও হে এবার, যে সাধনে তোমার কারবার,
আমার বাঞ্ছা সেই সাধনে তরে যাব॥
যাহার তুমি করো সাধনা, তাতে কী আমার নাই পাওনা,
সকলের লেনাদেনা, কম বেশি আজ কেন ভাব॥
আমায় রাখলে বন্ধ করে, তোমায় যদি রাখতো ধরে,
গুরুভজন এই বাজারে কে করতো কবে,
যখন তুমি মুক্ত হলে রাব্বানী কেন বন্ধ তবে॥

গোলাম রাব্বানী ছিলেন মনে প্রাণে বিশুদ্ধ বাউল। সাধন, ভজন, মনন, অনুশীলন দিয়ে তিনি বাউল সাধনা ও গানকে একটি বিশেষ স্তরে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এই সাধকের বাণী, দর্শন, গানকে সংরক্ষণ করা যায়নি। বাউল ধর্ম ও সাধনার পরিচয় জানার জন্য গোয়ালগ্রামের এই তত্ত্বজ্ঞ মরমি পুরুষকে জানা প্রয়োজন।

মসলেম মীর (১৩২২-১৩৮২ বঙ্গাব্দ)

জারিগানের প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং পরিপূরক হিসেব ধুয়াগানের উদ্ভব। ধুয়া জারিগানকে মেহেরপুরে জনপ্রিয় করে তুলতে যিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি মসলেম মীর। তাঁর জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার আদোলবাড়ি গ্রামে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তিনি মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন বাগোয়ান গ্রামে চলে আসেন। তিনি ছিলেন একাধারে বয়াতি, পদকর্তা এবং সাধক। তিনি যেমন কারবালার বিয়োগান্তক কাহিনি অবলম্বনে জারি রচনা করেছেন, আবার মরমি ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে ভাবগান রচনা করেন। তাঁর একটি গানে আছে :

www.pathagar.com

আওলের খবর ভারি জবর বলে যায় রাজসভাতে
নূরের পর্দার মধ্যে খোদা ছিলেন ধ্যানেতে,
ভীষণ চিন্তায় যে ঘোর মায়ায়, একটি মানিক কুদরতে
এশকে জুদা আহাম্মাদা নাম দিলো সেই মানিকে,
জ্যোতির্ময় দেখে আল্লা গো তিমির হরেতে।
প্রেম ধিয়ানে সঙ্গ বিনে জ্যোতির নূরে রাখিল,
অতি গোপন সাঁই গোফুরন চেতন শক্তি দান করিল
চেতন শক্তি পেয়ে ভক্ত প্রভুর নাম শিখিল॥

ভাবগান ছাড়াও ধুয়াগানের প্রয়োজনে তিনি নানা অনুষঙ্গে গান বেঁধেছেন। মা-বাবা, স্রষ্টা-সৃষ্টিতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব নিয়েও গান রচনা করেন। মসলেম মীরের গান আজও মেহেরপুরে ধুয়া ও জারিগানের আসরে বয়াতিদের কণ্ঠে শোনা যায়। বয়াতি মোফাজ্জেল শেখ বলেন, "মসলেম মীর অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত পদই আমরা আসরে আসরে গেয়ে বেড়াই।"

মকসেদ আলী শাহ (১৩২৪-)

শতাব্দীর সমান বয়সী, অধ্যাত্ম সাধক, সুগায়ক, পদকর্তা মকসেদ আলী শাহের জন্ম মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নের সাহেবনগর গ্রামে। লালনপন্থি এই সাধক দেহতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, গুরুবাদ নিয়ে অসংখ্য গান ও পদ রচনা করেন। তিনি চলমান ঘটনা নিয়েও পদ রচনা করতে পারেন।

জ্ঞানতুল্লাহ শাহ (১৯৩১-)

আশি বছর বয়সী অধ্যাত্মসাধক, গায়ক জ্ঞানতুল্লাহ শাহর জন্ম মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর গ্রামে। পিতা ইমান শেখ সাধক না হলেও পিতামহ হিরু শেখ অধ্যাত্মসাধক ছিলেন। অভাব-অনটন, পারিবারিক অনাগ্রহের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা তাঁর হয়নি এবং গানের লাইনেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর নেই। কেবল আখড়া-আশ্রমে বেহাল শাহ, খোদা বখসো শাহ, মহেন্দ্র গোঁসাই, মাতু ফকিরদের কণ্ঠে গান শুনে তিনি গান শিখেছেন। তিনি ৪০ বছর আগে মেহেরপুরের রাজাপুর গ্রামের সাধক চেরাগ শাহের নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। জ্ঞানতুল্লাহর গুরুভক্তি প্রবল। তিনি জানালেন, "গুরু হচ্ছে 'কল্পতরু, অন্তর্যামী, ভগবান' গুরু ছাড়া মুক্তি নেই। গুরুই আমার প্রতিষ্ঠান, তিনিই আমাকে গান-বাজনা শিখিয়েছেন।" লেখাপড়া না জানা এই সাধক নিজ গুরু চেরাগ শাহ ছাড়াও বিভিন্ন সাধু গুরুদের কাছ মরমি দর্শনের সারাৎসার ও তত্ত্বকথা রপ্ত করেন। লালনের গান সম্পর্কে তিনি বলেন, "এ গান হলো আত্মার গান, ভাবুক-রসিক ছাড়া এ গানের ভেদ কেউ বুঝতে পারেনা। কেবল গানের গলা থাকলে এ গান করা যায় না এ গান গাওয়ার জন্য সাধু-গুরুর কাছে মুরিদ হওয়া লাগে।" জ্ঞানতুল্লাহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাধুসঙ্গে গান করে বেড়ান। সাধুসঙ্গ হলেই তিনি ছুটে যান। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই বাউল একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে গান করেন। লালন, পাঞ্জু, দুদ্দুসহ

www.pathagar.com

অসংখ্য মহৎ-এর গান তাঁর মুখস্থ। তিনি আদি বাউল সুরে গান গাইতে পারেন। তাঁকে অনুরোধ জানানো হলে সাহারবাটির আজাদ শাহের একটি গান শোনালেন :

আমি করজোড়ে বিনয় করে ডাকি মুরশিদ তোমারে,
আমি কাঙাল, তুমি দয়াল, দয়া করো আমারে॥
আমি অধম অপরাধী, ডাকি তোমার নিরবধি,
তুমি দয়া না করো যদি কেহ নাই এ সংসারে॥
তুমি যদি হও গো নিদয়, তবে আমি যাবো কোথায়
তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, তাই তো ডাকি তোমারে॥
তোমার নাম দয়াময়, তোমার দয়া সবাই পায়,
অধম আজাদ আছে আরজানের আশায়,
ফেলো না আমায় দূরে॥

জ্ঞানতুল্লাহর অতি কষ্টে দিন কাটে। বয়স বেড়ে যাওয়ায় বেশি দূর হেঁটে যেতে পারেন না, হাতের আঙ্গুলগুলো এক রকম অবশ হয়ে যাওয়ায় একতারা কিংবা প্রেমজুড়িও বাজাতে পারেন না। তবুও তিনি গুরুপদে নিষ্ঠা রেখে অমৃত ও অমরত্বের পথে চলতে চান, যে পথে চলেছেন মহৎ-মহাজনেরা।

বিমল চন্দ্র বিশ্বাস (১৯৩৫-২০১১)

যাত্রা ও কীর্তনগানের মৃদঙ্গ শিল্পী, ঢোল করতাল বাদক বিমল চন্দ্র বিশ্বাসের জন্ম গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে। তাঁর পিতা ননী গোপাল বিশ্বাস ছিলেন নিষ্ঠবান বৈষ্ণব। পিতার অনুপ্রেরণায় বিমল শৈশবে কীর্তন দলে যোগ দেন এবং নিত্যানন্দপুরের যোয়েল মল্লিকের কাছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানোর তালিম গ্রহণ করেন। এই নিপুণ যন্ত্রশিল্পী বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোরসহ পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর, চাপড়া, তেহট্টের বিভিন্ন আসরে খোল করতাল, ঢোলক বাজিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন।

মসলেম মিয়া (১৯৪৪-২০০৭)

জারিগান ও ধুয়াগানের পদকর্তা, পালাকার ও কবিয়াল মসলেম মিয়ার জন্ম মেহেরপুরের সদর উপজেলার খোকসা গ্রামে। তাঁর পিতা জানকী শেখ সুগায়ক ছিলেন। মসলেম মিয়ার একটি ধুয়াগান তাঁর শিষ্য গুলজার শেখের কাছ থেকে সংগ্রহ করে উদ্ধৃত হলো :

ভদ্দর লোকের লব ফ্যাশেন দেখে চাষির মেয়ে কয়,
স্বামী গো বলবো কী তোমায়।
আমার হাত-পা পচে গন্ধ হইল ভাদ্দুরে কাদায়, ও হায় হায়।
যত সব বাবুর মেয়ে রাস্তা দিয়ে বৈকালে হাওয়া লাগায়,
দিদিমনি আলতা পায়ে দিয়ে, দেখিতে আচ্ছা বেশ মানায়।
ভদ্দর লোকের মেয়েগুলা বাড়ির বাহির হয়, তাদেরকে নাহি যায়।
আবার সায়া ব্লাউজ ত্যাজ্য করে স্যুট-প্যান্ট লাগায়।

www.pathagar.com

গরীব উল্লাহ শাহ

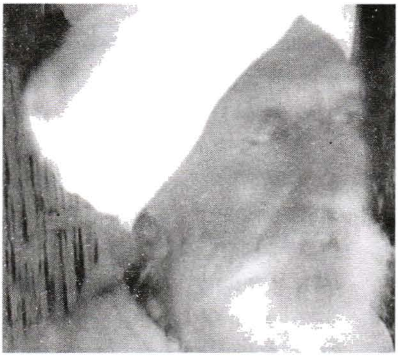

ফকির দবির উদ্দিন শাহ

জ্ঞানতুল্লাহ শাহ

গোলাম ঝড়ু শাহ

দায়েম বিশ্বাস

মাতু ফকির

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. রফিকুর রশীদ, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : মেহেরপুর জেলা', ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৫
২. কুমুদনাথ মল্লিক, 'নদীয়া কাহিনি', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১১ আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ২৭৫
৩. Bangladesh District Gazettiers, Kushtia, edited Ashraf Siddique, Dhaka 1976
৪. সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, 'মেহেরপুরের ইতিহাস,' মেহেরপুর ১৯৯৩, পৃ. ৩১
৫. ড. ইসরাইল খান : 'আহমদ শরিফের দৃষ্টিতে বাঙালির চরিত্র,' ইসরাইল খান সম্পাদিত আচার্য আহমদ শরীফ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১৩৩
৬. সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৭. ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি' । তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ২৯
৮. কুমুদনাথ মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮
৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, সহজিয়া কড়চা, ২ আগস্ট ২০১১, প্রথম আলো, পৃ. ১২
১০. রফিকুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭
১১. সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পৃ. ২৭
১২. কুমুদনাথ মল্লিক : 'নদীয়া কাহিনি', মোহিত রায় সম্পাদিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৬, কলকাতা, পৃ. ২৭৬-২৭৭
১৩. রফিকুর রশীদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
১৪. আহমদ শরীফ, 'বাংলা বাঙালী বাঙালীত্ব', কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ১৩১৪
১৫. অক্ষয় কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', প্রথম খণ্ড, ১৮৭০
১৬. তোজাম্মেল আযম, 'মেহেরপুর জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য', ২০০৯, ঢাকা, পৃ. ২১২-২১৩
১৭. দীনেন্দ্র কুমার রায়, 'সেকালের স্মৃতি' রচনাসমগ্র কলকাতা জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ৩১৪
১৮. সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, 'মেহেরপুরের লোকসাহিত্য', মেহেরপুর, ১৪ এপ্রিল ১৯৯৯, পৃ. ১৩
১৯. আবুল আহসান চৌধুরী, 'ফকির মহিন শাহ : তার পদাবলি,' লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ১০১
২০. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, 'মনসুর উদ্দীন স্মারক গ্রন্থ', ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৯
২১. আজাদুর রহমান, 'লালন মত লালন পথ', ঢাকা, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০, পৃ. ১৪২
২২. ওয়াকিল আহমদ, 'লালন শাহের কবি মানস ও কাব্য মূল্যায়ন', সওগাত, পৌষ ১৩৮০

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য ফোকলোরের একটি শাখা বিশেষ। তবে এর সৃষ্টির পেছনে রয়েছে সংহত সমাজের সামগ্রিক জীবনবোধ। কেননা, সামাজিক অবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে লোকসাহিত্যের প্রাণশক্তি। লোকসাহিত্য বিশারদ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে মূল্যায়ন রয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "লোকসাহিত্য আমরা যে রূপে লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহা সমষ্টির সৃষ্টি, ব্যষ্টির নহে।"

আধুনিক ফোকলোর চর্চা শুরু হবার পর থেকে বলা যায়, ফোকলোরের সব শাখার সৃষ্টিকেই লোকসাহিত্য বলা যাবে না। লোকগল্প, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, লোককবিতা, পুথিসাহিত্য প্রভৃতি লোকসাহিত্য পর্যায়ভুক্ত।

ক. লোকগল্প/কিস্‌সা/কাহিনি

লোকসমাজে সহজ অভিজ্ঞতা আর সরল অনুভূতি নিয়ে এমন কিছু কাহিনি সৃষ্টি হয়, যা লোকপরম্পরায় কোনো প্রাসঙ্গিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুখে মুখে আঞ্চলিক ভাষায় বর্ণিত হয়, তাকে লোকগল্প বা কিস্‌সা বলা যায়। লোকগল্পগুলোতে থাকে রসবোধ, থাকে নির্মল হাসির খোরাক ও কৌতুক। তাছাড়া গল্পের কথক যিনি তার থাকে বলার নিজস্ব ভঙ্গি, কৌশল ও নিজস্ব ভাষা।

লোকগল্প-১

বিলপাড়ার হানুফার মা একদিন মণ্ডলপাড়ায় বেড়াতি আয়িচে। লুকমান মণ্ডলের বাড়ির উঠুনে (উঠানে) পা দিয়ি সে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর গলা ছাইড়ি ডাইকি ওঠে—ও কুদুবু, তুমি কনে গেইলি?

কদুবুর আসল নাম হচ্ছে কদবানু। গিরামের সবাই বোলে কদু। তো সেই কদুবু হাইসেল (হেঁসেল) থিকি জবাব দেয়,

কিডা গো! আগিয়ি আইসি হাইসেলের রোয়াকের কাছে দাঁড়ায়। কদুবু ডাইলে তেলফোঁড়ন দিয়ি হানুফার মাক (মাকে) দেইখি বোলে,

আরে আমার কপাল! তুমি কোমনে গিয়েলি হা বুইন?

এই তো তুমাগের পাড়ায় আয়িলাম। তাইতি তুমাক দেখতি আলাম। ভালুই কইরুছু। কদবানু কাঠের পিঁড়ি নিয়ি খুঁটিতি হ্যালান দিয়ি বসে। তারপর শুরু করে, তুমার ছেইলিপিলি কনে বুইন? বাড়ি যে ফাঁকা ফাঁকা নাগচে!

আমার আবার ছেইলিপিলি কুতায়! এট্টা (একটা) গিয়িচ গরু চরাতি, এট্টা গিয়িচ ছাগল রাখতি, দুইটি গিয়িচ ভূঁইতি শাগ্ তুলতি, দুইটুক্ পাঠিয়িচি মাঠে—বাপের হাতে হিল্লায় লাগবেনে; ছোটো দুইটু দিনরাত মারামারি করে—উগের পাঠিয়িছি ইশ্‌কুলি।

শুনতি শুনতি হানুফার মা ফ্যাঁচ কইরি হাইসি (হেসে) ফ্যালে। হাসতি হাসতিই বোলে, কডা হইলু তা হলি?

আমার কডা হইলু, সেইডির পানেই নজর গ্যালো তুমার!

হাসি থামিয়ি হানুফার মা বোলে,

না না, তুমার আর ছেলিপিলি কনে!

কদবানু ইবার গলায় জোর দিয়ি বোলে,

হ্যাঁ বুইন। ছেইলি দ্যাখ্পা তো দ্যাখো গা আমার সতীনির ছেইলি। হোঁকতা (হোঁতকা) এক ছেইলি। আমার আবার ছেইলিপিলি কুতায়, এ্যাঁ![১]

লোকগল্প-২

এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে একদিন ডেইকি (ডেকে) বুইল্চি তুমার সঙ্গে আমার খুব জরুলি কতা আছে। শোনো দিনি!

বোলো শুনচি। কীতির কতা?

খুবই জরুলি কতা। এ্যাকটা বিয়ির ব্যাপার।

বন্ধু তো খুবই খুশি। আনন্দে ডগোমগো হয়ি বোলে,

বিয়ির ব্যাপার! আচ্ছা, জিয়াফত দিবা তো আগে!

প্রথম বন্ধু বিরক্ত হয়ি বোলে,

জিয়াফত তো দেবুই। তার আগে এ্যাকটা খবর দ্যাও দিনি ভাই!

কী খবর?

তুমার বাড়ির কানটায় (কাছে) অমুক মাস্টারের বাড়ি না?

বন্ধু খুব আগ্রহের সাথে বোলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, মাস্টারের নাড়ি-নক্ষত্র আমি সব চিনি, সব জানি।

ওই মাস্টারের ছোট মেয়িডাকে চেনো?

চিনি মানে? খুব ভালো চিনি। সেই ছোটবেলা থেইকি দেখছি।

প্রথম বন্ধু কানের কাছে মুখ লাগিয়ি জানায়,

ওই মেয়ির সঙ্গে আমার শালার বিয়ি।

তাই নাকি?

তেবে আর বুলচি কী! আপন শালা বুইলি কথা। মেয়িডা কেমুন হবে বোলো দিনি।

বন্ধুর মুখে কতা নেই। চুপচাপ। কী য্যানে ভাবচি। প্রথম বন্ধু শুধায়, কী হইলু! মেয়িডা ক্যামুন বোলো। ভালো?

হ্যাঁ, মেয়ি তো রোজই দেখছি ভাই! কিন্তু তুমার শালার বিয়ি বুইলি কতা!

হ্যাঁ, বিয়ি বুলিই তো শুধাইছি। মেয়ি ভালো না?

কী মুশকিল! হুট কইরি বুলা যায়?

তুমার এতো দ্যাখ্যা, তাও বুলা যাবে না?

হাজার দ্যাখা হোক। তবু আর একবার না দেখলি বিয়ির ব্যাপারে কিছু বুলা ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

খ. কিংবদন্তি

Legend বা কিংবদন্তি সাধারণত জাতির কোনো বীর বা সাধক চরিত্রকে অবলম্বন করে রচিত হয়। ইতিহাস এবং কল্পনা উভয়ের মিশ্র উপাদানে রচিত কিংবদন্তিকে বিশ্লেষণ করলে লোকসমাজের মানসিক প্রবণতা লক্ষ করা যাবে। অতীত সমাজজীবনের অন্তর্ভুক্ত কোনো বীর বা সাধকের চরিত্র অবলম্বন করে মুখে মুখে ইহা রচিত হয়, মুখে মুখেই কীর্তিত হয়।

বাস্তবের সঙ্গে জনশ্রুতি মিলিয়ে যে স্মৃতি-কাহিনি তৈরি হয় তাই কিংবদন্তি। যুগ-যুগান্তর, কাল-কালান্তর ধরে লোকমানস একে গল্প হিসেবে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে।

গ্রামের নাম বানিয়াপুকুর

মেহেরপুর জেলাশহর থেকে ২০ কিলোমিটার পূর্বে গাংনী উপজেলার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু এক গ্রাম। প্রায় তিন হাজার লোকের বাস। এ গ্রামের মাটি অত্যন্ত উর্বরা। ধান-পাটসহ সকল ফসলই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এ অঞ্চলের মাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর পানি ধারণ ক্ষমতা খুব বেশি। ফলে সারা গ্রামে যতগুলি ছোট-খাটো ডোবা-গর্ত-পুকুর আছে, সারা বছরই সেখানে পানি থাকে। ফলে গ্রামবাসীর পক্ষে মাছ চাষ করা সহজ হয়েছে। 'মাছে-ভাতে বাঙালি'-প্রবাদটি এ গ্রামের মানুষের জন্যে খুবই প্রযোজ্য। এ গ্রামে পুকুরের সংখ্যা অধিক বলেই যে গ্রামের নাম বানিয়াপুকুর হয়েছে, এমন নয়।

তাহলে কেমন করে হয়েছে এ গ্রামের নামকরণ? এই প্রশ্ন নিয়ে একদিন গিয়ে হাজির হই বানিয়াপুকুর গ্রামে। কথা হয় নানা বয়স এবং শ্রেণি, পেশার মানুষের সঙ্গে। অনেকেই গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন এবং বৃহৎ পুকুরটির প্রতি ইঙ্গিত করেন। তাদের ধারণা, এই পুকুরটিকে ঘিরেই গ্রামের নাম হয়েছে বানিয়াপুকুর। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল, পুকুরটি যথার্থই অনেক বড়। গ্রামবাসীর দাবি বাইশ একর জমি আছে এই পুকুরে। ব্যাপক মাছের চাষ হয়। সারা বছর পানি থাকে। প্রশ্ন জাগে-এই পুকুরের সাথে 'বানিয়া' যুক্ত হলো কীভাবে? জানতে চাই এ গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান অধ্যাপক আব্দুর রশীদের কাছে। স্থানীয় এক কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। তিনি নিজে বিশেষ কিছু না বলে গ্রামের প্রবীণতম মানুষ ছায়েন উদ্দীন মণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শতবর্ষী এই বৃদ্ধ গ্রামের কৃষক গৃহস্থ। স্মৃতিধর মানুষ। বানিয়াপুকুরের নাম নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই শুনে তিনি ফোকলা দাঁতে একটুখানি হাসেন। তারপর এই বৃদ্ধও ওই পুকুরের কথাই উল্লেখ করেন। তবে তিনি ওই পুকুরকে ঘিরে প্রচলিত এক কাহিনি শোনান। পুকুরের সঙ্গে 'বানিয়া' যুক্ত হবার রহস্য অনেকটাই উন্মোচিত হয়ে পড়ে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষটি আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন,

চাঁদ সদাগরের নাম শুইনিছ তো তুমরা?

www.pathagar.com

মনসা-মঙ্গলের কল্যাণে চাঁদ সওদাগরের নাম শুনেছি অনেক আগেই। আরো আগে, শৈশবে গ্রাম্য 'ঝাঁপান' গানেও এ নাম শুনেছি, বেহুলা-লখিন্দরের গল্প শুনেছি। এতদিন পর বানিয়াপুকুরের ছায়েন উদ্দীন মণ্ডল কি নতুন কিছু শোনাতে চান? আমরা কান খাড়া করি। বৃদ্ধ বলেন,

সেই চাঁদ বাইনি-ইতো এই পুকুর কাইটোলো।

চাঁদ বাইনি? শব্দ যুগল কানে এসে লাগে। এ অঞ্চলের মানুষ 'বানিয়া' না বলে সাধারণত উচ্চারণ করে 'বাইনি'। আবার একটু লেখাপড়া জানা মানুষেরা উচ্চারণ করে 'বেনে'। তারা গ্রামের নামও বলে বেনেপুকুর। চাঁদ সওদাগর এখানে হয়েছে চাঁদ বেনে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সওদাগর পুকুর কাটানোর জন্যে এখানে এলেন কী করে? কোন পথে? এ প্রশ্নে ছায়েন উদ্দীন মণ্ডল কিন্তু নির্বিকার। তিনি হাড্ডিসার ডানহাতটা উঁচু করে পশ্চিমে হাত ঘুরিয়ে বলেন,

ওই যি মরা খাল, স্যাখুন ছিল বিরাট নদী। শাওন-ভাদর মাসে সে নদীর বুক ফুইলি উঠতু। ঢেউয়ের ওপর ঢেউ। কত রকম নৌকু-বজরা এই নদীতি ভাইসি যাইতু, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে! বাপরে বাপ! কত বাহারি নৌকু!

ছায়েন উদ্দীন মণ্ডলের বর্ণনা শুনে মনে হয় যেন তিনি নদীবক্ষে ভাসমান নানান রকম নৌকা কিংবা বজরার সারি এখনো দিব্যি দেখতে পাচ্ছেন। যেন চাঁদ সওদাগর তার বিশাল বাণিজ্য বহর নিয়ে এই নদীপথে এগিয়ে চলেছেন, মাঝিমাল্লা লোকলস্কর তো আছেই, পৃথক বজরায় এবার স্ত্রী-কন্যাও আছে; এ সবই তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তাই তাঁর বিবরণ হয়ে ওঠে অত্যন্ত আন্তরিক এবং জীবনঘনিষ্ঠ। শতাব্দীর সাক্ষী ছায়েন উদ্দীন মণ্ডলের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে বানিয়াপুকুরকে ঘিরে অসাধারণ এক কিংবদন্তি। তাঁর বর্ণনার বিশ্বস্ততার কারণে প্রশ্নই জাগে না-এ অঞ্চলের এই নদীপথে আদৌ চাঁদ সওদাগরের বজরা আসতে পারে কিনা! কিংবা চাঁদ সওদাগরের আদৌ কোনো কন্যাসন্তান ছিল কিনা! অথচ ছায়েন উদ্দীন বর্ণিত কিংবদন্তির কেন্দ্রে কল্পিত সেই সওদাগর কন্যার অবস্থান। তারই অবুঝ আবদার রক্ষা করতে গিয়ে বানিয়াপুকুরের এই বৃহৎ পুকুরের সৃষ্টি। প্রচলিত সেই কিংবদন্তিটি এই রকম :

এই বানিয়াপুকুর গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট এক নদীর নাম ছেউটি। এখন আর সে নদীর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এখন শুধু এক ফালি মরা খাল। দুপাশে সবুজ মাঠ। আকারে বা আয়তনে ছোট হলেও একদা এই ছেউটি ছিল চঞ্চলা নদী। দুকূল ভাসানো তার স্রোত ছিল। স্রোতে ভেসে ভেসে সেই নদীতে চলাচল করত নানা রঙের পাল তোলা নৌকা। ভারতের জলঙ্গী নদী থেকে বেরিয়ে এসে মাথাভাঙ্গা নামের যে শাখানদী সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে, আমাদের এই ছেউটি হচ্ছে তারই নিকটাত্মীয়। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় এসে চপল পায়ে মাঠপ্রান্তর পেরিয়ে সে চলে গেছে চুয়াডাঙ্গা জেলার সীমানায়।

অনেক অনেক দিন আগে একবার চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্যবহর আসে ছেউটি নদীতে বজরা ভাসিয়ে। বাণিজ্যবহর মানে ব্যবসার মালপত্র বা সওদা বোঝাই পাঁচ-সাতখানা নৌকা, আর তারই সঙ্গে সওদাগরের বসবাসের জন্য বাহারি নকশাতোলা

www.pathagar.com

বজরাও থাকে। বিরাট এই বাণিজ্যবহর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নদীবক্ষে ভেসে যেতে যেতে নদীতীরের গঞ্জে বা হাটবাজারে থেমে তার সওদা কেনাবেচা করে। সেবার সওদাগরের বজরায় স্বয়ং চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং অতি আদরের কন্যাও। সেই কন্যার অবুঝ আবদার রক্ষার জন্যেই স্ত্রী-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিয়েছেন চাঁদ সওদাগর। কন্যা ভারি খেয়ালি। খেয়ালের বশে হঠাৎ সে দাবি জানায়—নতুন পুকুরের পানিতে ডুব দিয়ে স্নান করবে। কাজেই বজরা থামাও।

খেয়ালি কন্যার এক কথায় বাণিজ্যবহর থেমে গেল। ছেউটি নদীর এমন এক জায়গায় বজরা থামল যে সেখানে দুপাশের নদীতীরে কোনো জনবসতি নেই। বহুদূরে আছে দুএকটি ফাঁকা গ্রাম। এই বিরান প্রান্তরে নতুন পুকুর কোথায়? সওদাগর কন্যা জানিয়ে দিল—পুকুর কাটাও তাহলে! সময় দিলাম এক দিন আর এক রাত। রাত পোহালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুকুরে নেমে ডুব দেব।

শতবর্ষী ছায়েন উদ্দীন মণ্ডল চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে বলে, "চাঁদ বাইনির তো মাথায় হাত! রাতারাতি পুকুর কাট্‌পে ক্যামুন কইরি! মানুষ নি জন নি, এ কি মুখির কতা?" এরপর একটুখানি দম নিয়ে বৃদ্ধ ছায়েন উদ্দীন যে বিবরণ দেন তা সত্যিই চমকপ্রদ। মেয়ের আবদার পূরণের জন্যে চাঁদ সওদাগর গ্রামে গ্রামে লোকলস্কর পাঠিয়ে ঘোষণা করে দেন পুকুর কাটার কথা। সময় মাত্র এক দিন এক রাত। যতো বেশি মানুষ একসঙ্গে কাজ করবে ততোই ভালো। পারিশ্রমিকের সঙ্গে বখশিসও দেওয়া হবে। ঘোষণা শুনে আশেপাশের দশ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ এসে লেগে যায় পুকুর কাটতে। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০ একর জমিতে পুকুর কাটা হলে ভোরবেলা সেই পুকুরের নতুন পানিতে স্নান করে সওদাগর কন্যা।

সেই কবেকার কথা। চাঁদ বেনের অবুঝ কন্যার স্নানের জন্যে খনন করা সেই পুকুরই বেনেপুকুর বা বানিয়াপুকুর। এই এলাকা নিচু প্রকৃতির হবার কারণে মানুষের বাস ছিল না। বিরাট এই পুকুরের উচুঁ পাড়ে কিছু কিছু মানুষ এসে বাস করতে শুরু করে। এই বানিয়াপুকুরকে ঘিরেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মাটি সংলগ্ন মানুষের জনপদ। বর্তমানে প্রায় আড়াই তিন হাজার মানুষের বাস। কৃষিতে আধুনিকতা এসেছে। বিদ্যুৎ পৌছেছে। গ্রামে স্কুল হয়েছে। অনেকে উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু বানিয়াপুকুর নামকরণ প্রসঙ্গে ছায়েন উদ্দীন মণ্ডল বর্ণিত কিংবদন্তিটি প্রায় সবাই বিশ্বাস করেন।

বাগোয়ানের কিংবদন্তি

মেহেরপুর জেলাশহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে শান্ত এবং সমৃদ্ধ এক গ্রাম বাগোয়ান। শুধু গ্রাম নয়, বর্তমানে বাগোয়ান একটি বর্ধিষ্ণু ইউনিয়নের নাম। জনশ্রুতি আছে নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে এই বাগোয়ান পরগনার মর্যাদাও লাভ করে। কেমন করে এটা সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে এতদঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিরা অসাধারণ এক কিংবদন্তির গল্প শোনান। এ গল্পের সমর্থনে তথ্য পাওয়া যায় বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯১ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার অব কুষ্টিয়া' নামক গ্রন্থে।

www.pathagar.com

দুটি সূত্র থেকেই জানা যায়, ১৭৫৬ সালের গোড়ার দিকে নবাব আলীবর্দী খান লোকলস্কর নিয়ে শিকারের উদ্দেশে নদীপথে রওনা হন। নবাবের বজরা গঙ্গা-ভাগীরথী হয়ে ভৈরব নদীতে ভাসতে ভাসতে এই বাগোয়ানে এসে পৌঁছুলে প্রবল এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। সাংঘাতিক ঘূর্ণিঝড় আর টর্নেডো। বজরা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যায়। লোকলস্কর হারিয়ে যায়। বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত নবাব শেষে আশ্রয় গ্রহণ করেন স্থানীয় এক বিধবা গোয়ালিনীর গৃহে। রাজু গোঁসাই নামে এক ছেলে ছাড়া গোয়ালিনীর সংসারে আর কেউ নেই। আর আছে তার একপাল গরু। গোয়ালিনীর সেবাযত্নে নবাব সুস্থ হয়ে উঠলে গোয়ালিনীকে পুরস্কৃত করতে চান, তার কাছে জানতে চান—কী চাও তুমি?

গোয়ালিনী তার গরুর পালের জন্যে গোচারণভূমির দাবি জানায় নবাবের কাছে। নবাব এক বাক্যে মেনে নেন সামান্য দাবি। শুধু গোচারণভূমি নয়, তিনি দিতে চান আরো বেশি কিছু। বিধবা গোয়ালিনীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তার এক মাত্র পুত্র রাজু গোঁসাইকে সমগ্র বাগোয়ান পরগনার শাসনভার তুলে দেন। রাজু গোঁসাই করবে রাজ্যশাসন? না, এ নাম দিয়ে চলবে না। নবাব তাকে নতুন নামে নতুন উপাধিতে ভূষিত করেন—রাজা গোয়ালা চৌধুরী।

কথিত আছে রাজা গোয়ালা চৌধুরী শুরু থেকেই রাজ্যের উন্নতি ও শান্তি সমৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেন। প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। গুরুত্ব দেন সড়কপথের উন্নয়নের দিকে। নদীপথে বর্গী দস্যুরা এসে হানা দেয়, জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলে তাদের বর্বরোচিত হামলা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে জলপথের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে রাস্তাঘাটের উন্নয়নে মনোযোগ দেন নতুন রাজা। এমন কি তাঁর রাজ্যের রাজধানীও বাগোয়ান থেকে সরিয়ে আনেন মেহেরপুরে। রাজপরিবারের বসবাসের জন্যে মেহেরপুর শহরের ঠিক মাঝখানে নির্মাণ করেন ভূতলকক্ষ বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ। বস্তুতপক্ষে রাজা গোয়ালা চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেহেরপুর আড়াইশ বছর আগেই এক সমৃদ্ধশালী শহরে পরিণত হয়।

ওদিকে বাগোয়ানেও লাগে উন্নয়নের ছোঁয়া। গ্রামের মধ্যে সেকালের সেই ইট বিছানো রাস্তার ধ্বংসাবশেষ এখনো পথচারীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই বাগোয়ান গ্রামেই আছে জাগ্রত পির শেখ ফরিদের মাজার। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ইসলাম প্রচারক খান জাহান আলী সংগীসাথীসহ বিশাল বহর নিয়ে খুলনা-বাগেরহাট যাবার পথে ভৈরবপারের গ্রাম চারুলিয়া-বাগোয়ানে যাত্রাবিরতি দিয়ে বিশ্রাম নেন। তাঁর সহযাত্রী এবং শিষ্য চারজন আউলিয়া এতদঞ্চলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে থেকে যান। মূলত সেই চার আউলিয়ার কারণেই গ্রামের নাম হয়েছে চারুলিয়া। সেই চার আউলিয়ার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শেখ ফরিদ। বাগোয়ানে তাঁর মাজারকে ঘিরে এখনও নানান লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। এ মাজারকে স্থানীয়ভাবে দরগা বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের মন-বাসনা পূরণের এবং রোগমুক্তির আশায় এখনো অনেক ভক্ত এবং সাধারণ মানুষ এই দরগায় নানান কিছু মানত করে। তারা বিশ্বাস করে, বাগোয়ানের ৭৫ বছর বয়স্ক মোহাম্মদ শেখ জোর দাবিই করেন—"শেখ ফরিদ হইলু জাগ্রত পির। কব্বরে বইসি সব দেখতে পায়, জানতি পারে।"

www.pathagar.com

গড়ের পুকুরের কিংবদন্তি

মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে, পৌরভবনের পিছনে দিঘির মতো বিশাল এক পুকুর আছে। লোকে বলে গড়ের পুকুর। শানবাঁধানো ঘাট আছে। পুকুরের টলটলে পানিতে পৌরবাসী স্নান করে, পুকুরপাড়ের শানবাঁধানো বেঞ্চে বসে বিকেল কাটায়, গরমের সময় অনেক রাত অবধি গল্পগুজবও চলে। মোট কথা গড়ের পুকুর হয়ে উঠেছে পৌরবাসীর জন্যে স্বস্তির ঠিকানা। দীর্ঘ এবং গভীর এই পুকুর 'গড়ের পুকুর' হলো কীভাবে, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা যায় এক চমৎকার কিংবদন্তির কথা।

একদা ভৈরবে বজরা ভাসিয়ে নবাব আলীবর্দী খান এতদঞ্চলে এসে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েন। সংগীসাথী লোকলস্কর হারিয়ে আশ্রয় নেন বাগোয়ানের এক বিধবা গোয়ালিনীর কুটিরে। তার সেবাযত্নে খুশি হয়ে নবাব বিধবার পুত্রকে বাগোয়ান পরগনার রাজা ঘোষণা করে গোয়ালা চৌধুরী নাম দেন। রাজা গোয়ালা চৌধুরী রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ঘটান, রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তর করেন মেহেরপুরে। নির্মাণ করেন ভূতলকক্ষ বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদও। নিরাপত্তার স্বার্থে সেই রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে প্রশস্ত পরিখা বা গড় তৈরি করানো হয়। জনশ্রুতি আছে বর্গীদস্যু রঘুজি ভোঁসালার আক্রমণে সেই ভূতলকক্ষেই রাজার মৃত্যু ঘটে। তারপর দীর্ঘকাল শূন্য পড়ে থাকে বিশাল রাজপ্রাসাদ। অরক্ষিত সেই রাজপ্রাসাদও এক সময় ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। স্থানীয় জনসাধারণ দিনে দিনে ভগ্নস্তূপের ইটপাটকেল খসিয়ে নিয়ে যায়। অনেকের মধ্যে কৌতূহল জাগে ভূতলকক্ষ নিয়ে, কী আছে সেখানে? অতি উৎসাহী মানুষেরা ভূতলকক্ষও খোঁড়াখুঁড়ি করে। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় বিশাল গর্ত। সেই গর্ত থেকেই বর্তমানের গড়ের পুকুরের সৃষ্টি।

সিঁদুরকৌটার কিংবদন্তি

জেলাশহর মেহেরপুর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পূর্বে গাংনী উপজেলার নিভৃত একটি গ্রাম সিঁদুরকৌটা। প্রায় তিন হাজার লোকের বাস। একদা হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ধীরে ধীরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 'সিঁদুরকৌটা' গ্রামের নামকরণ নিয়ে গ্রামবাসীর বিশেষ কৌতূহল নেই। গ্রামের নজরুল মাস্টার মনে করেন—"ও সব হচ্ছে হিন্দু আমলের ব্যাপার, আমরা কী জানি!' সত্তরোর্ধ বয়সের বৃদ্ধ নিয়ামতুল্লাহ্‌র কাছে জানা যায় এক কিংবদন্তি। জমিদারকন্যা পালকি চড়ে এ গ্রামের পথেই আসছিল বাপের বাড়ি। পথিমধ্যে ইংরেজ কুঠিয়ালদের লাঠিয়াল-বরকন্দাজেরা হামলা চালায়। জমিদারের লাঠিয়ালেরা সাধ্যমতো প্রতিহত করে। তাদের সঙ্গে সাহসী গ্রামবাসী যুক্ত হলে জমিদারকন্যার সিঁথির সিঁদুর রক্ষা করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে আনা সিঁদুরের কৌটা রক্ষা করা যায়নি, অসাবধানে গড়িয়ে পড়ে পথের ধুলোয়। "সেই থিকি এ গাঁয়ের নাম হয়িচে সিন্দুরকোটু", নিয়ামতুল্লাহ্‌ বলেন।

ধলার বিলের কিংবদন্তি

মেহেরপুর থেকে ২০/২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ধলার বিল। এখন বিল শুকিয়ে মাঠ হয়েছে। লোকে বলে ধলার মাঠ। প্রকৃতপক্ষে ধলার বিলই ছিল মেহেরপুর জেলার

www.pathagar.com

সবচেয়ে বড় বিল। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২৫/৩০ কিমি.। বর্ষাকালে এই বিশাল বিল পানিতে সয়লাব হয়ে থাকত। যতদূর চোখ যায় সাদা ধবধবে বা ধলা। সেই জন্যেই ধলা বিল। বিলের বিভিন্ন প্রান্তে বহু দূরে দূরে লোকালয় গড়ে ওঠে—নওপাড়া, মাইলমারী, করমদি, তেঁতুলবাড়ি, পলাশিপাড়া, ভোমরদহ, রংমহল, খাসমহল, পশ্চিমে ভারতীয় ভূখণ্ড। এই ধলাবিলের কারণে অধিকাংশ সময় এই জনপদগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। ভরা বর্ষায় ধলাবিলের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাবার আশায় এ অঞ্চলের মানুষেরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করত জোড়া জোড়া দেবদেবীকে। তাদের নাম অনুসারেই বর্তমান ধলা পরিচিত হয়েছে তিন ভাগে-১. লক্ষী-নারায়ণপুর ধলা ২. রাম-কৃষ্ণপুর ধলা ৩. রাধা-গোবিন্দপুর ধলা। একদা এ তল্লাটের অধিবাসীরা প্রবলভাবেই বিশ্বাস করত-এই সব দেব-দেবতাই সব রকম বিপদ-আপদ থেকে তাদের রক্ষা করেন।

গ. কবিগান

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (১৭৬০-১৮৩০) কবিগান ও পালাগানকে 'দ্বিতীয় অন্ধকারের পদাবলি' বলা হয়। এই যুগে বাঙালি আনন্দরসে অবগাহন করতে গিয়ে খিস্তি-খেউড়, শ্লীল-অশ্লীল ভাবরস পরিবেশনের জন্য যে শিল্পধারা সৃষ্টি করে তা কবিগান। এ গানের স্রষ্টারা অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কবিয়াল। যে সকল কবিয়াল বাংলা সংস্কৃতির এই লোকধারাকে বলবান ও সমৃদ্ধ করতে কুশলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, কেষ্টমুচি, হরু ঠাকুর, নৃসিংহ অন্যতম। অষ্টাদশ শতকের এসব কবিয়ালরা বিভিন্ন আসরে গান গেয়ে সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকে মেহেরপুরে কোনো কবিয়াল ছিল কী না তা জানা যায় না। তবে পরবর্তী উনিশ শতকে এ অঞ্চলে অসংখ্য কবিয়াল ও পালাকরের আবির্ভাব হয় যারা আসর মাতানো গায়েন ছিলেন। মেহেরপুরের কবিগানের ধারাকে সমৃদ্ধ করতে যে সকল কবিয়াল অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে রামেশ্বর দাস (১২০৫-১৩০০ বঙ্গাব্দ), আকালী বিশ্বাস (১২৯০-১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), গোফুর মুন্সি (১৮৮১-১৯৪০), ওলিদাদ মুন্সি (১৯০৪-১৯৮৬), পণ্ডিত ইছারুদ্দিন বিশ্বাস, দায়েম বিশ্বাস (১৩০৪-১৩৯৪), হাবিল বিশ্বাস, রমজান আলী, কমরুদ্দীন অন্যতম। এদের মধ্যে অন্যতম খ্যাতিমান ছিলেন আকালী বিশ্বাস, হাবিল বিশ্বাস, দায়েম বিশ্বাস। এদের গান আজও মেহেরপুরের গ্রামে-গঞ্জে মুখে মুখে ফেরে। ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে মেহেরপুরের কবিগানকে কলকাতা ও গোপালগঞ্জ, নড়াইলের উত্তরসূরি বলা যায় এবং সেটাই স্বাভাবিক। মেহেরপুরের সাথে কলকাতার কবিয়ালদের যে যোগাযোগ ছিল তা মেহেরপুর নিবাসী লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সেকালের স্মৃতি' (২০০৪) গ্রন্থে তিনি লিখেছেন : "কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয় রসসাগর নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি নদীয়ার মহারাজা গিরীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভাকবি ছিলেন। আমাদের মেহেরপুরের বাড়িবাঁকায় (চলতি নাম বুড়িপোতা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন, মুখে মুখে পদ রচনায় শক্তি তাহার অসাধারণ ছিল।" কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মুখে মুখে পদ রচনা করতে পারতেন।

www.pathagar.com

কবিগানের আসর

কিন্তু কবিয়াল বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। তবে তার পদ কবিগানের আসরে ব্যবহৃত হতো। তিনি আরও লিখেছেন, "সেকালে বারোয়ারি তলায় যেমন যাত্রাগান হইত, তেমনই কবিও হইত। কবিদলের লড়াই সাহিত্য হিসাবেও উপভোগ্য ছিল। কবি বলিলে একালে যেমন অশ্লীল আদিরসের ছড়া বুঝায়, সেকালে কবির গানে সেরূপ কিছু থাকিলেও আমরা গ্রাম্য বারোয়ারি তলায় যে কবি শুনিয়াছি, তাহা বড় মধুর বোধ হইত। অ্যান্টনি সাহেব সেকালে একজন বড় কবিওয়ালা ছিলেন। আমাদের বাল্যকালে কবির দলের একজন গায়ক বারোয়ারিতলায় অ্যান্টনি সাহেবের রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন, তাহা এমন মিষ্ট লাগিয়াছিল যে, এতকাল পরেও তাহা ভুলিতে পারি নাই; গানটি একালে গায় না, এজন্য এখানে উদ্ধৃত করলাম।

কহ সখী কিছু প্রেমের কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা॥
করিলে শ্রবণ, হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথা,
আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,
প্রীতি প্রয়াগে মুড়াবো মাথা,
আমি রসিকের স্থানে, পেয়েছি সন্ধানে
তুমি নাকি জান প্রেমবারতা।
কাপট্য ত্যাজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা॥
কোন প্রেম লাগি, নারদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী কোন্ প্রেমে।
কি প্রেম কারণে, ভগীরথজনে, ভাগীরথী আনে ভারত-ভূমে॥

www.pathagar.com

কোন প্রেমে হরি, বধে ব্রজনারী, গেলমধুরী, করে অনাথা।
কোন প্রেম ফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদ পেলে মাধবীলতা।[১]

দীনেন্দ্র কুমারের বিবরণ থেকে জানা যায় অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, রাসু নৃসিংহ, দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারীদের কবিগান মেহেরপুরে জনপ্রিয় ছিল। এ অঞ্চলের কবিয়ালদের গুরুপরম্পরা বিশ্লেষণের কোনো প্রামাণিক তথ্য না থাকলেও বলা যায়, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির শিষ্যপরম্পরা মেহেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে নড়াইল ও গোপালগঞ্জে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির শিষ্যপরম্পরার একটি ধারার খোঁজ পাওয়া যায়। নড়াইলের পাঁচু দত্ত সরকার (উনিশ শতক) ছিলেন অ্যান্টনির প্র-শিষ্য আর গোপালগঞ্জের মথুরানাথ বালা (১৮৬৩), অম্বিকা বালা, নায়ায়ণ চন্দ্র বালা (১৯০৭-১৯৮৪) এ ধারার শেষ দিকের প্রতিনিধি। এছাড়াও নড়াইলের তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৫-১৯১৪) এর শিষ্যপরম্পরার কবিয়ালগণ মেহেরপুরের কবিগানকে প্রভাবিত করেছেন। কারণ তারক সরকারের শিষ্যপরম্পরার মধ্যে যাদের নাম উল্লেখ করা যায়, তারা সকলেই নড়াইল, বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ অঞ্চলের অধিবাসী। নড়াইলের বিজয় সরকারের (১৯০৩-১৯৮৪) গান তো মেহেরপুর অঞ্চলে দারুণভাবে জনপ্রিয়। মেহেরপুরের কবিগানের শেষ প্রতিনিধি কবিয়াল রমজান আলী (১৯৩৬-) ও কমরুদ্দীন বিশ্বাস (১৯৪৬-) ভ্রাতৃদ্বয় বিজয় সরকারের অনুরাগী ও ভক্ত। হিতিমপাড়ার কবিয়াল দায়েম বিশ্বাসের পুত্র রমজান আলী ও কমরুদ্দীন বিশ্বাস মেহেরপুর অঞ্চলে এ ধারা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

হিতিমপাড়ার কবিগানের আসর

ভৈরব পেরিয়ে মোটরসাইকেলযোগে যখন হিতিমপাড়ায় পৌছালাম তখন বিকেল চারটা। ইতোমধ্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র নাজমুল হুদা মুঠোফোনে আমাকে জানাল, সব আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে, আপনারা চলে আসুন। পৌছিয়ে দেখি, গ্রামের পাকা সড়ক সংলগ্ন একটি বাগানে কবিগানের আসর বসেছে। গান পরিবেশনার জন্য মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছে এবং মঞ্চের উপর টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে শামিয়ানা। আসরে যারা এসেছেন তারা সবাই সাধারণ মানুষ অর্থাৎ কৃষক, ভ্যানওয়ালা, দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং আয়োজক হিসেবে কয়েকজন ছাত্র। মেহেরপুর, গাংনী থেকে আসা অতিথিদের বসার জন্য কিছু চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ দর্শক-শ্রোতারা কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ মাটিতে বসে কবিগান উপভোগ করছে। আসরে কবিয়াল হিসেবে এসেছেন এ গ্রামের সন্তান বিখ্যাত কবিয়াল রমজান আলী (৮০) এবং তার ভাই কমরুদ্দীন (৬৫) এবং দোহার রয়েছেন মজিবর, আয়ুবনবী, জালাল, ফৈয়মদ্দিন, নিফাজউদ্দীন, শরাফত। কবিয়াল ও দোহারদের সুরে, কথায় এবং বাদ্যযন্ত্রীদের ঢোল, জুড়ি, কাঁসর তালে এবং হারমোনিয়াম-বাঁশির সুরে কবিগান চলতে থাকে। আসরের নিয়ম অনুযায়ী দেবী বন্দনা, ডাক, মালসী, সখী সংবাদ, চাপান, উতর, বিরহ, খেউড় ইত্যাদি পর্বের গানের মধ্য দিয়ে রসের ও জ্ঞানগর্ভ কথার ঝলকানিতে দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেয়।

www.pathagar.com

সেদিন কবিগানের আসরে আলোচনার বিষয় ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা ভিত্তিক 'কৃষ্ণলীলা'। আসরে একপক্ষে কবি-গায়ক রমজান আলী আর অপরপক্ষে গায়ক কমরুদ্দীন বিশ্বাস। দুজনের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার বহর প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত। কিন্তু দুজনের ধমনীতে রয়েছে পিতামহ কবিয়াল ইছারুদ্দিন এবং পিতা দায়েম বিশ্বাসের রক্তধারা। আসর বন্দনা দিয়ে সূচনা হলো কবিগানের। কবিয়াল-দোহার মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও গাইলেন—

নমস্তে সুরদায়িনী, সুরেন্দ্র বন্দিনী বাণী,
বিশ্বরূপে বৈকুণ্ঠ বাসিনী, বিশ্ব হতে বিস্তারিয়া
বিধিমুখ প্রকাশিয়া, ব্রহ্মবেদ প্রকাশিনী।
নাদ শাস্ত স্বরূপিনী, পদ্মলোচনা ত্রিনয়নী
দাও মোরে অভয় বাণী॥
শ্বেত মূর্তি কায়া ধারা, শোভে-শুভ মনপারা
সিদ্ধা বিদ্যা তুমি প্রসিদ্ধ কারিণী॥

আসর বন্দনার পর শুরু হলো রাধাকৃষ্ণের পালা। প্রথমেই কমরুদ্দীন প্রতিপক্ষ কবিয়াল রমজানের কাছে জানতে চাইলেন রাধা কী? আর কৃষ্ণ কী?

জবাবে কবিয়াল রমজান আলী বললেন, কৃষ্ণ স্বয়ং এক সময় নিঃসঙ্গ ছিলেন। নিজের অন্তরের আনন্দ এবং অনন্তরূপে আস্বাদনের জন্য নিজেরই শরীর ভাগ করে রাধাকে সৃষ্টি করলেন। আসলে রাধা-কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। কিন্তু কৃষ্ণ নিজে ভাগ হয়ে রাধাকে সৃষ্টি করলেন নিজের মধ্যে আনন্দ-রসধারা উপভোগের জন্য। রমজান আলী আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত না হলেও কোরআন-হাদিস বৈষ্ণব সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-বেদান্ত সম্পর্কে রয়েছে তাঁর অগাধ জ্ঞান। এমনকি রবীন্দ্রনাথও তিনি পড়েছেন। মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত এক আসরে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের ২৯ সংখ্যক কবিতাটি ঈষৎ পরিবর্তন করে শোনালেন :

যখন তুমি আপনি ছিলে একা।
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।
আমি এলাম ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল, তোমার আনন্দ-কুসুম।
আমি এলাম কাঁপল তোমার বুক।
আমি এলাম এল তোমার দুখ।
আমি এলাম, এল তোমার আগুনভরা বসন্ত।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা দিয়ে তিনি বোঝাতে চাইলেন রাধা না এলে কৃষ্ণকে কেউ জানতো না। গ্রামীণ আসরে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দেন না, শহুরে আসরে দেন। হিতিমপাড়ার আসরে তিনি কৃষ্ণ হয়ে বলছেন :

তুমি কেগো ধনী একাকিনী, দাঁড়াও যমুনার কূলে,
কলসি লইয়া একা এসেছো জল ভরিবার ছলে॥
তুমি হও কিনা বিবাহিতা, সত্য-সতী-পতিব্রতা,

www.pathagar.com

কেবা তোমার পিতা-মাতা পরিচয় দাও বলে॥
তুমি বলো কাহার নারী কিংবা আছ কুমারী,
একা একা বেড়াও ফিরি দেখি ঐ কদমতলে॥
আমি বনে বাজাই বাঁশি, তুমি কেন হও উদাসী,
যমুনার কূলে দাঁড়াও এইসি,
একজন লইবার ছলে॥

পয়ার : পরের বধূ, পরের নারী বারে বারে চাও কেন ফিরি
স্বামীর সেবায় সতীনারী অন্যকে চায় না ভুলে॥
শাশুড়ি-ননদী যারা কলংকিনী বলবে তারা,
রমজান বলে দুকূল হারা ভেসে যায় সে অকূলে॥
রাধা হয়ে প্রতিপক্ষ তখন জবাবে, গানের সুরে বলছেন :
আমি বলতে নারী লজ্জাই মরি,
কালার বাঁশি শুনে মন উদাসী ঘরে থাকতে পারিনে,
বাঁশি রাধা নামে বাজে, শুধু সুরেতে লাগাইয়া যাদু,
আমি ঘরের কূলবধূ ঘরে থাকি কেমনে॥
আমি হইলাম কুলবতী, রাধা যুবতী,
পতিব্রতা সত্যসতী কোনো নাই জীবনে॥

পয়ার : বৃষ ভানু রাজার কন্যা নাম রাধারানি,
আয়ান আমার প্রাণপতি, আমি ঘরণী,
কি নাম তোমার বলো শুনি
ও কালো রাখাল, বনে বনে বাঁশি বাজাও
চরাও গরুর পাল॥
পরিচয় দাও কোন জনা হইল তোমার পিতা,
কোন খানেতে জন্ম আর কোন জনা মাতা॥
কাহার গরু চরাও তুমি কয়জন রাখাল বলো শুনি,
শুনে তোমার বাঁশির ধ্বনি ঘরে থাকতে পারিনে॥
বাঁশি তোমায় কেবা দিলো কিসের বাঁশি খুলে বলো,
কয় ছিদ্র বাঁশিতে রইল, কি বোল বলে কোন ছিদ্রতে
বল শুনি তাই জেনে।

বৈষ্ণব পদাবলির উপর ভিত্তি করে রাধাকৃষ্ণের এই পালা রচনা করেছেন কবিয়াল রমজান আলী নিজেই। তিনি বললেন, বাঁধা গান দিয়ে কবিগান হয় না। প্রয়োজনে আসরেও গান বাঁধতে হয়। রাধার প্রশ্নের জবাবে কৃষ্ণ হয়ে গাইছেন :

আমি কেলে সোনা তুমি আমায় চিনলে না,
অনন্ত রূপ দেখাইলাম যুগে যুগে দেখ না,
পূর্বে কালো ছিলো ভুবন, আলোতে হইল সৃজন,
প্রলয় শেষে কালো বর্ণ হবে তাহা জান না॥

www.pathagar.com

কালো বলে করো ঘৃণা, কালোর ব্যাখ্যা জানো না,
শ্যামল বরণ কেলে সোনা, তুমি একবার দেখ না॥
কালো কালিতে হয় প্রমাণ, লিখে ভারত বেদ, পুরাণ
কালো কেশেতে তোমায় সাজাই ললনা॥
যমুনার কালো জলে, নিত্য যেয়ে স্নান করিলে,
কালো বলে মান বাড়ালে জানো কালোর গুণপণা॥

পয়ার : সত্য যুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাতে লাল নয়ন,
দ্বাপরেতে শ্যামরূপ ধরি নাম কৃষ্ণধন,
জিজ্ঞাসিলে মাতা-পিতা হয় কোন জন,
বাসুদেব পিতা আমার বলি বিবরণ॥
দৈবকিনী মাতা মোর দিলাম পরিচয়,
পালন হইলাম গোকুলে নন্দের আলয়,
নন্দ ঘোষ পালন পিতা, মাতা যশোদায়,
গোকুল নগরে বসত আমার তুমি জানো নাই॥
পিতা নন্দ, মা যশোদায় করিল লালন,
গরু চরাই সঙ্গে দ্বাদশ রাখালগণ॥
নয় ছিদ্র মোর বাঁশের বাঁশি সুর শুনে কতজন খুশি,
কতজন হয়ে উদাসী ঘরে থাকতে পারে না।
নন্দ ঘোষের বইতে বাধা, রাধা নামে বাঁশি সাধা,
রমজান বলে কৃষ্ণ রাধা ছাড়া হবে না॥

উতর-চাপানের মাধ্যমে প্রহেলিকার আকারে জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করা কবিগানের বৈশিষ্ট্য। এসব প্রশ্নের জবাবে কবিয়ালের শাস্ত্রজ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় মেলে। তাইতো রাধারূপী কবিয়াল গাইছেন :

ব্রজের রাখাল সেজে তুমি করো এত ছলনা,
যুগে যুগে পত্নীহারা লজ্জা-শরম নাই ঘৃণা।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেতে নিজ পত্নী অন্যের সাথে,
লজ্জা হয় না পরকে দিতে, এমন বেকুব কোন জনা॥
নিজের পত্নীর ভার যে নাহি পারে, জীবের ভার নেয় কেমনে করে,
তরাইবে এ সংসারে বিশ্বাস করে কোন জনা॥
কংসের ভয়ে ব্রজে এলে, নন্দ ঘোষকে বাবা বলে,
আপন বাবা মা রয় কি হালে একদিন ফিরে দেখলে না॥
তাদের পাষাণ চাপা বুকের পরে, রাখলেন অন্ধকার কারাগারে,
বাঞ্ছাকল্প নামটি ধরে বিশ্বাস করে কোন জনা।

এভাবেই কবিগানের আসরে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক গান চলতে থাকে। তারপর বিরহ। বিরহ গানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে মানবিক। রাধা-কৃষ্ণ ব্যতীত মানবিক, আনন্দ-বেদনা ও সুখ-দুঃখের ছায়া পড়ে এই বিরহ গানে। পরিশেষে হয় খেউড়। এগুলো ধর্মশূন্য

www.pathagar.com

অনেকটা বিরহের মতো। অধিকাংশ সময় অশ্লীল ও অশ্রাব্য ইঙ্গিতে পূর্ণ। এমনই এক খেউড় পরিবেশন করলেন রমজান আলী। তিনি আসরের এক পর্যায়ে বললেন :

আরবি ফারসি বাংলা বাত
চুদমারানীর বেহিদাত
কমজাত কমিন তুইও বটে।
কেবল তোমার ভুয়া জাঁক
করবো আজি দফা ফাঁক
থাকরে থাক করবো জুতো পিটে।
তোর কোন পুরুষে ছড়া জানে,
বলে যা আজ গানে গানে,
মানে মানে যাচ্ছি তোরে থুয়ে।
এবার যদি করিস ভরে দেব ভাঙা ঢোল
মুখে হোল্ দেব যে ঠেকিয়ে॥

মেহেরপুরের কবিগানের অন্যতম সার্থক প্রতিনিধি রমজান আলীর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি ২৬ অক্টোবর ২০১১। তিনি জানালেন, কবিগানের আসর আর তেমন জমে না। হাবিল বিশ্বাস, মন্মথ নাথ, ওলিদাদ মুন্সী নেই, তাই কবির লড়াই জমে না। আমার ভাই কমরুদ্দীন আমার বাঁধা গান নিয়ে আসরে নামে, কিন্তু বাঁধা গানে তো কবির লড়াই হয় না। ইছাখালীতে কবির লড়াই-এ আমি একদিন হাবিল বিশ্বাসকে বললাম :

এসব কথা রেখে থুই
কেমন ভাবের মানুষ তুই
তুই, মুই করে কথা বললি।
রমজান আলী বলে ভাই,
জুড়া গাথা ছড়া চায়
বললে বেজায়, তুলবো ঢাকা-দিল্লী।

অমনি হাবিল বিশ্বাস সাথে সাথে জবাব দিলো,

ছিটে ফুটা কত বোমা
কোন ঘরে দিয়েছ গুঁজা
মহারাজার কাছে লয়ে যাবো,
চুতমারানী ভেড়ির পাল,
ছিঁড়তে পারে না বাঁড়ার বাল
চড়িয়ে গলা সোজা করে দেব।

এমন রসাত্মক কথা ও ছড়ার ঝলকানি থাকলেই কবিগান জমে, কবিয়াল রমজান জানালেন। আর এজন্যই হয়তো কবিগানকে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। তবুও তিনি বলেছেন : "স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য ও ভাবের উচ্চতাও আছে"। একারণে বোধ হয়, আকাশসংস্কৃতির যুগেও এই কবিগানের প্রতি বাঙালির আবেগ কমেনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই এর রস উপভোগ করে আনন্দিত হয়। এখনও তারা গ্রামে-গঞ্জে লোকশিক্ষকের ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করে চলেছেন। আহমদ শরীফ 'কবিয়াল ও কবিগান' সম্পর্কে বলেছেন, "তাদের সর্ববিষয়ক জ্ঞান তথা সর্ববিষয়ে ব্যুৎপত্তি, তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তাদের প্রয়োগ পটুতা, তাদের একনিষ্ঠতা, বাকপটুতা, বাক প্রতিমা নির্মাণে আশ্চর্য কৌশল এবং পদরচনায় বিস্ময়কর দ্রুততা আমাদের অভিভূত করে।" তাদের বিতর্কের মধ্য দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই নিরক্ষরের দেশে কবিয়ালরা আজও লোকশিক্ষার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন গান দিয়ে।[২]

ঘ. লোকছড়া

বাঙালির চিরায়ত লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রাণসম্পদ ছড়া। আবহমানকাল ধরে লোকপরম্পরায় মুখে মুখে রচিত এবং প্রচলিত হওয়ায় গ্রামীণ জনপদের সুলভ এই ছড়াকে লোকছড়াও বলা হয়। ছড়ার সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাজন নিয়ে গবেষক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে কল্পনার রঙে আঁকা যে কোনো বিষয়ের বর্ণিল চিত্রই ছড়াতে প্রধান হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের লোকছড়া সাধারণত শিশুমনের বহুবিচিত্র কল্পনার রঙে আঁকা, কখনো কখনো সমসাময়িক নানান প্রসঙ্গও এসেছে ছড়ার বিষয়বস্তু হয়ে; তবু তা চিরন্তন আবেদন নিয়েই স্থায়ী ছাপ রেখে যায় লোকমানসে। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তজেলা মেহেরপুরেও ছড়িয়ে আছে অসংখ্য লোকছড়া। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনচর্যা থেকে সৃষ্ট বহুল প্রচলিত প্রবাদ আর লোকছড়া এখানে অনেকাংশে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আয়তনে ছোট হলেও এ জেলার অধিবাসীদের ভাষাভঙ্গি এবং উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে বেশ ভিন্নতা লক্ষিত হয়। নদীয়া জেলার উত্তরাধিকার বহনের সুবাদে মেহেরপুরের ভাষা প্রমিত বাংলা ভাষার খুবই কাছাকাছি বটে, তবুও জেলার পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের মানুষের উচ্চারণ-পার্থক্যের জন্যে একই ছড়ার একাধিক পাঠান্তরও ঘটছে। যেমন :

আয় ঘুম যায় ঘুম
মালিপাড়া দিয়ি
মালিগের বউ কানচে
ঘরে দুয়ুর দিয়ি... ।
(মেহেরপুরের পূর্ব অংশে প্রচলিত)
আয় ঘুম যায় ঘুম
মালোপাড়া দে
মালোদের বউ কাঁদছে
ঘরের দরজা দে।
(মেহেরপুরের পশ্চিম অংশে প্রচলিত)

অথবা,

আতাগাছে পাতা নি
বন্ধুর মুখি কতা নি।

www.pathagar.com

(মেহেরপুরের পূর্ব অংশে প্রচলিত)
আতাগাছে পাতা নেই
বন্ধুর মুখে কথা নেই।
(মেহেরপুরের পশ্চিম অংশে প্রচলিত)

শিশুর মন ভোলানো এবং কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তোলাই যেন লোকছড়ার প্রধান উদ্দেশ্য। পাঠক না হলেও লোকছড়ার উদ্দিষ্ট শ্রোতা যেন বা শিশুরাই। শিশুর জন্ম, ঘুম পাড়ানো, চাঁদ দেখানো, গোসল করানো, শিক্ষা গ্রহণ, শিকারে যাওয়া, যুদ্ধজয়, বিয়ে, নানান রকম খেলাধুলা ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গ নিয়ে মেহেরপুর জেলাতেও মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়েছে অসংখ্য লোকছড়া। আবার শিশুতোষ অনেক ছড়া মুখে মুখেই প্রচলিত হয়ে মেহেরপুরে পৌঁছেছে। এমনই একটি বহুল প্রচলিত ঘুমপাড়ানি ছড়ার উল্লেখ করা যায়।

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি মোদের বাড়ি এসো
খাট নেই পালং নেই খোকার চোখে বসো।
বাটাভরা পান দেব গাল ভরে খেয়ো
খোকার চোখে ঘুম নেই, ঘুম দিয়ে যেয়ো।

বর্গীহাঙ্গামার সঙ্গে সারা দেশের মানুষেরই কমবেশি পরিচয় আছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ প্রান্তে ভৈরব নদীপথে এসে বর্গীদস্যুরা বারবার মেহেরপুর-বাগোয়ান অঞ্চলে হামলা চালিয়েছে। কথিত আছে বর্গী আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় রাজা গোয়ালা চৌধুরী ভূতলকক্ষে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তারপরও রক্ষা পাননি। বর্গীভীতি এতদঞ্চলে এমনই প্রকট ছিল যে শিশুকে ঘুম পাড়ানোর সময়ও মায়েরা বর্গী-আগমনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মুখের ছড়ায়-

ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো,
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে?

ঘর-সংসারের শতেক কাজে ব্যস্ত মা অনেক সময় শিশুকে ঘুম পাড়ানোর দায়িত্ব দিতে চায় লেজ ঝোলা পাখির উপরে। সেই পাখিকে অন্য কোনো কাজ করতে হবে না, পেট ভরে ভাত খাবে এবং গান গেয়ে গেয়ে ঘুম পাড়াবে খোকাকে।

আয়রে পাখি লেজ-ঝোলা
ভাত খেয়ে যা এক কাড়া,
খাবি দাবি কল্‌কলাবি
আমার খোকার ঘুম পাড়াবি।

এই ছড়াটির বহুল প্রচলিত পাঠ কিন্তু একটু ভিন্ন রকম। সেখানে আবার ঘুমের কথা নেই। ছড়ার এই পাঠ থেকে মনে হয় যেন এটি শিশুকে ঘুমপাড়ানি ছড়া নয়, বরং বলা যায় শিশুকে দুধ খাওয়ানো ছড়া। দুধ খেয়ে শিশুর দেহে শক্তি বৃদ্ধি হবে, তখন সে বাঘ-ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও সক্ষম হবে, আরো কত কী! ছড়াটি এ রকম :

www.pathagar.com

আয়রে পাখি ল্যাজ ঝোলা
খাবি দাবি দুধ কলা।
দুধের বাটি তপ্ত
মানিক হবে শক্ত।
মানিক যাবে জঙ্গে
বাঘ ভালুকের সঙ্গে।
সেখানে গিয়ে কী করবে?
কাদা খুঁচ খুঁচ মাছ ধরবে।

দূর আকাশের চাঁদের সঙ্গে শিশুর সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা নতুন কিছু নয়। বাঙালি মায়ের চোখে আদরের শিশুটিই কখনো হয়ে ওঠে চাঁদ, কখনো বা সোনার চাঁদ। আকাশের চাঁদ এবং শিশু-চাঁদকে নিয়ে গ্রামবাংলায় অনেক লোকছড়া রচিত হয়েছে। সারা দেশের মতো মেহেরপুরেও চাঁদ বিষয়ক বহুল প্রচলিত বেশ কিছু ছড়া শোনা যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছড়ার অংশবিশেষ হচ্ছে—

চাঁদ বিষয়ক ছড়া

আয় আয় চাঁদ মামা
টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ
টিপ দিয়ে যা।

চাঁদ-সূর্য যতোই দূরে থাক, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে শিশুদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে মামা-ভাগ্নের। মায়েরা যেন চাঁদের সঙ্গে শিশুর উপমা দিয়েও শান্তি পায় না, শিশুকে চাঁদেরই অংশ ভাবে।

খোকন সোনা
চান্দের কোনা
চান্দের মতোন
আনাগোনা।

চাঁদ নিয়ে তো কল্পনার শেষ নেই বাঙালির। কবিতায়, গানে, ছড়ায়, গল্পগাথায় 'চাঁদের বুড়ি' কতভাবে যে ধরা দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। চাঁদের বুড়ি সম্পর্কে যে ধারণা শিশুকে দেওয়া হচ্ছে ছড়ায়, তা সত্যি না হলেও বেশ মজার।

চান্দের বুড়ি চরকা কাটে
দিনের ব্যালায় বুদ্ধি আঁটে
রাতের ব্যালায় চরকা কাটে।

সূর্য বিষয়ক ছড়া

শিশু মানসে চাঁদের উপস্থিতি অনেক বেশি জায়গা জুড়ে হলেও সূর্যের অবস্থানও একেবারে কম কিছু নয়। এখানেও সম্পর্ক সেই মামা-ভাগ্নেরই বটে।

সূয্যিমামা সূয্যিমামা
তোমার গায়ে হল্‌দি জামা

www.pathagar.com

আমার জামা লাল,
তোমার আমার ভালোবাসা
থাকবে চিরকাল।

চাঁদমামা বা সূয্যিমামা বলে তো শুধু নয়, শিশুদের কাছে শাসনবারণহীন মামাবাড়ির পরিবেশ চিরদিনই আকর্ষণীয়। 'পাকা জামের মধুর রসে' মুখ রঙিন করার দিন ক্রমশ ফুরিয়ে এলেও ভাগ্নেদের কাছে মামাবাড়ির আকর্ষণ মোটেই কমেনি। এরই মাঝে 'মামির হাতে দুধভাত পেট পুরে' খাওয়ার সুযোগও যে কতটা সংকুচিত হয়ে এসেছে তার প্রমাণ মেলে জনপ্রিয় একটি ছড়ার মেহেরপুরে এসে যে পাঠান্তর ঘটেছে, সেদিকে লক্ষ করলে।

মামাবাড়ির ছড়া—

তাই তাই তাই
মামাবাড়ি যাই
মামির পাতে ভাত নাই
পালাই পালাই।

দারিদ্র্যের ছাপ মামাবাড়িতে পড়তেই পারে। ভাগ্নের কিঞ্চিৎ অনাদরও ঘটতে পারে। তবু মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক টিকে আছে চিরকালের মধুর সম্পর্ক হয়েই। তাই প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে ছড়ার আভাস পাওয়া যায় এ বিষয়ে।

২. মামা-ভাগ্নে যেখানে
আপদ নেই সেখানে।

৩. জমি নিই তাই খামার চষি
ছেইলি নিই তাই ভাগ্নে পুষি।

৪. আতা গাছে দড়ি ফুল
মামার বাড়ি বহুদূর
মামির কানে নতুন দুল
আমার বাড়ি যাদবপুর।

শিশু ভুলানো ছড়া

অবুঝ শিশুর সরল মন জয় করা হয়তো কঠিন কিছু নয়। তবু শিশুকে ঘিরে মায়ের কত না প্রস্তুতি। ঘুম পাড়ানোর জন্যে কত না আয়োজন, কত না সাবধানতা—

'গোল করো না, গোল করো না খোকন ঘুমায় খাটে
এই ঘুমকে কিনতে হলো নবাববাড়ির হাটে।'

বেশ, হাট থেকে কেনা খাটেই না হয় ঘুমোবে খোকন, কিন্তু ঘরটা কেমন? সে বিবরণও পাওয়া যাচ্ছে অন্য একটি ছড়ায় :

খোকন শোবে ঘরে
ঘর ঝক্‌মক্‌ করে,
সোনার সিঁথি গড়িয়ে দেব
মুক্তো থরে থরে।

www.pathagar.com

বৈরী পরিবেশেও শিশুকে রক্ষা করার জন্যে মায়ের অন্তরে জাগে কত না আকুতি! শিশুর কোমল শরীরে তেল মাখাতে মাখাতে ছড়া কাটে মা :

ফুল ফুল ফক্কা
জ্বর জ্বালা যা-ই হোক
খোকা পাবে রক্ষা।

এভাবেই শিশুর সঙ্গে মায়ের নানাবিধ খেলার আয়োজন জমে ওঠে। পায়ের পাতার উপরে বসিয়ে শিশুকে কৌশলে উপরে তুলে ধরার সময় মায়েরা আদর করে ছড়া কাটে—

ঘুঘু সই
পুতুল কই?
পুতুল নেই
বাঘা ছেই।
মামা কই,
মাছ ধরছে।
মাছ কই,
চিলে নিয়েছে।
চিল কই,
উড়ে গেছে।

শিশুর সঙ্গে খেলার কি শেষ আছে মায়ের? তার সুকোমল হাতের তালুতে আদর চুম্বনে ভরিয়ে দেওয়ার পর মা নিজের ডান হাতের পাঁচ আঙুল দিয়ে সেই কচি তালুতে টোকা দিতে দিতে বলে—

দুধ দি ভাত দি
কালো মেকুরের গু দি,
তুমার শাউড়ির কটা মেকুর?

এক সময় কোলের শিশুকে মাটিতে নামায় মা। শিশুর হাত ধরে টলোমলো পায়ে তাকে হাঁটতে শেখায় এবং মুখে ছড়া কাটে :

লাল জুতুয়া পায়
খোকা হেঁটে যায়।
অথবা,
হাঁটি হাঁটি পা পা
পিঠে দেব গাঁ গাঁ।

ধীরে ধীরে বড় হয় শিশু। মায়ের মুখের মিষ্টি বোলের অর্থ খোঁজে। কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। মায়ের চোখে চোখ রেখে হেসে ওঠে গালে টোল ফেলে। নিজের দুই পা সামনে বিছিয়ে মেঝেতে বসে মা। সেই পায়ের বিছানায় শুইয়ে দেয় খোকাকে। তারপর খোকার দুই হাত পা দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়া কাটে মা :

আতাল পাতাল নিম চাতাল
নিম বনে ঘর

www.pathagar.com

আগুন নি পানি নি
দ্যাও চাড্ডি ভাত।
আজকে আমার গোবর হাত,
কালকে দেব
সোনার থালে দুধ ভাত।

কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন হয়ে দুধভাত খাওয়ার কি উপায় আছে? দুর্ভিক্ষের আভাস নিয়ে কোনো থুত্থুড়ি বুড়ি যদি সামনে এসে দাঁড়ায়! সেই আশংকার কথা ফুটে উঠেছে নিচের ছড়ায়—

ঐ তো বুড়ি টুক্ টুকানি
বুড়ির মুখি ছাই
একটুখানি ভাত পালি
হাপুস হুপুস খাই।

খোকা কবে বড় হবে, কবে লেখাপড়া শিখবে সে সব অনেক পরের কথা, মায়ের চোখে খেলা করে রঙিন স্বপ্ন। কল্পনার রঙ মাখিয়ে সে খোকাকেও বড় করে তোলে এক নিমেষে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিতেও উদ্যত হয়। ছড়ায় ফুটে ওঠে সেই চিত্র :

আমার খোকার বিয়ে দেব
হট্টমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে
তারা শানের উপর বসে।
রুই মাছ পালং শাক
ভারে ভারে আসে
তাই না দেইখি খোকার শাউড়ি।

খেলার ছড়া

শিশু বড় হয় আপন নিয়মে। মায়ের কোল থেকে নেমে আসে মাটিতে, মিশতে শেখে সমাজের সঙ্গে, স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে; মেতে ওঠে হইচই, আনন্দ-রঙ্গে। লেখাপড়ার পাশাপাশি কত রকম যে খেলাধুলা তার। কোনোটা মাঠের খেলা, কোনোটা ঘরের খেলা। খেলার সঙ্গে থাকে ছড়ার যোগ। সেই শিশুবেলাতেই কানে বাজে শব্দে শব্দে অনুপ্রাসের দোলা। আদৌ কোনো ছড়াই হয় না হয়তো, তবু ধ্বনি মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে শিশুরা দিব্যি মেতে ওঠে ছড়া কাটার খেলায়, দল বেঁধে বলে :

ওয়ান
গু খায়ি হও জোয়ান,
টু
মুচি মাগির গু,
থিরি
পায়খানার মিস্তিরি,
ফোর
হেডমাস্টারের জুতো চোর...

www.pathagar.com

এভাবেই চলতে থাকে ছড়ার খেলা। আবার নানা রকম খেলার পাশাপাশি খেলার ছড়াও মুখে মুখে দিব্যি উচ্চারিত হয়। 'ওপেনটি বায়োস্কোপ' তো এ দেশের প্রায় প্রতিটি জনপদেই জনপ্রিয় খেলা এবং খেলার ছড়া। দুই দল ছেলেমেয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ছন্দের তালে তালে খেলা করতে থাকে এবং ছড়া গাইতে থাকে। মেহেরপুরে প্রচলিত এই ছড়াটির পাঠ এই রকম :

ওপেনটি বায়োস্কোপ
তেরান্টি তেইশ কোপ,
চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা,
লাল বিলেতে যেতে
পান সুপারি খেতে,
পানের আগায় মৌরি বাটা
ইশকুল ঘরে চাবি আঁটা।

রেললাইন মেহেরপুরে নেই। কিন্তু রেলগাড়ি বিষয়ক ছড়াটি ঠিকই মেহেরপুরে এসে পৌঁছেছে। এখানকার ছেলেমেয়েরাও ক্লাসের ফাঁকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বহুল প্রচলিত এই ছড়াটি বলতে থাকে-

রেলগাড়ি ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম,
ইষ্টিশনের মিষ্টি কুল
শখের বাগান গোলাপ ফুল।

দুটি মেয়ে (দুটি দলও হতে পারে) মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুহাত সামনে বাড়িয়ে কখনো মাথার কাছে কখনো বুকের কাছে পরস্পরের হাতে হাতে হাততালি বাজাবে এবং ছড়া বলবে মুখে :

হেনা হেনা হেনা
তপ্ত দুধের ফেনা
শিম চটা চটা,
বাগুন ঘুটা ঘুটা।
অরো অরো অরো
লক্ষী সরস্বতী
অলক্ষীর বিয়ি
সিঁথিই সিঁদুর দিয়ি।

স্কুলপড়ুয়া শিশুরাই শুধু নয়, পল্লিবাংলার অনেক পরিণত বয়সের মানুষও 'ওয়ান-টু-থ্রি'র ছড়াটি মুখে মুখে আবৃত্তি করে থাকে। জনপ্রিয় এই ছড়াটি মেহেরপুরের পূর্ব অঞ্চলে এইভাবে উচ্চারিত হয় :

ওয়ান-টু-থিরি
পইড়ি পালাম বিড়ি,
বিড়িতি নি আগুন

www.pathagar.com

পইড়ি পালাম বাগুন,
বাগুনি নি বিচি
পইড়ি পালাম কাচি,
কাচিতি নি ধার
পইড়ি পালাম হার,
হারে নি লকেট
পইড়ি পালাম পকেট,
পকেটে নি টাকা
চইলি গ্যালাম ঢাকা,
ঢাকায় নি গাড়ি
চইলি আলাম বাড়ি,
বাড়িতি নি ভাত
পুঙা শুকিয়ি থাক।

এই রকম বর্ণনাপ্রধান আরেকটি ছড়া শুনতে পাওয়া যায় মেহেরপুর জেলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে। সে ছড়াতে জনৈক বানিয়ার বউকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে-

বানি-বউ বানি-বউ
দুধ কলা খায়ু না,
দুধে পলো মাছি
কুদাল দি চাছি,
কুদাল হলু ব্যাঁকা
কামার দি দ্যাখা,
কামার গ্যালো হাগতি
ওই শালা বাগ্‌দী!

গ্রাম্য স্কুলে ছাত্রদের বলা হয় ছোঁড়া বা ছুঁড়া। আর মেয়েরা ছুঁড়ি। তারা উভয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে ছোঁড়া-ছুঁড়ি বলে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো মেহেরপুরেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি ছড়ায় বলা হয়েছে-

ওই ছুঁড়াকে ধরবো
বেগুন গাছে বানবো
ঢেঁকিত কইরি কুটবো
চালুন দিয়ি চালবো
এক ঢোক পানি দি
কুত কইরি গিলবো।

গ্রামবাংলার পথে-প্রান্তরে যেমন ছড়িয়ে আছে বহু বিচিত্র খেলা, তেমনি আছে খেলার ছড়া। তেমনই একটা খেলা হচ্ছে ছাগল তাড়ানো খেলা। এ খেলাতেও শিশুরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে ছড়া বলতে থাকে। ছড়াটি সংলাপধর্মী।

www.pathagar.com

১ম : ছাগল ঘিরিরে ছাগল ঘিরি
২য় : কী বুল্চি রে লক্ষী বুড়ি?
১ম : তোর ছাগলে খাইলো ধান
২য় : খায়ি থাকে বাইন্দি আন।
১ম : কার বিয়ি?
২য় : শালীর বিয়ি।
১ম : কী বাজিয়ি?
২য় : ঢোল বাজিয়ি।
১ম ও ২য় : টাক ডুমা ডুম টাক ডুমা ডুম।

এতদঞ্চলের আরেকটি শিশুতোষ খেলায় দেখা যায় এক দল শিশু বৃত্তাকারে ঘিরে ধরে একজন শিশুকে। সবাই হতে হাত ধরে ঘুরতে ঘুরতে মুখে ছড়া কাটে-

ওই দ্যাখ চান্দ
গামছা বান্দ
গামছা নিলো চোরে,
পাঁচ সিকি দি বউ কিনলাম
চরকির মতো ঘোরে।

শিশুরা অনেক সময় তাদেরই একজন বন্ধুকে দারোগা সাজিয়ে তাকে ক্ষ্যাপানোর জন্যে কৌতুককর ছড়া কাটে-

মাথা মোটা দারোগা
ডিম পেড়েছে বারোডা,
একটা ডিম নষ্ট
মাথামোটার কষ্ট।

ভূত-প্রেতের ছড়া

নানাবিধ কুসংস্কার দানা বেঁধে থাকে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের মনে। ভূত-প্রেত নিয়ে বিচিত্র সব ছড়া রচিত হয়েছে মানুষের মুখে মুখে। এ সব ভূত-প্রেতের সঙ্গে আত্মীয়ের সখ্যতাও ফুটে উঠেছে কোনো কোনো ছড়ায়। যেমন—

ভূত আমার পুত
আর পেত্নি আমার ঝি
বাঁশতলা দি আসবো যাবো
করবি আমার কী?

কৃষি বিষয়ক ছড়া

কৃষি নির্ভর এই বাংলাদেশের ছোট্ট জেলা মেহেরপুর। এখানকার মানুষেরও জীবনের সঙ্গে কৃষি গভীরভাবে জড়িত। তাই সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়ার মধ্যেও বিস্তর কৃষি উপাদান পরিলক্ষিত হয়। চাষাবাদ, পশুপালন, বীজ বপন ইত্যাদি প্রসঙ্গ এ অঞ্চলের ছড়ায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যেমন :

www.pathagar.com

১. ষোলো চাষে মূলা
তার অর্ধেক তুলা
তার অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান।

২. গাইয়ের পেটের বলদ
আর মায়ের পেটের ভাই
সুহাল তাকে চাষের জন্যি
এই দুটুই চাই।

৩. চাষার চাষ দেখি চাষ করলু গোয়াল
ধানের সাথে সাথ নেই বোঝা বোঝা পোয়াল।

৪. গরু কুঁইড়ি তো অদ্দেক চাষ
কিষ্যাণ কুঁইড়ি তো সব্বনাশ।

বৃষ্টি-বাদলার ছড়া

কৃষির সাথে বৃষ্টি-বাদলেরও গভীর সম্পর্ক। বাংলাদেশের লোকছড়ায় অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষা ঋতুর চিত্র অধিক দেখা যায়। যদি বর্ষে মাঘের শেষে তাহলে যে ধন্য রাজার পুণ্য দেশ হয়, সে আমরা জানি, কিন্তু তীব্র খরায় বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনাও ফুটে ওঠে ছড়ায়। যেমন :

কালো মেঘে হুড়ুম ধুড়ুম/দুইধি ম্যাঘে পানি
মা-খাকি জ্বইলি মলো, দ্যাও আল্লা পানি।

বিয়ে বিষয়ক ছড়া

বাঙালি পরিবারে বিয়ের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়ে থাকে খুব ছোটবেলা থেকেই। শৈশবেই জানিয়ে দেওয়া হয় 'আমার খোকার বিয়ে দেব হট্টমালার দেশে।' অথবা 'কমলাফুলির বিয়েটা'র কথাই ধরা যাক, সেই বিয়েতে 'ঢাক ঢোল ঝাঁজর বাজে' শুধু নয়, আরো কত আয়োজন। পুতুলবিয়ে নিয়েও রচিত হয়েছে অনেক ছড়া। এ ছাড়া পণপ্রথা, কৌলিন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, সপত্নীবাদ প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে এতদঞ্চলের লোকছড়ায়। মেহেরপুরের কয়েকটি ছড়া :

১. কাঠবিড়ালি কাঠবিড়ালি
কাপুড় কাইচি দে
তোর বিয়িতি যাব আমি
পাল্‌কি সাইজি দে।

২. আমগাছের পাখিগুলো
জামগাছে যায়
তাই দেইখি হাচেনা বানু
বিয়ি কত্তি চায়।

৩. গাছের ফুলির এ্যাতো বাহার
সবার নজর পড়ে

www.pathagar.com

বিয়ির ফুল ফুট্‌লি তখুন
মন টেকে না ঘরে।

৪. টুন্‌টুনি পাখি নাচো তো দেখি
না বাবা নাচবো না/পইড়ি গেলি বাঁচবো না
বড় আপুর বিয়ি/কচ্‌কো সাবান দিয়ি
কচ্‌কো সাবান ভালো না/বড় আপার ছলনা।

৫. বাড়ির পাশে ঝালগাছে জিরি জিরি পাতা
পুঁচকি ছুঁড়ির বিয়ি হবে এ কী লজ্জার কতা!

৬. হাই ইশকুলের মেয়েদের লম্বা লম্বা চুল
সেই চুলেতে গোঁজা আছে ভালোবাসার ফুল।

৭. ও মা তোর পায়ে পড়ি/বউ এনে দে খেলা করি
বউয়ের মাথায় লম্বা চুল/বেঁধে দেব গোলাপ ফুল।
গোলাপ ফুলের সুগন্ধে/বর আসবে আনন্দে।

পারিবারিক ছড়া

বাঙালি পরিবার নানাবিধ সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ভাসুর, ননদ-সতীন সব কিছু মিলিয়ে পরিবার। গ্রামবাংলায় প্রচলিত লোকছড়ায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্কের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। কখনো ছড়া রচিত হয়েছে দেবর-ভাসুরকে নিয়ে, কখনো বা শ্বশুর-শাশুড়ি কিংবা অন্য কাউকে নিয়ে। যেমন :

১. সুস্‌সুড়ি শাক তুল্‌তি গেলাম
পিছ্‌লে ঘাটে পইড়ি গেলাম
দেখলু ভাসুর তুললু না
তার ভাইয়ের ভাত খাব না।

২. ভাসুর ভাসুর টুকি
চাল চড়াবো কটি?
অমন ভাসুর মরে না
ঘর ছাইড়ি সে নড়ে না।

৩. পুকুরেতে পানি নেই
হাঁস কেন ভাসে
দেওরার সাতে কতা নেই
সে কেন হাসে?

৪. এ্যালানি বউ ফ্যালানি হলো
হাড়ি-খাকি বউ গিন্নি হলো।

৫. গিন্নি মরলি সিন্নি দেব
আঁচল ঝুলিয়ি ঘাটে যাব,
আমি গিন্নি কবে হব?

www.pathagar.com

৬. বড় বৌর ক্যাঁকড়া চুলে
হরিণ পড়ে পালে পালে
ছোট বৌ হাইসিই মরে
ছালুন বালুন রাঁধার কালে ।

৭. ওমা তোর পায়ে পড়ি
থুইয়ে আয়গে শউর বাড়ি;
মায়ে দিল ষোলো টাকা
বাপে দিল শাড়ি
টপ্ কইরি মা বিদায় কর
পা উইঠিছি বাড়ি ।

৮. ওরে আমার দাদি
তুই যে পুয়াল গাদি,
ওরে আমার মা,
কাঠবিড়ালির ছা ।
ভাবির মাতায় ক্যাঁকড়া চুল
কোথায় পাব গ্যান্দা ফুল,
গ্যান্দা ফুলের ছড়াছড়ি
আয় বউদি আমার বাড়ি ।

গল্প বিষয়ক ছড়া

শিশুদের গল্প শোনার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার । তাদের সে কৌতূহল মেটাতে গিয়ে বড়দেরও অনেক সময় হিমসিম খেতে হয় । গল্প ছেড়ে তখন অন্য পথ ধরতে হয়, এমন কি গল্প বিষয়ক ছড়াও শোনাতে হয় :

গল্প সল্প তিলি পুটকির ছা
গল্প যদি শুনতে চাস
মোল্লাবাড়ি যা ।
মোল্লা নেই বাড়িতে,
হাইগি দিয়িচে দাড়িতে;
ধুইতি গিয়িচে গাঙে
মুইতি দিয়িচে ব্যাঙে;
কী ব্যাঙ- কোলা ব্যাঙ
ডাকতি জানে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ!

ঙ. লোককবিতা

লোকসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী ধারা লোককবিতা । শিক্ষিত নাগরিক কবিরা নয়, গ্রাম্য কবিরা এই কবিতার রচয়িতা । এরা অধিকাংশই নিরক্ষর এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক এবং সামাজিক স্তর বিন্যাসে নিম্নবর্গীয় । ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের আবেগ অনুভূতি,

www.pathagar.com

আনন্দ, বেদনা, সুখ-দুঃখ, উৎসব-উদ্‌যাপন সম্পর্কে উপলব্ধি প্রকাশ করতে গিয়ে এসব কবিতার সৃষ্টি। মেহেরপুরের লোককবিতার ভাণ্ডারকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে গাড়াবাড়িয়ার রামেশ্বর দাস, বিদ্যাধরপুরের ইয়াছিন ঘরামি, মেহেরপুরের বাহরের জামাল শাহ, দারিয়াপুরের ফজলুল হক, মাইলমারীর ছহিরুদ্দিনের নাম উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন লোককবির জীবনী ও তাদের লোককবিতা এখানে তুলে ধরা হলো :

ছহিরউদ্দীন

লোককবি ছহিরউদ্দীনের জন্ম ১৯৫৩ সালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামে। পিতা আহাজউদ্দীন ছিলেন প্রান্তিক চাষি। অভাব-অনটনের কারণে লেখাপড়ার পাট তাঁর প্রাথমিক বিদ্যালয়েই চুকে যায়। তিনি অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা করেছেন, যেগুলি অধিকাংশই প্রকাশিত হয়নি। কবিতা ও গানই তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, স্বপ্ন-কল্পনা। ছাপার হরফে প্রকাশিত না হলেও এই স্বভাবকবির কবিতা-গান গাংনী অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতা এখানে তুলে ধরা হলো :

১

মন চলে যায় যে আমার পদ্মবিলের বাঁকে
প্রাণপ্রিয়া মোর জল নিয়ে যায় কলসি নিয়ে কাঁখে,
ঐ খানে যে সকাল সাঁঝে জল লইতে আসে
জল নিয়া যে চলা গো তাহার, আমায় ভালবাসে।
আমি আবার কখন যেয়ে
দেখবো আবার তাকে।
মনের কথা আমি যখন জানাই চোখের জলে
মুচকি যায় রূপসী বাড়ির দিকে চলে
তার লাগিয়ে মন যে আমার
কতই ছবি আঁকে।

২

এই দুনিয়ার সবাই বলে, পয়সা দিয়ে সবই পাই,
ধর্ম বলো যাহাই বলো পয়সা লাগে সব জাগায়।
মসজিদেতে গেলে পরে খাদেম বেটা পয়সা চায়,
মন্দিরেতে গেলে পারে পুরুত বেটা চোখ রাঙায়।
অবাক হয়ে ফিরে আমি আমার যে আর পয়সা নাই।
কোরান বাইবেল বেদ যা বলো পয়সা দিয়েই কিনতে হয়।
মক্কা-কাশী, বারানসী পয়সা দিলেই যাওয়া যায়,
বিনা পয়সার তীর্থ আমি কোথায় গেলে খুঁজে পাই।
ধর্ম আমায় কিনতে হবে, কর্মের বেলা যা হয় হোক,
সারা জীবন আর গেল না এই যে আমার মিথ্যা ঝোঁক।

www.pathagar.com

জামাল শাহ

মেহেরপুর শহরের ক্যাশ্বপাড়া নিবাসী বাউল অধিক ও গায়ক জামাল শাহর (১৯২৫-) নিকট থেকে সংগৃহীত একটি লোককবিতা :

পুরুষের গেছে বাহাদুরি
ঘরে ... খাটবে না আর কর্তাগিরি,
দেখতে পাবে দুদিন পরে
পুরুষ যাবে রান্নাঘরে, মেয়েরা নিয়ে শহরে
করবে কোর্ট কাছারি।
তারা উকিল- মোক্তার-জজ-ব্যারিস্টার,
শেষে বাদ দেবে চোকিদারি
পুরুষের ওপর করবে বাহাদুরি।
বুকে পেয়ে আলিম বল
চলছে দেখো মেয়ের দল
আজগুবি গল্প করে, চলছে সারি সারি।
তারা জুতা-মুজা সব পায়ে পরে,
হাতে আবার লাগায় ঘড়ি
আবার তোমরা যা করতে পারো,
আমরাও তা পারি ।
কেবল একটা জায়গায় ঠেকা আছি,
আল্লাহ মুখে দেয়নি কেবল দাড়ি।

ইয়াছিন ঘরামি (১৮৭৫-১৯৪৫) : ইয়াছিন ঘরামির জন্ম মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের চকপাড়ায়। প্রখর ছন্দবোধ সম্পন্ন এই স্বভাবকবি নিরক্ষর হলেও তাৎক্ষণিক কবিতা বাঁধার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। কবিতা রচনার পাশাপাশি সমকালীন বিষয় নিয়ে তিনি অসংখ্য গান বেঁধেছেন। কবিয়াল ও বয়াতি হিসেবেও খ্যাতি ছিল এই লোককবির। মোনাখালী গ্রামের শরফদ্দীনের নিকট থেকে সংগৃহীত এই কবির একটি কবিতা তুলে ধরা হলো :

সন তেরোশত ছত্রিশ সাল
ট্যাকায় আট কাঠা ধান
জীবের বাঁচে কিসে প্রাণ।
দু আনা মুজুরি দিয়ে খাটায় দিনুমান,
দুমুখো ওই সেকালী, হয় না বুজাই থাকে খালি
চর পড়ে না কাদাবালি
কী জঞ্জাল, সন তেরোশত ছত্রিশ সাল
হলো ভীষণ আকাল।

www.pathagar.com

চ. ভাট কবিতা

গ্রামীণ নর-নারীর সহজ সরল মাধুর্য মণ্ডিত প্রেমের আলেখ্য, জমি সংক্রান্ত বিরোধ, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, পরকীয়া প্রেম প্রভৃতি অবলম্বনে গ্রাম্য কবিরা যে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন, তা লোকসাহিত্যের অঙ্গনে ভাট কবিতা নামে পরিচিত। সুর সহযোগে এ কবিতা পঠিত হলেও কথা ও কাহিনিই প্রধান। সুর গৌণ মাত্র। সস্তা ছাপাখানা থেকে ছেপে কবিরা নিজে অথবা অন্যরা হাট-বাজারে, স্কুল-কলেজে এই কবিতা বিক্রি করে বেড়ায়। এসব কবিতায় একদিকে যেমন সাহিত্যরস আছে, শিল্প আছে, তেমনি এর আছে ব্যবসায়িক গুরুত্ব। কলকাতার বটতলা থেকে পুথিসাহিত্য ছেপে হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনার মুসলমান শায়েররা ব্যবসা ফেঁদেছিলেন ভাট কবিতার রচয়িতারাও তাদের কবিতা নিয়ে ব্যবসা করার প্রচেষ্টা করে মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলা পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হোসনেয়ারা বীথির নিকট থেকে 'কমলমনির ঘাট' ও 'মনের মানুষ' শিরোনামে দুটি কবিতা এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো। কবিতাদ্বয়ের রচয়িতা মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের ছহিরউদ্দিন। কবিতা দুটি রংপুর ও কুমিল্লা জেলার দুটি প্রেমকাহিনি অবলম্বনে রচিত। যদিও কবিতার কাহিনি মেহেরপুর জেলার নয়, তথাপি কবিতা দুটির কাহিনি, প্রকাশভঙ্গি এ অঞ্চলের মানুষকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছে। এখনও প্রতিদিনই এ কবিতাদ্বয়ের শত শত কপি হাট বাজার, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিক্রি হচ্ছে।

সংগৃহীত ভাট কবিতা-১

কমল মনির ঘাট
বা প্রেমের আলো

এই ঘাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠিয়াছে
একটি পবিত্র করুণ প্রেমের কাহিনি

রচনায় : পল্লিকবি মো. ছহির উদ্দিন

গ্রাম : মাইলমারী, ডাকঘর : নওপাড়া
থানা : গাংনী
জেলা : মেহেরপুর

প্রকাশনায় : মো. মনিরুল ইসলাম
সর্বসত্ব : লেখক

www.pathagar.com

শুনেন ভাই, বন্ধুগণ, দিয়ে মন, শুনিবেন সবাই,
কমল মনির প্রেমকাহিনি লিখি রচনায়॥
ঘটনা রংপুরেতে, বেনের হাটে, শৃরামপুরে বাড়ি
ছিলেন এক জমিদার, নামটি তাহার রতন লাহিড়ী॥
ছিলো তার একটি কন্যা, রুপে ধন্য, নামে কমল মনি,
দেখলে মনির মন ভুলে যায়, সেই চাঁদ বদনী॥
কন্যার রূপের বাহার, বলবো কি আর, যেমন চাঁদের আলো,
লম্বা কেশে ঢেউ তোলা তার, হিমি চিকন কালো॥
কন্যার মাজা সরু, দুরু দুরু বুকে ফোটা ফুল,
আলিঙ্গন, মধুর লোভে, সদাই ও আকুল॥
মুখে তার মিষ্টি হাসি, মন উদাসী, মোহন বাঁশির সুর,
কোকিল কাঁদে কদম ডালে, হয়ে প্রেমাতুর॥
বুকে তার মতির মালা, ধরে গলা জড়াইয়া থাকে,
ডহরার দুলে উঁকি মারে, কমলকলি দেখে॥
একদিন সকালবেলায়, কমলা যে হায়, ফুল তুলিতেছিলো,
একটি ছেলে রুপ দেখে তার পাগলো হইলো॥
নাম তাঁর বিমল বাবু, নিজের তবু ছিলো জমিদারি,
এম. এস. সিতে পাশ করিয়া ছিলেন বসে বাড়ি॥
কন্যার রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া ঘটক পাঠাইলো,
বিবাহের দিন ধার্য করে ঘটক ফিরে এলো॥
বিবাহের দিন পড়িলো, লগ্ন হলো সোমবারেরও রাতে,
আনন্দেরও ঢেউ চলিল, জমিদারবাড়িতে॥
ধার্য দিন মতো, বিবাহ তো আসিয়া পড়িলো,
আচম্বিতে মহা বিপদ উপস্থিত হইলো॥
সকলের মনের হাসি, প্রাণের খুশি, মিলাইয়া গেলো,
পশ্চিমেতে মেঘ বেন্ধে ঐ আকাশো ছাইলো॥
উঠিলো তুমুলো ঝড়, বৃষ্টি যে আর শিলাঝড়ে পড়ে,
বজ্রপাতের শব্দ শুনে হিয়া কাঁপে ডরে॥
লগ্ন ভশ্ম হলো, না হইলো, বিবাহ যে আর,
ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলো রাত দশটার পর॥
বর ও যাত্রীগণ, মলিন বদনে, শুইয়া পড়িলো,
রতনবাবুর বাড়িতে হায়, ডাকাতও পড়িলো॥
ডাকাতে লুট করে, ভিড়তে না পারে, কেহ তাদের কাছে,
বন্দুক-পিস্তল, গোলাগুলি, ছুড়িয়া মারিছে॥
বান্ধিয়া জমিদারকে, শাঁসাইতে, চাবি ফেলে দিলো,
চাবি পেয়ে, দস্যুগণো, সিন্দুকো খুলিলো॥

www.pathagar.com

টাকা পঞ্চাশ লাল তার, আর অলঙ্কার, ছিনিয়ে লইয়া,
অন্য ঘরে যাই তাহারা, মশালো জ্বালিয়া॥
সেখানে পালঙ্ক পরে, ঘুমের ঘোরে, কমল মনি ছিলো
ডাকাতগণো, কমল মনিকে, দেখিতে পাইলো॥
দেখিয়া পাগলো হলো মুখে দিলো রুমালো গুজিয়া
শূন্য ভরে, কমল মনিকে লইলো তুলিয়া॥
কমলা চেতনা পেলো, না পারিলো চিৎকারো করিতে,
গুমরিয়া উঠে হৃদয়, না পারে কাঁদিতে॥
তাহারা লয়ে গেলো, নামাইলো, জঙ্গলো ভিতরে,
মুখের রুমাল, খুলে দিয়ে, শাঁসায় কমলারে॥
তোমরা ধর্ম বাপ, ধর্ম নাশ, করো না আমার
মান ইজ্জত, রক্ষা করো, অভাগী কন্যার॥
দস্যুরা না শুনিয়া, জোর করিয়া, জাত মারিতে গেলো,
কমল মনি আরাধনা করিয়া বলিলো॥
শুনো হে ভগবান, নিরাঞ্জন, ওগো তিরোপতি,
আমাকে আজ রক্ষা করো, ওহে বিশ্বপতি॥
ডাকাতরা না শুনিয়া, জোর করিয়া জাত মারিতে গেলো,
আচম্বিতে, উড়ো ফায়ার দুবারো হইলো॥
দস্যুরা চমকা খেয়ে, প্রাণের ভয়ে, পলাইয়া গেলো,
ঘোড়া হইতে একটি যুবক নামিয়া আসিলো॥
নিজের পকেট হইতে কোনোমতে রুমাল বাহির করে
কমল মনিকে বাতাস যুবক করেন ধীরে ধীরে॥
কমল জ্ঞান পাইয়া তাকাইয়া তাহাকে দেখিলো
ডাকাত ভেবে আতঙ্কেতে নয়নো বুঝিলো॥
তোমার ভয় নাই, দস্যুরা হায়, পলায়ে গিয়েছে,
নয়ন মেলে দাও পরিচয়, খুলে আমার কাছে॥
কি নাম বলো তোমার, মাতা-পিতার কি নাম তাদের শুনি,
আমাকে আজ ধন্য করে দাও পরিচয় তুমি॥
তখন ঐ কমল মনি চাঁদ বদনী বলিতে লাগিলো,
দুটি চোখের জলে গো তাহার বুক ভাসিয়া গেলো॥
পিতার নাম রতন বাবু শুনেন তবু মায়ের নামটি রানি
আমি অতি অভাগিনী নামটি কমল মনি॥
আজি মোর বিয়ের রাতে ডাকাতেতে লইয়া আসিলো
আমার মতো হতভাগিনী আর কে আছে বলো॥
তোমার পরিচয় আমায় দাও ওহে পরোদেশি
তোমার চরণ করিব সেবা হবো তোমার দাসী॥

www.pathagar.com

তখন ঐ পরোদেশি মৃদু হাসি বলিতে লাগিলো
কমল মনিকে নিজ পরিচয় খুলিয়া বলিলো॥
পিতার নাম হোসেন আলী মায়ের বলি নামটি গোলাপজান
আমার নামটি শুনো কন্যা মনিরুল ইসলাম॥
আজি ভোরবেলাতে শিকারেতে মনিপুরে যেয়ে
সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে শিকার নাহি পেয়ে॥
হঠাৎ মাঠের ভিতরে মেঘ ঝড়ে বিপদে পড়িয়া
গৃহস্তের এক বাড়ি দেখে উঠিলাম যাইয়া॥
রাত্রি দশটার পর মেঘ ঝড় থামিলো যখন
ঘোড়ায় চড়ে রওনা আমি হইলাম তখন॥
হঠাৎ মাঠের ভিতরে নারীকণ্ঠের চিৎকারো শুনিয়া
চমকে উঠে ঘোড়ার লাগাম ধরিলাম কষিয়া॥
ঘোড়া থেমে গেলো শুনা গেলো তোমার কান্নাকাটি
পায়ে ধরে তুমি তাদের জানাচ্ছো মিনতি॥
দস্যুরা না শুনিয়া জোর করিয়া জাত মারিতে গেলো
দেখে শুনে আমার প্রাণে ধৈর্য না ধরিলো॥
করিলাম উড়ো ফায়ার, দস্যুরা সব পলাইয়া গেলো
এখন কন্যা ঘরে তোমার রেখে আসি চলো॥
দুজনা ঘোড়ায় চড়ে জমিদারগৃহে উপস্থিত হইলো
ডাকাত ভেবে মনিরুলকে বান্ধিয়া ফেলিলো॥
থানাতে চালান দিলো জেল হইলো তিন মাস তাহার
মনির জন্য কেন্দে কমলা জারে জার ।
কমলা এতো করে পায়ে ধরে সবারে বলিলো
তবু কিন্তু তাহার কথা কেহ না মানিলো॥
পরদিন সকালবেলাই কমলার হায় বিবাহ হইলো
বিমল বাবু কমল মনিকো লইয়া চলিলো॥
রাত্রে বাসরঘরে রাতদুপুরে বিমলও আসিয়া
কমল মনিকে আদর করেন হাসিয়া হাসিয়া॥
কমলা চমকে উঠে খাট হইতে উঠিয়া বসিলো
বিমলবাবুর পায়ে ধরে বলিতে লাগিলো॥
তুমি নও আমার স্বামী সতী আমি ছুঁইও না মোরে
আমার স্বামী বন্দী আছে জেলেরও ভিতরে॥
তুমি জোর করিয়া আমায় ধরিয়া ইজ্জতো মারিলে
ঠিক জানিও মরবো আমি ছুরি দিয়া গলে॥
কমলার কান্না শুনে বিমলের প্রাণে দয়া হয়ে গেলো
সতী নারীর ক্ষতি করিতে নাহি আর পারিলো॥

www.pathagar.com

পরদিন সকালবেলায় কমলা যে হায় চিঠিতে লিখিয়া
জেলার-এর কাছে পোস্ট করিয়া দিলো পাঠাইয়া॥
ডাকাত নয় আমার স্বামী, নির্দোষ তিনি, আছেন কারাগারে
আমার স্বামীকে মুক্তি দিবেন আসল চোরকে ধরে॥
যদি দয়া করে ডাকাত ধরে সাজা দেন গো তার
জেলার পত্র পড়ে ব্যাপারটিরে বুঝিয়া লইলো
এই কেসেতে সি.আই.ডি. নিযুক্ত করিলো॥
সি. আই.ডি. বাহির হলো ধরা পড়িলো দস্যু দলোপতি
স্বীকার করিয়া বল্লো তারা করেছি ডাকাতি॥
ডাকাতদের সাজা হলো, মুক্তি পেলো মনিরুল ইসলাম
নৌকায় চড়ে যায় মনিরুল যায় গো নিজো ধাম॥
মনিরুল মুক্তি পেলো নাহি জানিলো তখন কমল মনি
মনির জন্যে কেন্দে কমলা হয়ে পাগলিনী॥
চলিলো নদীর ঘাটে ডুবে মরিতে কেহ না জানিলো
তেলের খুরি গামছা নিজের সঙ্গেতে লইলো॥
দাঁড়ায় নদীর কুলে কেন্দে বলে ওহে ভগবান
দয়া মায়া নাই যে তোমার হৃদয়ও পাষাণ॥
আমি ঐ সারা জনম তোমার চরণ করেছি বন্দনা
আজি এই মরণকালে চরণতলে, জানাই এ কামনা॥
যেনো গো মরণকালে, স্বামীর কোলে মরতে আমি পাই
বালিকার এই শেষ মিনতি তোমাকে জানাই॥
কমলা ইহাই বলে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলো
স্রোতের বেগে কমলা মনি ভাসিয়া চলিলো॥
স্রোতের দোলায় দোলায় যায় ভেসে হায় ছোট্ট ডিংগেখানি
মনির মনে দোল দিয়ে যায় কোথায় কমলা মনি॥
মনিরুল ইহাই বলে নদীর জলে তাকিয়ে দেখিলো
একটি মরা যাচ্ছে ভেসে দেখিতে পাইলো॥
এযে কমল মনি হায়রে তুমি জমিদার নন্দিনী
আমার জন্যে এই নদীর জলে মরলে ডুবে তুমি॥
মনিরুল ইহাই বলে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলো
সাঁতার কেটে কমল মনিকে তুলিয়া ধরিলো॥
কমলা অনেক কষ্টে মনির দিকে তাকিয়ে দেখিলো
যুগোল চোখের জলে গো তাহার বক্ষ ভেসে গেলো॥
শুনো মনিরুল প্রেমাতুল তুমিই ভালোবাসা
তুমি আমার জীবন মরণ তুমিই আমার আশা॥
এখানে দয়া নাই মায়া নাই নাই যে কারো প্রাণ
মাটির মানুষ গড়া এদের হৃদয়ও পাষাণ॥

www.pathagar.com

চলো চলে যাই দুজনায় ঐ যে পরোপারে
জনম জনম রাখবো তোমায় বুকেরও ভিতরে॥
কমলা ইহাই বলে মনির কোলে ঢুলিয়া পড়িলো
জন্মের মতো কমল মনি ছাড়িয়া চলিলো॥
মনিরুল কেন্দে বলে আমায় ফেলে চলে গেলে তুমি
তোমায় ভুলে কেমন করে থাকবো বেঁচে আমি॥
মনিরুল ইহাই বলে কমল মনিকে জড়িয়ে ধরিলো
জন্মের মতো প্রাণপাখি তার ছাড়িয়া চলিলো॥
এখনও ঐ অঞ্চলে লোকে বলে কমল মনির ঘাট
কুলোবধূরা নদীর জলে পূর্ণ করে ঘাট॥
তাহারা গেয়ে বলে চোখের জলে কমল মনির গান
গানের সুরে আকুল হয়ে কান্দে আমার প্রাণ॥
কবি ছহির বলে চোখের জলে কবিতা তামাম
মোমিনগণে আমার আজি লইবেন সালাম॥[৪]

সংগৃহীত ভাট কবিতা-২

মনের মানুষ

রচনায় : পল্লিকবি মো. ছহির উদ্দিন
গ্রাম : মাইল মারী, পোস্ট : নওপারা
থানা: গাংনী, জেলা : মেহেরপুর

প্রকাশনায় : হবিবুর রহমান

বামন্দী বাজার, গাংনী, মেহেরপুর ।

সর্বসত্ব : লেখক
মূল্য : মাত্র পাঁচ টাকা

www.pathagar.com

কুমিল্লা জেলাতে গো শোনেন আশ্চর্য ঘটনা
গ্রামের নামটি হিরা নগর ময়নামতি থানা
মনের মানুষ এই কবিতা লিখি রচনায় বন্ধু হে-
এক জমিদার ছিলেন যে সেথায় রহমাত উল্লাহ্ নাম
গরিবের উপরে গো তিনি ছিলেন দয়াবান।
একটি পুত্র নাম রাখিলেন আনোয়ার ইসলাম বন্ধু হে-
আনোয়ারের বয়স গো যখন ১০টি বৎসর হলো
জমিদারের ওপারের ডাক আসিয়া পড়িল।
স্ত্রী-পুত্র রাখিয়া যে তিনি ইন্তেকাল করিল বন্ধু হে-
জমিদার সাহেব যখনরে ভাই ইন্তেকাল করিল
ঐ সময়ে আনোয়ার ইসলাম নাবালক ছিল
সেই কারণে জমিদারের ভার ম্যানেজার লইল বন্ধু হে-
একে এক জমিদারি সব নিজ নামেতে নেয়
তার পরেতে মা-ছেলেকে তাড়াইয়া দেয়।
প্রাণের ভয়ে আনোয়ার ইসলাম অন্য গ্রামে যায়
বহু কষ্টে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর বানায় বন্ধু হে-
বর্ষা এলে বইসা গো ভেজে, ছাউনি চালে নাই
পৌষ মাসের ঐ হিমেল হাওয়ায় কাঁপুনি লাগায়
বহু কষ্টে ঐ ঘরে বাস করেন তারা ভাই বন্ধু হে-
এই ভাবেতে বেশ কিছু দিন গত হয়ে গেল
আনোয়ারের মায়ের অসুখ খুবই যে হইল
ঔষধ বিনা আনোয়ারের মা-জান মারা গেল বন্ধু হে-
আনোয়ারের যখনরে ভাই মা-জান মারা যায়
কাফনেরও টাকা কিন্তু কোথায়ও না পায়
ম্যানেজারের কথা যে তাহার মনে পড়ে যায় বন্ধু হে-
এই বিপদে ম্যানেজার বাবু টাকা আমায় দেবে
ঐ টাকাতে মায়ের আমার কাফন কেনা হবে
ঐ কাফনে মায়েরও যে দাফন হইবে বন্ধু হে-
বড় আশা করে আনোয়ার তাহার কাছে গেল
পায়ে ধরে বিনয় করে কত যে কান্দিল
তবু তারে ঐ ম্যানেজার টাকা নাহি দিলো
তাহার পরেও আনোয়ার ইসলাম পা ছেড়ে না দেয়
জোড়া পায়ের লাথি যে মারে তাহারও মাথায়
লাথির চোটে আনোয়ার ইসলাম অজ্ঞান হয়ে যায় বন্ধু হে-
শানের সাথে আঘাত লেগে নাক-মুখ ছেঁচে গেল
নাকে মুখে রক্তের গো ধারা বহিয়া চলিল

www.pathagar.com

আনোয়ার ইসলাম কাঁদতে কাঁদতে বাহিরও হইল বন্ধু হে-
ম্যানেজারের পরিচয়ও ভাই কী যে দিব আমি
নামটি তাহার শইলেন বাবু পদবি গোস্বামী
একটি চক্ষু কানা যে তাহার আসলও হারামি বন্ধু হে-
সইলেন বাবুর একটি পুত্র একটি কন্যা ছিল
আদর করে রেণুকা দেবী নামও যে রাখিল
পূর্ণিমার ঐ চন্দ্র যেন ধরাও নামিল বন্ধু হে
পড়নে তাহার বেনারসি কানে হিরার দুল
গলায় ছিল মতির মালা জামায় ঢাকা ফুল বন্ধু হে
যৌবনও গাঙ্গেতে যখন জোয়ার এসে যায়
নবীন মাঝি কূলে বইসা করেনও হায় হায় রে
রাজহংস মনের সুখে সাঁতার দিতে চায় বন্ধু হে-
রেণুকা দেবী পূজার লাগি ফুল তুলিতেছিল
শেফালি মালতি চাঁপা গন্ধরাজ তুলিল
গোলাপেরও কাছে গো যেয়ে হাসিতে লাগিল বন্ধু হে
গোলাপের উপরে গো একটি ভ্রমর বসেছিল
ভ্রমরকে উদ্দেশ্য করে রেণুকা বলিল
আমার ভ্রমর আসিবে কবে তাই আমারে বলো বন্ধু হে-
রেণুকারে দেখিয়া ভ্রমর গেল যে উড়িয়া
গোলাপের ঐ ফুলের মধু রহিল পড়িয়া
তাই দেখিয়া রেণুকা হেসে পড়ে লুটাইয়া বন্ধু হে
এর পরেতে রেণুকা হেসে রেলিং পানে চায়
আনোয়ারকে দেখিয়া যে তার মাথা ঘুরিয়া যায়
নাকে মুখে রক্তের গো ধারা বহে চলে হায় বন্ধু হে-
ইহাই দেখে রেণুকা দেবী দৌড়াইয়া গেল
কেন্দে কেন্দে আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করিল
এমন মারা কে মেরেছে তাই আমারে বলো বন্ধু হে
আনোয়ার ইসলাম কেন্দে বলে ঐ বলা বলো না
নারী জাতীর নাম ললনা সবই তার ছলনা
ভাঙা বুকের পাঁজর আমার আর ভেঙে দিয়ো না বন্ধু হে-
কি বলিলে প্রাণের ওগো বন্ধু শোন আনোয়ার
এমন কর্ম কে করেছে বলো না তোমার
গুলি করে মারবো গো তারে দিব্যি প্রতিমার বন্ধু হে-
শুন শুন ও রেনুকা বলি যে তোমায়
মা-জননি গেছেন যে মারা কাফন জুটে নাই
ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম তোমার বাবার ঠাঁই বন্ধু হে-

www.pathagar.com

ভিক্ষা নাহি দিয়া যে তিনি মেরেছেন আমায়
সেই কারণে রক্তের গো ধারা আমার ঝরে যায়
জন্মের মতো চলে যাব বিদায় দাও আমায় বন্ধু হে-
কী বলিলে প্রাণের ওগো বন্ধু শুন আনোয়ার
এই যে হাতে হীরার আংটি রয়েছে আমার
ইহাই বেঁচে মা-জননীর করো গো সৎকার বন্ধু হে-
এই বলিয়া হীরার আংটি রেণুকা খুলে দিল
আনোয়ার ইসলাম ঐ যে আংটি হাতেতে লইল।
সইলেন বাবু আড়াল হইতে সবই যে দেখিল বন্ধু হে-
তার পরেছে আনোয়ার ইসলাম বাড়ির দিকে যায়
সৈলেন বাবু খুব গোপনে বন্দি করে ভাই
রেণুকা দেবী এইসব কিছু জানতে নাহি পায় বন্ধু হে-
রাত বারোটায় সইলেন বাবু তার ছেলেকে বলে
আনোয়ারকে রাখিয়াছি অতি যে কৌশলে
কালীর কাছে দিব বলি যা থাকে কপালে আমার বন্ধু হে-
এই দুনিয়া আনোয়ার ইসলাম বেঁচে যদি থাকে
জমিদারি কেড়ে নেবে আমাদেরই সাথে
তারে আমি শেষ করিব এই যে আজি রাতে বন্ধু হে-
খাড়া তুলে সইলেন বাবু ছেলের হাতে দেয়
এক কোপেতে শেষ করে দাও কোনো চিন্তা নাই
আনোয়ার ইসলাম কেন্দে কেন্দে গড়াগড়ি যায় বন্ধু হে-
রেণুকা দেবী দ্বিতলপরে ঘুমাইয়া ছিল
ঘুমের ঘোরে আশ্চর্য এক স্বপন দেখিল।
আনোয়ারকে সঙ্গে করে ফুলবাগানে ছিল বন্ধু হে-
আনোয়ারকে কেইটে সাপে ছোবল দিতে গেল
রেণুকা দেবী চিৎকার দিয়া জাগিয়া উঠিল
জেগে উঠিয়া নিচের দিকে তাকিয়ে দেখিল বন্ধু হে-
বড় ভাই তার কোপ মারিতে উদ্যত হইল
ইহাই দেখিয়া রেণুকা দেবীর ধৈর্য না ধরিল
আলমারিতে বন্ধুক ছিল লইয়া আসিল বন্ধু হে-
তাড়াতাড়ি দুটি কার্টিজ ভরিয়া লইল
বড় ভাইকে লক্ষ্য করে গুলি যে ছুড়িল
বড় ভাই তার গুলি লাগিয়া ঢুলিয়া পড়িল বন্ধু হে-
সইলেন বাবু খাড়াখানি হাতে তুলে নেয়
চিৎকার কইরা আনোয়ারকে খুবই যে শাঁসায়
আল্লাহকে আজ যতই ডাক রক্ষা তোমার নাই বন্ধু হে-

www.pathagar.com

ইহাই বলে সইলেন যখন কোপ মারিতে গেল
রেণুকা দেবী দ্বিতল হইতে গুলি যে করিল
মাথায় তাহার গুলি লেগে ঢলিয়া পড়িল বন্ধু হে-
তার পরেতে বাবার কাছে কাঁদিয়া লুটাই
তোমার মতো মহাপাপী এই দুনিয়ায় নাই
যেমন কর্ম তেমনই ফল পাইলে যে তাই তুমি হে-
গভীর শোকে রেণুকা দেবী কেন্দে গাড়াগড়ি যায়
এইরূপে অবশেষে রাতও যে পোহায়
অবশেষে লোকজন এসে সান্ত্বনা যে দেয় বন্ধু হে-
তার পরেতে পুলিশ এসে তদন্ত করিল
ডাকাতেতে খুন করেছে সকলে বলিল
ইহার পরে রেণুকা দেবী জমিদার হইল বন্ধু হে-
এই ভাবেতে একটি বছর গত হয়ে যায়
সন্ধ্যাবেলা চিঠি লেখে চাকরও পাঠায়
এই রাত্রে দেখা করো তোমারে জানাই বন্ধু হে-
সন্ধ্যার পর আনোয়ার ইসলাম এই চিঠি পাইল
অপমান করে ঐ চাকরকে তাড়াইয়া দিল
রেণুকার চাকর আমি নই যে তারে যেয়ে বল তুমি হে-
চাকর যেয়ে রেণুকারে সব কথা বলিল
ইহাই শুনিয়া রেণুকা দেবী অনেক কাঁদিল
তবু সে যে চাকরকে আর কিছু না বলিল বন্ধু হে-
আনোয়ার ইসলাম চাকরকে যে তাড়াইয়া দিয়া
বিবেকের অনল যে তার উঠিল জ্বলিয়া
এই জীবনের এত মায়া হলো কি করিয়া আমার হে-
বাপ ভাইকে আমার জন্য যে খুন করিতে পারে
তারে আমি তাড়িয়ে দিলাম অপমান করে
আমার মতো পাপী বুঝি নাহি এই সংসারে বন্ধু হে-
এই রূপেতে আনোয়ারের রাত যে গত হয়
প্রভাত হইতে আর যে কিন্তু বেশি দেরি নাই
রেণুকার উদ্দেশ্যে তখন আনোয়ার বাহির হয়ে যায়
বেলা উঠিবার একটু আগে বাড়িতে পৌঁছায়া বন্ধু হে-
আনোয়ারকে দেখিয়া দারোয়ান বাধা নাহি দিল
সিঁড়ি বেয়ে আনোয়ার ইসলাম উপরে উঠিল
তার পরেতে রেণুকার ঘরে উপস্থিত হইল বন্ধু হে-
শূন্য বিছানা পড়ে আছে রেণুকা যে নাই
একটি চিঠি পড়ে আছে দেখিতে যে পায়

www.pathagar.com

আনোয়ার ইসলাম পড়ে দেখে তাজ্জব হয়ে যায় বন্ধু হে-
চিঠিতে লেখা আছে প্রাণের আনোয়ার
জমিদারি টাকা কড়ি সবই যে আমার
রেস্ট্রি করে দিয়ে গেলাম চরণে তোমার বন্ধু হে
সব ছেড়ে আজ চলে গেলাম ফিরিব না আর
তুমি আমার ধ্যানের ছবি তুমি গলার হার
ভুলেও যেন খোঁজ করো না তুমি যে আমার বন্ধু হে-
আনোয়ার ইসলাম কেন্দে বলে কোথায় তোমায় পাবো
যেথায় তোমায় আমি পাব রেণুকা সেথাই আমি যাব
তোমা বিনা এ জীবনে কেমনে বাঁচিব বন্ধু হে-
এই রূপেতে তিনটি বছর গত হয়ে গেল
রেণুকা দেবীর সন্ধান তবু কোথাও নাহি পেল
অবশেষে আনোয়ার ইসলাম বিবাহ করিল বন্ধু হে-
রাতদুপুরে বাসরঘরে আনোয়ার শুইয়া
পালংকেতে বৌয়ের সাথে ছিল ঘুমাইয়া
নিঝুম রাতে কান্নার সুরে উঠিল জাগিয়া বন্ধু হে-
আনোয়ার ইসলাম ঐ যে কান্না কান পাতিয়া শোনে
পাথর হলেও যায় গলিয়া তাহারও কান্দনে
আনোয়ার ইসলাম কান্না শুনে ভাবে মনে মনে
ফকির মিসকিন খাওয়াইছি কেহ বাকি নাই
এমন কান্না কান্দে কেন ভেবে নাহি পাই বন্ধু হে-
যে কান্দে তার কাছে যাব ধৈর্য নাহি হয় আমার হে
আনোয়ার ইসলাম দুই এক পা করে আগাইয়া যায়
কালীর ঘরে যেয়ে আনোয়ার দেখিবারে পায়
পাগলিনী এক কেন্দে কেন্দে গড়াগড়ি যায় বন্ধু হে-
আনোয়ার ইসলাম পাগলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল
এত রাতে কাছে কেন তাই আমারে বলো
দয়া করে বলো গো আমায় কি যে তোমার হলো
তখন ঐ পাগলিনী উন্মাদিনী বলিতে লাগিল
দুটি চোখের জল গো তাহার ঝরিয়া চলিল
আনোয়ারকে মনের কথা বলিতে লাগিল বন্ধু হে-
শোনেন বলি জমিদার বাবু শোনেন আনোয়ার
এই মনেতে একটি ছিল বাসনা আমার
বিয়ে হলে তোমার বউকে দেব উপহার বন্ধু হে-
ভাগ্যের দোষে সব গিয়াছে আমার কিছু নাই
আকন্দের এই মালাখানি আমি দিতে চাই

www.pathagar.com

ইহাই দিয়ে জন্মের মতো হইব বিদায় বন্ধু হে-
পাগলিনীর পাগলামিতে আনোয়ার রেগে যায়
জোড়া পায়ের লাথি মারে তাহারি মাথায়
আকন্দেরি মালা খানি ছিঁড়ে ফেলে দেয় বন্ধু হে-
লাথি লেগে পাগলিনীর নাক-মুখ ছেঁচে যায়
মুষল ধারে রক্তের ধারা বহে চলে হায়
পাগলিনীর দিকে আনোয়ার ফিরে নাহি চায় বন্ধু হে-
তার পরেতে আনোয়ার ইসলাম বাসরঘরে গেল
চেতন পেয়ে বৌ যে তাহার জিজ্ঞাসা করিল
এতো রাত কোথায় ছিলে তাই আমারে বলো বন্ধু হে-
পাগলিনীর সব কথা তার বৌকে বলে দেয়
তোমার মতো নরাধম এই দুনিয়ায় নাই
ভালো যদি চাও গো তুমি তাহার কাছে যাও বন্ধু হে-
পায়ে ধরে পাগলিনীরে ক্ষমা চাও গো তুমি
ছিঁড়া মালা দিয়ে আসো পরবো গলায় আমি
বৌ এর কথা শুনে আনোয়ার কালীঘরে গেল
আকন্দর ঐ ফুলগুলি সব খুঁটিতে লাগিল
ছিন্ন মালায় একটি আংটি দেখিতে পাইল বন্ধু হে-
আংটির উপর নাম যে লেখা রেণুকা সুন্দরী
আনোয়ার ইসলাম খুব জোরেতে উঠিল ফুকারি
পেয়েও আমি হারাইলাম এখন আমি কি যে করি
নিঝুম রাতে রেণুকার কান্না ভেসে চলে যায়
আনোয়ার ইসলাম পাওয়ার আশায় জোরেতে দৌড়ায়
বক্ষে তাহার রেণুকার নাম মুখেতে হায় হায় বন্ধু হে-
অনেক কষ্টে রেণুকারে ধরিয়া ফেলিল
জড়াইয়া ধরে তারে বুকেতে লইল
আমায় ফেলে যাচ্ছো কোথায় তাই আমারে বলো বন্ধু হে-
আনোয়ার ইসলাম কেন্দে কেন্দে গড়াগড়ি যায়
পেয়েও আমি হারাইলাম এই যে দুনিয়ায়
আমার মতো মহাপাপী আর তো কেহ নাই বন্ধু হে
এই খানেতে কবিতা আমার হইল তামাম
মুমিনগণে আমার আজি লইবেন সালাম
বাড়ি আমার মাইলমারী ছহির উদ্দিন নাম বন্ধু হে ॥

-সমাপ্ত-

www.pathagar.com

ছ. পুথি সাহিত্য ও পুথিপাঠ

বাংলা লোকসাহিত্যের বলবান ধারা পুথিসাহিত্যের উদ্ভব অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রি. পর্যন্ত কবিওয়ালাদের কবিগানের পাশাপাশি মুসলমান শায়েররা আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত যে কাব্য রচনা করেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পুথি সাহিত্য নামে পরিচিত। অনেকে পুথি সাহিত্যকে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলেন। তাদের কবিতা কলকাতার সস্তা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়েছিল বলে, একে অনেকে বটতলার পুথিও বলে থাকেন। এই সাহিত্য কোনো উন্নত মানের সাহিত্য ছিল না, এখানে মানুষের চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে মুসলমান শায়েররা লোকসাহিত্যের এই স্বতন্ত্র ধারাটি সৃষ্টি করেছেন। শায়েররা যে সব কাহিনি রচনা করেছেন, সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

এক. প্রণয় উপাখ্যান : ইউসুফ-জোলেখা, লাইলী-মজনু।

দুই. যুদ্ধ সম্পর্কিত কাব্য : জঙ্গনামা, আমীর হামযা, সোনাভান, কারবালার যুদ্ধ।

তিন. পির পাঁচালি : গাজী কালু চম্পাবতী, সত্যপীরের পুথি।

চার. ইসলাম ধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য, নবী-আউলিয়াদের জীবনী ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পুথি, কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিয়াতুল আউলিয়া ইত্যাদি।

মেহেরপুর পির-আউলিয়া, ওহাবি প্রভাবিত অঞ্চল হওয়ায় এখানে গ্রামে-গঞ্জে পুথিপাঠের প্রচলন ছিল। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, পিরদের মহিমা কীর্তন, গাজি কালু চম্পাবতী, ইতিহাসের ছায়া অবলম্বনে বিধর্মীদের দলন কাহিনি অবলম্বনে এ অঞ্চলের শায়েররা অসংখ্য পুথি রচনা করেছেন। এ অঞ্চলের পুথি রচয়িতা ও পাঠকদের মধ্যে মেহেরুল ইসলাম, যুগিন্দার গোলাম রসুল (১৯৩০-) যতারপুরের জুব্বার খতবী, বামনপাড়ার নজীব মীর মেহেরপুরের বন্দর গ্রামের শামসুদ্দিন মীর (জন্ম ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) এর নাম উল্লেখযোগ্য। গাড়াডোবের মুন্সি জমির উদ্দীনের পুথি রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি ছিল। কালের প্রবহমানতায় পুথিপাঠ প্রায় বিলুপ্তির পথে। তবু বন্দর, বামনপাড়া, যতারপুর, গৌরীনগর, যুগিন্দা প্রভৃতি আজও পুথিপাঠের আসর বসে। পুথিপাঠকদের মধ্যে আজও যারা জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে শামসুদ্দিন মীর অন্যতম। তাঁর জন্ম বাংলা ১৩০৮ সালে মেহেরপুর শহর থেকে ৪ কিমি. দক্ষিণে ভৈরব তীরবর্তী বামনপাড়া গ্রামে, বর্তমানে বসবাস করছেন বন্দর গ্রামে একটি পাঁচ চালা কুঁড়েঘরে। তাঁর পিতা আব্দুল জাব্বার মীর ছিলেন ইসলামি শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বন্দর জামে মসজিদের ইমাম। শামসুদ্দিন পড়াশুনা করেছেন মাদ্রাসা লাইনে ক্লাস টেন পর্যন্ত। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন কালেক্টরেট অফিসের পেয়াদা হিসেবে, পরে যোগ দেন ঋণ সালিশি বোর্ডে। মেহেরপুর সেন্ট্রাল ব্যাংকের কর্মচারী হিসেবেও কাজ করেছেন কিছুকাল। কোনো চাকরিতে তাঁর মন টেকেনি, অবশেষে কৃষিকাজে মনোযোগ দেন। ৭৬ বিঘা জমির মালিক শামসুদ্দিন কৃষিকাজেও সফল হতে পারেননি। সহায়-সম্পত্তি খুইয়ে এখন মাত্র ২ কাঠা জমির উপর নির্মিত একটি কুঁড়েঘরে বাস করছেন। ১১২ বছরের এই অশীতিপর বৃদ্ধ জলচৌকিতে বসে এক আসরে পুথি শোনালেন একদিন :

www.pathagar.com

আল্লাহ আল্লাহ বলো বাইও নবি করো শান
নবির কালেমা পড়ে হয়ে যাবা পার,
বারো জঙ্গ করো মাজ কিতাবের খবর
তেরো জঙ্গে লেখা যায় টুঙ্গিরই শহর,
এককি রোজে সোনাভানু কহেওন উজিরে
এসাকই হুজরিই মোর পার পাছারিতে,
উজিরে কহিছে বিবি শোন সে খবর
মোহাম্মদ হানিফা আছে আরব শহর
বড় জোর ভালোমন্দ দুনিয়ার ভেতরে
লড়িতে তাহার সঙ্গে কেহ নাহিরে পারে।
যে বুঝি তকুব্বারি করল তাহার সঙ্গে
আজাই করিল তিনি আপনারই হাতে।
সোনাভানু বলে, আমি যাব মদিনায়
হানিফা কেমন মধু দেখিব তাহাই
মদিনার লোক আমি বান্ধিয়া আনিব
তহে ত আপন দেশে মুখ দেকাইবো,
তো, উজির কহিছে বিবি না করো বড়াই
তাহার সাথে পারে কেহ দুনিয়াতে নাই
আল্লার মেহের আছে তাহার উপর
কেহ না আটতে পারে দুনিয়ার ভেতরে।

ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আদর্শ-উদ্দেশ্য মুসলিম সমাজের সামনে তুলে ধরা জন্য মুন্সি জমিরুদ্দিনও পুথি রচনা করেছেন। শামসুদ্দিন মীরের পুথির বিষয়বস্তুর সাথে জমিরউদ্দিনের পুথির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মুন্সি জমিরের পুথির কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হলো :

আল্লা আল্লা বলো বান্দা নবী করো সার।
মোহাম্মদের দীন বিনা রাহা নাহি আর॥
মোহাম্মদের চার ইয়ার নাম তার শুন
আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী চারিজন।
এই চারির কম যেই উম্মতে জানিবে।
মোহাম্মদের সাফাৎ হতে দূর হয়ে যাবে।
মোহাম্মদের হুলিয়া পড়ি কান দিয়ে শুন।
দেলে একিন করে পড়ে তাতে ইমান আন॥
মোহাম্মদের হুলিয়া যেবা, সেরে শাম পড়িবে
আখেরে দোজখের আগুন তার হারাম হবে॥[৩]

চিত্তবিনোদনের উপকরণ হিসেবে এক সময় পুথিপাঠের গুরুত্ব ছিল। এখন এর গুরুত্ব নেই বললেই চলে। তবে এই সাহিত্য আমাদের আধুনিক সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জুলেখা (১৩৮৯-১৪১০),

www.pathagar.com

দৌলত উজিরের লাইলী মজনু (১৫৭৫), মুহম্মদ কবীরের মধুমালতী (১৭৩৯) প্রভৃতি পুথিসাহিত্যের দান এবং এসব গ্রন্থের চিত্র চরিত্রগুলি আজও আমাদের সাহিত্য-আকাশে জ্বলজ্বল করছে।

পুথিপাঠ সম্পর্কে শামসুদ্দিন মীর জানান, "পুথিপাঠের আসর সাধারণত বিকাল অথবা সন্ধ্যার গৃহস্থের উঠানে বসে। পুথি সুর করে পাঠ করা হয়, তবে এত যন্ত্রানুষঙ্গের কোনো ব্যবহার থাকে না।" তিনি আরও জানান, পুথিপাঠকরা অধিকাংশই ধর্মপ্রাণ মুসলমান। মুসলমান সমাজের সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্যও পুথিসমূহ রচিত হয়েছিল।

জমিরুদ্দিনের সমসাময়িক মেহেরুল এছলামও মুসলিম সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে পুথি রচনা করেন। বাউল, লালনশাহী ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং সুদখোর মহাজনদের শোষণ-নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরুল এছলাম পুথি রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই পুথি রচয়িতার জন্ম, মৃত্যু, জন্মক্ষণ সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন যে, তাঁর জন্ম গাংনী উপজেলার রাইপুর ইঝুড়ি গ্রামের। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। তাঁর পুথিতে ইসলামের আচার অনুষ্ঠান, দর্শন ও আধ্যাত্মিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। মেহেরুল এছলাম মূলত এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য পুথি রচনা করেন।[৫] যুগিন্দা গ্রামের গোলাম রসুল (৮২)-এর নিকট থেকে সংগৃহীত মেহেরুল এছলামের পুথির কিয়াদংশ :

আজ কেনে উঠানে সটান বড় মিয়া,
রঙের পালঙ্ক আজ কারে যাও দিয়া।
আজ কেনে শুইয়াছ হইয়া বেজদা॥
কারে আজ দিয়া যাও চাদের বাজার ?
আজ কেন তেরা কাছে ঢোল খোল নাই।
আনন্দ নওবত কেনে শুনিতে না পাই,
আজ কেনে ক্ষুণ্ন মনে শুয়েছ ধুলায়॥
থাকিত কিমতি কত শাল তেরা ঘরে॥
এত বলি আলেম আপন রাহে চলে॥
হইল দুভাগ সেই গায়েনের দলে ।
কেহ বরে ঠিকরে—যা আলেম কহিল॥
গানেতে মিয়ার আজ ফল না হইল।
আলেম মিয়ার বাড়ির পাইত না পানি
আজ তো সেই আলেমেই নিয়া টানাটানি,
আমরা খাইনু যার এত টাকাকড়ি॥
আজ না সাহস হয় যাই তার বাড়ি।
এই বলি কেহ কেহ তওবা বলিয়া।
আলেমের সঙ্গে চলে ঢোলক ফেলিয়া।

(পুথি পয়ার)

www.pathagar.com

ঢোলক, তাম্বুরা, খোল, সেতারা, বেহালা,
লিয়া গাছতলে বসে যত গানেআলা।
হাসি নাহি বালা মুখে, কেহ বলে যাই
কেহ বলে ফিরে চল, যেয়ে কাজ নাই।
জিজ্ঞাসে আলেম তাহাদের কেন হেথা,
কোথা হইতে আসিয়াছে, ফের যাবে কোথা।
গানেআলাগণ তবে করিয়া ছালাম
আলেমের সাথে কহে আদাবে কালাম।
আমরা বেতনভোগী গায়ের মিয়ার,
দুবেলা আসিতে গান গাইবার।
আজিও সাবেক মতো যাইতে ছিলাম,
হঠাৎ মিয়ার বাড়ি শোর শোনিলাম।
জিজ্ঞাসায় জানিলাম নাই বড় মিয়া,
মরিয়া গিয়াছে রাত্রে হায়জা হইয়া।

পুথিসাহিত্য থেকে চিত্ত বিনোদনের খোরাক পাওয়া যায়। পাশাপাশি এ থেকে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক সৃষ্টিসম্ভার সম্পর্কে জানা যায়। ইংরেজ আমলেও বাঙালি মুসলমানের চিন্তন মধ্যযুগে ছিল, তা এসব সৃষ্টিকর্ম থেকে অনুমান করা যায়। উনিশ শতকেও যে বাঙালি মুসলমান শুদ্ধ বাঙালি কিংবা মুসলমান হওয়ায় উপযোগী ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুথিপাঠের আসর থেকে।

তথ্যনির্দেশ

১. মোসা. তহমিনা খাতুন (৪৫), প্রযত্নে : মো. মিজানুর রহমান, গ্রাম : শালদহ, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ০৫.০৭.২০১২, সময় : সকাল ১১টা
২. মো. আবুল হোসেন (৬০), পিতা : মো. ছিপারউদ্দীন, গ্রাম : আলমপুর, উপজেলা : মেহেরপুর সদর, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ৯.১০.২০১২, সময় : বিকাল ৪টা
৩. দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'সেকালের স্মৃতি' রচনাসমগ্র, আনন্দ পাবলিসার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩৬৫-৩৬৬
৪. রমজান আলী (৮০), পিতা : দায়েম বিশ্বাস, পেশা : কৃষিকাজ, হিতিমপাড়া, মেহেরপুর, তারিখ : ১৪.০৯.২০১১, সময় : রাত ৯টা
৫. মুহাম্মদ রবীউল আলম, 'মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন জীবন ও সাহিত্য', ঢাকা, জুন ১৯৯৪, পৃ. ৫৪

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

ফোকলোরবিদগণ ফোকলোরকে যে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো—বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (Meterial Folklore)। আর বস্তুগত লোকসংস্কৃতির পর্যায়ের উদাহরণ হচ্ছে—মাটি, বাঁশ-বেতের বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র, লাঙ্গল-জোয়াল, নকশিদার জিনিসপত্র প্রভৃতি।

বস্তুগত লোকসংস্কৃতির যে-সব উপাদান রয়েছে সে-সব সৃষ্টি বা উদ্ভাবনের পেছনে পুথিগত শিক্ষা নয় বরং পৈতৃক পেশার সূত্রে যে শিক্ষা তা ভূমিকা পালন করে।

ফোকলোরবিদ মযহারুল ইসলাম তাঁর 'ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর পূর্ব-পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের নিকট, সমাজের একজনের নিকট থেকে সমগ্র সমাজের নিকট এবং এক দেশ বা সমাজ থেকে অপর দেশে বা সমাজে কতকগুলো উপায়ে প্রচারিত প্রবর্তিত বা অনুসৃত হয়।"

লোকশিল্প

উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক খোলসের বাইরে নিম্নবিত্ত শ্রেণি হাজার বছর ধরে শিল্পকলার যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে তাই লোকশিল্প। এ শিল্প হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান আদিবাসী নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত অবদানে নির্মিত হয়েছে। কালের যাত্রায় এই শিল্পের গুণগত পরিবর্তন হলেও এর মৌলিক রূপটি অপরিবর্তিতই আছে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের শিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গে আর পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্পীরা পূর্ববঙ্গে বাসস্থান পরিবর্তনের ফলে বাংলার লোকশিল্প একটি বিশেষরূপ পরিগ্রহ করে। পূর্বে যা একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল তা অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, আজ ঢাকার জামদানির শিল্পীদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবার পর সেখানেই তা উৎপাদন করছে। বাঁকুড়ার ঘোড়া পুতুল হিসেবে মনোমুগ্ধকর, তা ঢাকাতেও অনুসরিত হচ্ছে। বাংলার লক্ষ্মীর সরা, ঢাকা ও ফরিদপুরে এর মূল উৎপাদন কেন্দ্র, আজ পূর্ববঙ্গের দেশত্যাগীদের জন্য কিছু শিল্পী নদীয়া ও কলকাতার কালীঘাটে তা উৎপাদন করছে। এভাবে দেশবিভাগ লোকশিল্পের কিছু কিছু উৎপাদনকে সারা বাংলায় বিস্তৃত করেছে।[১]

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ মেহেরপুরের লোকশিল্পকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দু মৃৎশিল্প, পটশিল্প, বাঁশ-বেতশিল্প, পটশিল্প, লোকস্থাপত্য, লোকভাস্কর্যের ধারাটি দুর্বল হয়েছে, অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান তাঁতশিল্পীরা মেহেরপুরের গ্রামে-গঞ্জে বসতি স্থাপন করায় তাঁতশিল্পের ধারাটি সমৃদ্ধ হয়। মেহেরপুরের ভৌগোলিক প্রতিবেশ ও কৃষিভিত্তিক সমাজের বাস্তবতায় এই অঞ্চলের অধিকাংশ ঘরবাড়ি মাটির দেওয়াল ও খড়ের চাল দিয়ে ছাওয়া। এ খড় ছাওয়া হয় বাঁশের কাঠামোর উপর। এ চালাবাড়ির

www.pathagar.com

ছাদ লক্ষ করা যায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থাপনার নির্মাণশৈলীতে। মেহেরপুর জেলার আলমপুরের শিবমন্দির, কাথুলী রোডের শিবমন্দির, কাথুলীর মন্দির চালাঘরের আদলে তৈরি করা হয়েছে। বলরাম হাড়ির আখড়াবাড়ি, মা বরকতের দরগার স্থাপত্যশৈলীতে চালাবাড়ির ছাদটি ব্যবহৃত হয়েছে নানা রূপে ও ব্যঞ্জনায়।

মেহেরপুরে তাঁতশিল্পের একটি গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। জেলার পিরোজপুর, দফরপুর, বিলকোলা, আনন্দবাস, সাহারবাটি, মানিকদিয়া, মটমুড়ায় বেশ কিছু তাঁত ছিল এবং এখনও আছে। ১৯৮০-র দশকে জেলায় ৬২৬টি তাঁতশিল্প চালু ছিল। মেহেরপুর শহরের তাঁতিপাড়ার কারিকর উন্নতমানের শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, গামছা, বুনতো। ১৯৩০ সালের দিকে এখানকার তাঁতের খ্যাতি মেহেরপুর ছাপিয়ে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁতিপাড়ার শাড়ি ও ধুতির বিশেষ কদর ছিল।

এ জেলার কাঁসা-পিতলশিল্পেরও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। রানাঘাট ও নবদ্বীপের কাঁসা পিতলের মতোই মেহেরপুরের কাঁসা-পিতলের কদর ছিল। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কাঁসারীপাড়া কাঁসা-পিতলশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কাঁসা-পিতলশিল্পী হিসেবে নীলমনি কাঁসারী ও কালি কাঁসারীর নামডাক ছিল। মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপক কাঁসারীপাড়া নিবাসী নুরুল আহমেদ বলেন, "কাঁসারীপাড়ার কাঁসাশিল্পের খ্যাতি ছিল অবিভক্ত বাংলায়। থালা, বাটি, পানির পাত্র, ঘটি, লোটা, ঘড়া প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিল্পসম্ভার এখানে বানানো হতো। ১৯৪৭ সালে এ পাড়ার কাঁসা-পিতলশিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়ায় এর ঐতিহ্য ধরে রাখা যায়নি।"

বেতশিল্পটি বিলীন হয়ে গেলেও বাঁশশিল্পটি এখনো মেহেরপুর জেলায় বহাল তবিয়তে টিকে আছে। ঘর-গৃহস্থালীতে ব্যবহার্য ঝুড়ি, কুলা, বারপোশ, টোকা, মাথাল, বিত্তি, পলো ইত্যাদি তৈরি হয় জেলার বিভিন্ন গ্রামে। মেহেরপুর শহর সংলগ্ন বামনপাড়ার দাস এবং গোহাটপাড়ার ব্যাধ সম্প্রদায় বাঁশশিল্পটিকে টিকিয়ে রেখেছে। কাজীপুর, মটমুড়া, বামন্দী, গাড়াডোবের দাসরাও বাঁশশিল্পের সাথে যুক্ত আছে।

নকশিকাঁথাও মেহেরপুরের লোকশিল্পে একটি বিশাল ক্ষেত্র দখল করে আছে। গ্রামের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নারীরাই এই নকশিকাঁথার কাজ করে। পুরনো কাপড়ের পাড় থেকে নেওয়া রঙিন সুতা দিয়ে পুরনো কাপড়ে নকশা তোলা হয়।

গহনাশিল্প থেকে শঙ্খশিল্প, সখের হাঁড়ি, লক্ষ্মীসরা, পটচিত্র, পুতুলশিল্প, প্রতিমাশিল্পসহ নানা লোকশিল্পের অস্তিত্ব মেহেরপুরের গ্রামে-গঞ্জে ছিল। ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে লোকশিল্পের পরম্পরা ধরে রাখা যায়নি। দেশভাগ, দেশত্যাগ, নানাবিধ উত্থান-পতন সত্ত্বেও কিছু কিছু শিল্পের অস্তিত্ব টিকে আছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে এসব লোকশিল্প ও শিল্পীদের সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবো।

১. মৃৎশিল্প

মেহেরপুরের লোকশিল্পের একটি প্রধান ধারা মৃৎশিল্প। এ অঞ্চলটি সমতলভূমি হওয়ায় এখানে ঘর-গৃহস্থালিতে মাটির তৈজসপত্র ব্যবহার করা হতো। পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় সম্ভবত মৃৎশিল্পকেন্দ্রিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। এক সময় প্রায় সব গ্রামেই

www.pathagar.com

কুমোরদের দেখা মিলতো। প্লাস্টিক ও অ্যালুমিনিয়ামের দাপটে মৃৎশিল্প লুপ্তপ্রায়। তবুও মেহেরপুর উপজেলার রাজনগর, পিরোজপুর, আমঝুপি, চাঁদবিল, গাংনী উপজেলার আমতৈল, মানিকদিয়া, সাহারবাটি, দিঘলকান্দিতে শিল্পটি আজও টিকে আছে। আমদহের রাজা গোয়াল চৌধুরীদের ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসগৃহ, বল্লভপুরে নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের শিবমন্দির ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে সে সময়ের মৃৎশিল্পের নানা নমুনা পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মেহেরপুর অঞ্চলের মানুষ ঘর-গৃহস্থালিতে মাটির তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহার করতো। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যের ধারায় স্নাত হয়ে মেহেরপুরে মৃৎশিল্প গড়ে ওঠে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে রাজা গোয়ালা চৌধুরী কর্তৃক মেহেরপুর থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করলে এ অঞ্চলের সাথে কৃষ্ণনগরের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সেই সময় মেহেরপুরের মৃৎশিল্পীদের সাথে কৃষ্ণনগর সন্নিকটবর্তী ঘূর্ণি, ষষ্ঠীতলা, কুমোরপাড়া এবং আনন্দময়ীতলা-রথতলা-নতুন বাজার এলাকার মৃৎশিল্পীদের সাথে সখ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসব এলাকায় মৃৎশিল্পীরা বংশপরম্পরায় বাস করে এবং মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য রয়েছে। আজও সেখানে মৃৎশিল্পের অসংখ্য দোকান আছে এবং বিক্রয়ের জন্য সাজানো আছে মৃৎশিল্প সম্ভার। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ২০১১ সালে মুজিবনগর সীমান্তে দুবাংলার উদ্যোগে আয়োজিত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে নদীয়া জেলার সভাপতি এবং চাপড়ার এম.এল.এ শামসুল হক মোল্লার পক্ষ থেকে মেহেরপুর-১ আসনের এম.পি. জয়নাল আবেদীনকে কৃষ্ণনগরের হাঁড়ি উপহার দেওয়া হয়। একথা বলা বাহুল্য যে, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পের ঐতিহ্য সুদীর্ঘ কালের। তারা কেবল সুদক্ষ কারিগরই নয়, একই সাথে আর্টিস্টও বটে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন : "কৃষ্ণনগরের কুমোররা ছিলেন যথার্থ আর্টিস্ট।" আর এই আর্টিস্টদের ছোঁয়ায় মেহেরপুরের মৃৎশিল্পীরা মাটি দিয়ে তৈজসপত্রের পাশাপাশি নানা ধরনের শিল্পসম্ভার নির্মাণ করতো।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর মুখার্জি, মল্লিক জমিদারদের মতো গ্রাম-গঞ্জ থেকে মৃৎশিল্পী পালরাও চলে গেছে। মেহেরপুর অঞ্চলের মৃৎশিল্পীরা অধিকাংশই কৃষ্ণনগর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে বসতি স্থাপন করে মৃৎশিল্পের সাথে যুক্ত আছেন। আমতৈলের পাঁচু গোপাল বললেন, "আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা প্রায়ই কৃষ্ণনগর এলাকায় বসবাস করে।" সাহারবাটির যুগল পালের ছেলে আনন্দ পাল (২১) মেধাবী ছাত্র ছিল, সে এখন নদীয়া এলাকার বিভিন্ন মণ্ডপে প্রতিমাশিল্পী হিসেবে কাজ করে। তারপরও অনেকেই মেহেরপুরে এই শিল্পের সাথে যুক্ত আছেন। আমতৈল গ্রামের জগন্নাথ পাল (৬০), পাঁচু গোপাল পাল (৫৫), শঙ্কর পাল (৪৫), মঙ্গল চন্দ্র পাল (৪০), আনন্দ পাল (৪৫), উত্তম পাল এবং সাহারবাটির যুগল পাল (৫০), রামজয় পাল (৪০), ননীবালা পাল, কৃষ্ণারানী পাল (৩৫) প্রমুখের জীবন-জীবিকা মৃৎশিল্পকে ঘিরেই। চাঁদবিলের রাম প্রসাদ পাল (৪৭), হাঁড়ি-পাতিল ছাড়াও দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে আয়-উপার্জন করেন।

www.pathagar.com

মৃৎশিল্পের উপকরণ

মেহেরপুরের মৃৎশিল্পের প্রধান উপকরণ মাটি। এঁটেল ও বেলেমাটি এবং ছাঁচের কাজের জন্য দোঁআশ মাটি। মাথাভাঙ্গা তীরবর্তী আমতৈল-মানিকদিয়া, কাজলা তীরবর্তী সাহারবাটি অঞ্চলের এবং রাজনগর, চাঁদবিলের মাটি এ কাজের জন্য উপযোগী।

নির্মাণকর্মের যন্ত্রপাতি

কাঠের আথাল, বইলি, পিটালি, চাক (কাঠ ও মাটি দ্বারা নির্মিত), আরও নানা মাপের তুলি ও ব্রাশ।

নির্মাণকৌশল

মেহেরপুরের মৃৎশিল্পীরা গৃহস্থালিতে ব্যবহার্য বিভিন্ন শিল্পসম্ভার, বিশেষ করে হাঁড়ি, কলস, কড়াই, ঝাঁঝর, চালুনি, পানের বাটা, নান্দা, মালসা, সানকি, পাত্র, ঘটি নির্মাণ করেন। এসব শিল্পসামগ্রী নির্মাণে একই ধরনের প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। এসব নির্মাণের লক্ষ্যে প্রথমে 'এঁটেল মাটি' সংগ্রহ করে ভালোভাবে ভেজানো হয়। তারপর ভেজা মাটি ছেনে কাদার গোলাই বানানো হয়। গোলাই চাকে তোলা হয় এবং চাক বড় লাঠি দিয়ে ঘোরাতে হয়। চাক ঘোরানোর সময় হাতের সাহায্যে শিল্পী বিভিন্ন শিল্পসামগ্রীর আকৃতি প্রদান করেন। চাকের কাজ সাধারণত পুরুষ করে। শিল্পসামগ্রীর ঊর্ধ্বাংশ শিল্পী হাতের সাহায্যে নির্মাণ করলেও নিচের অংশে ফাঁকা থাকে। পরবর্তীকালে নারীশিল্পীরা পেটন দিয়ে পিটিয়ে তলা জোড়া লাগায়। মাটির তৈরি জিনিসটি রোদে শুকিয়ে পুষল বা ভাটায় তোলা হয়। পোড়ানো হাঁড়ি, কলস, সানকি, ধূপদানী লাল রং ধারণ করে[২]।

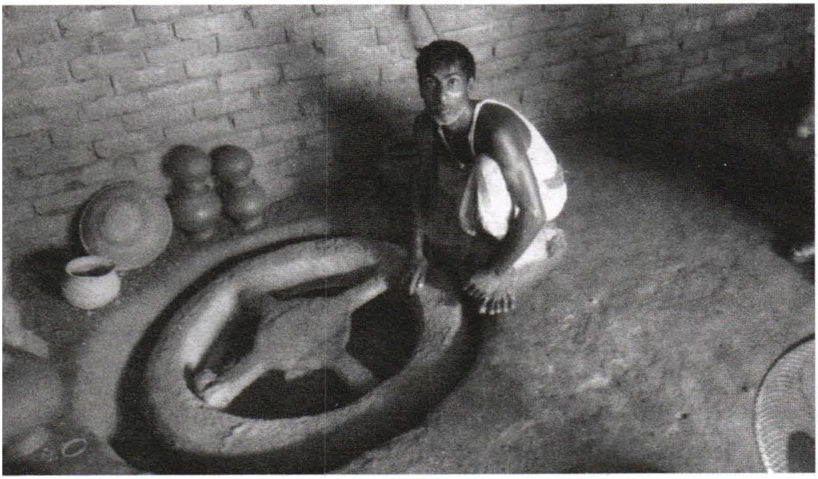

চাকে তৈরি মৃৎশিল্প

www.pathagar.com

২. পাটশিল্প

মেহেরপুর শহর থেকে ১৭ কিমি. দক্ষিণে ঐতিহাসিক মুজিবনগর আম্রকানন সংলগ্ন সীমান্তবর্তী গ্রাম ভবরপাড়া। এ গ্রামের বৈদ্যনাথতলা আম্রকানন, আজকের মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত এ গ্রামে প্রায় পৌনে দুশ বছর ধরে মুসলমান ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বসবাস। দু ধর্মের মানুষের পাশাপাশি বসবাস, পারস্পরিক লেনদেনের ফলে এদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সৌহার্দ-সম্প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধন ও অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির শক্তিশালী বুনিয়াদ। খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী সন্ধ্যারাণী মণ্ডল (৫০) বললেন, "আমার বাড়িতে দুপুরবেলায় ভাত না থাকলে মুসলমান বাড়ি থেকে নিয়ে আসি।" রশিদ শেখের স্ত্রী সালেহা খাতুন (৫০) বললেন, "আমিও খ্রিষ্টানবাড়ি থেকে প্রয়োজনে রান্না করা তরকারি নিয়ে আসি। আমরাও বড়দিনের উৎসবে যাই, তারাও ঈদের সময় মুসলমান বাড়িতে বেড়াতে আসে, খাওয়া দাওয়া করে।" সন্ধ্যারাণী মণ্ডল, সালেহা খাতুন, রানু মণ্ডল, হাজু, টোকনদের বসবাস ভবরপাড়া খ্রিষ্টান ধর্মপল্লির আশেপাশে। এরা জাতি ধর্মে কেউ খ্রিষ্টান, কেউ মুসলমান। এদের ধর্ম-পরিচয় যাই হোক না কেন, পেশায় এরা সবাই হস্তশিল্পী। এদের কেউ ১৪ বছর বয়সে বাধ্য হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল, আবার কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হবার আগেই অভাব-অনটনে স্কুল ছেড়েছিল। দিনমজুর, ক্ষেতমজুর স্বামীর সংসারে এসেও তারা সুখ-সচ্ছলতার মুখ দেখেনি, ক্ষুধা দারিদ্র্যই যেন তাদের নিত্য সহচর। এরই মধ্যে তারা স্বপ্ন দেখেছে সচ্ছল-স্বনির্ভর জীবনের। দুঃখ-দারিদ্র্য, মারী-মড়কে ক্ষত-বিক্ষত এই মানুষগুলোকে অন্ধকার থেকে সচ্ছল, স্বনির্ভর ও আলোকিত জীবনের সন্ধান দেন ভবরপাড়া ধর্মপল্লির কয়েকজন জাভেরিয়ান পুরোহিত। ফাদার পিটার কলম্বরা, ফাদার ডমিনিকে নিকো, ফাদার পিও মাত্তেফি, ফাদার সালভেত্তি, ফাদার ভেদস্ক, ফাদার মার্চেলো, ফাদার টনিনো, ফাদার জান্নি, ফাদার ক্লার্ডিও, ফাদার জন আর্চি, ফাদার মাজেলো প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ফাদার রানা মণ্ডল ও জন বিশ্বাস বললেন, অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন ফাদার জন আবিয়েত্তি। তিনি গ্রামের ১০/১২ জন নিরক্ষর দরিদ্র নারীকে নিয়ে হস্তশিল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ গ্রামের মেয়েদের শুধুমাত্র পাট দিয়ে ম্যাট, কার্পেট, ব্যাগ, পাখি, পুতুল বানানো শেখান। পাটজাত এসব সামগ্রী বিক্রি করে সন্ধ্যারাণী, সালেহা, রানু মণ্ডল, কাকলী মণ্ডলদের সংসারে সচ্ছলতা আসে।

ভবরপাড়া ধর্মপল্লির ইতিকথা

ভবরপাড়া একটি প্রাচীন জনপদ হলেও কখন থেকে জনবসতি গড়ে ওঠে জানা যায় না। গ্রামটির পশ্চিমে মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকুনা ও পশ্চিমবঙ্গের চাপড়ার মালিয়াপোতা ধর্মপল্লি, উত্তরে নাগারবিল, দক্ষিণে সোনাপুর, হৃদয়পুর ও ভারত সীমান্ত এবং পূর্বে মুজিবনগর আম্রকানন ও রামনগর। খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে অর্থাৎ উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ভবরপাড়া গ্রামে নিম্নশ্রেণির হিন্দু ও মুসলমানদের বসবাস ছিল। পেশায় এরা অধিকাংশই নিকেরি বা মাছের ব্যবসায়ী। কেউ কেউ ছিল তাঁতি, কলু, মাঝি, বাগদি,

www.pathagar.com

চামার। এই নিম্নবর্ণের মানুষগুলো ছিল পরস্পর গভীরভাবে নির্ভরশীল এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে অবিশ্বাসী। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এরা সকলেই উচ্চ বর্ণের উচ্চ ধর্ম তথা ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ইসলাম ধর্ম দ্বারা নিগৃহীত। সম্প্রদায়গতভাবে এরা হিন্দু-মুসলমান হলেও আচার-আচরণে তারা হিন্দু কিংবা মুসলমান ছিলেন না। এরা মসজিদেও যেত না, মন্দিরেও না। এরা নামাজ-রোজা, পূজা আহ্নিক জানতো না এবং মানতো না। উচ্চ বর্ণের দ্বারা নিগৃহীত এই অস্পৃশ্য মানুষগুলোর অনুরাগ ছিল সাহেবধনী ও কর্তাভজা ধর্মমতের প্রতি। শাস্ত্র, প্রথা, নিরস তত্ত্ব, আচার, মন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহের ফলে নদীয়া জেলায় এই দুই লোকধর্মের উদ্ভব হয়। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সাধনপীঠ চাপড়ার বৃত্তিহুদা, কর্তাভজাদের কেন্দ্র কল্যাণীর ঘোষপাড়া, তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার ভবরপাড়া গ্রামের নিকটবর্তী ছিল। চাপড়ার বৃত্তিহুদা ও ঘোষপাড়ার সন্নিকটবর্তী মেহেরপুরে কর্তাভজা ও সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো ছিল। এই দুই লোকধর্মের অনুসারীরা দুটি বৃহৎ ধর্মের চাপে নিভৃত জীবনযাপন করতো। একান্ত নিরুপায় হয়ে এরা দলে দলে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ধর্ম, জাত ত্যাগ করার পরও তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না, তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যায়। বিশ শতকের সত্তর দশকে এদের ভাগ্যের চাকা পরিবর্তনে এগিয়ে আসেন কয়েকজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজক। ভবরপাড়া ধর্মপল্লির ফাদার জন আবিয়েত্তি এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি দুঃস্থ, অসহায়, নিরক্ষর, হত দরিদ্র নারীদের হস্তশিল্প তথা পাটশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলেন। এ থেকে ভবরপাড়াসহ আশেপাশের গ্রামের দুঃস্থ নারীদের জীবনে সূচিত হয় নতুন অধ্যায়।

'শুভ কর্মপথে নির্ভয়' যাত্রা

সন্ধ্যারাণী মণ্ডল (৫০), সালেহা বেগম (৫০)-এর জন্ম মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর আম্রকানন সংলগ্ন ভবরপাড়া ধর্মপল্লিতে। এদের একজন খ্রিষ্টান এবং অপরজন মুসলমান। তবুও এদের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক, কারণ এরা দুজনই একই বয়সের এবং বড় হয়েছেন গরিব বাবার অভাব-অনটনের সংসারে। সন্ধ্যারাণী মণ্ডলের স্বামী জ্যাকব মণ্ডল এবং সালেহ বেগমের স্বামী রশিদ শেখ দুজনই দিনমজুর ও ভূমিহীন। প্রায়ই দুপরিবারের সদস্যদের অর্ধাহারে-অনাহারে থাকতে হতো। কিন্তু এই প্রচণ্ড অভাব সন্ধ্যা ও সালেহা মেনে নিতে পারেনি। তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। স্বপ্ন দেখেন নিজে কিছু করার। নিজেদের তৈরি নকশিকাঁথা বিক্রি করে কিংবা হাঁস-মুরগি পালন করে সংসারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু এতো কিছু করেও সংসার চলে না। একরকম আকস্মিক ভাবেই ফাদার জন আবিয়েত্তির আহবান ও পরামর্শ তাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেয়। সত্তর দশকে ফাদার আবিয়েত্তি ইতালি থেকে এসে একটি হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি ১০/১২ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এই কেন্দ্রে প্রথম দিকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন সন্ধ্যা রাণী মণ্ডল, সালেহা বেগম, রানু মণ্ডল, কাকলী মণ্ডল, হাজেরা, টোকন প্রমুখ। এরপর ভবরপাড়া, বল্লভপুর, শিবপুর, কেদারগঞ্জ, রামনগর, নাজিরাকুনা প্রভৃতি গ্রামের প্রায় ২০০ জন দরিদ্র, নিরক্ষর ও দরিদ্র নারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এখন ভবরপাড়াসহ আশেপাশের গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠীর

www.pathagar.com

উপজীবিকা পাটশিল্প। মূলধন ও উদ্যোক্তার অভাবে এরা বড় শিল্প গড়তে পারেনি এবং সে কারণে পারিবারিক উদ্যোগে এরা পাটনির্ভর কুটিরশিল্প গড়ে তুলেছে। এক সময় ঢাকা এলাকার মসলিন কাপড়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। ভবরপাড়ার পাটজাত শিল্পপণ্যের ইতালিসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাজারে খ্যাতি আছে। সন্ধ্যারাণী মণ্ডল ও সালেহা বেগম হস্তশিল্পী হিসেবে ইতালির বিভিন্ন শহর সফর করেন।

তাদের আর্থিক উন্নতি ও সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান দেখে প্রতিবেশী অন্য নারীরা পাটজাত বিভিন্ন শিল্পপণ্য তৈরির কৌশল শিখতে আসে। তারা তাদের শিখিয়ে দেয়। ভবরপাড়া ছাড়াও শিবপুর, বল্লভপুর, রামনগর, কেদারগঞ্জ গ্রামের তিন শতাধিক গৃহবধূ, স্বামী পরিত্যক্ত নারী ম্যাট, কার্পেট, সৌখিন পাখি, পুতুল, ব্যাগ তৈরি করে বেশ আয় করছে। শিল্পপণ্য বেচে বাড়ির জমি, আবাদি জমি কিনেছেন। খড়ের পরিবর্তে টিনের শেডের পাকা বাড়ি তৈরি করেছেন। বাড়িতে বসিয়েছেন টিউবওয়েল, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, রানু মণ্ডলের ছেলে ও মেয়ে এসএসসি পাস করেছে। তার এক মেয়েকে ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছেন। জ্যাকব মণ্ডল, আলদো মণ্ডল, রশিদ শেখরা আর দিনমজুর নয়, তারা এখন সচ্ছল গৃহস্থ।

নির্মাণ কৌশল

ম্যাট, ওয়াল ম্যাট, টেবিল ম্যাট, নানা ধরনের পাখি, খেলনা, কলমদানি, পুতুল, ব্যাগ তারা তৈরি করেন। পাটজাত এসব শিল্পপণ্য তৈরি করতে লাগে কেবলমাত্র পাট ও সুঁই। প্রথমে ভেজা পাটকে শুকিয়ে অপ্রয়োজনীয় আঁশগুলো ফেলে দিতে হয়। পাটশিল্পের জন্য মোটা আঁশের পাট লাগে। মেহেরপুর এবং নিকটবর্তী খুলনা, ফরিদপুরের মোটা ও শক্ত আঁশ এ কাজের জন্য বেশ উপযোগী বলে মনে করা হয়। এ কারণে ভবরপাড়ায় পাটশিল্প গড়ে উঠেছে। সুঁই দিয়ে বুননের কাজ করা হয়। উপকরণ হিসেবে সুঁই এর পাশাপাশি কাঁচিও লাগে। পাটের সুতার সাথে সুতা মিলিয়ে এরা তৈরি করে নানাসব শিল্পপণ্য। সন্ধ্যা, সালেহা, রানু, হাজু, টোকন এরা সবাই সৃষ্টিশীল নারী যারা পাটের সোনালি আঁশ দিয়ে নির্মাণ করতে চায় আগামী দিনের সোনালী ভবিষ্যত। এই সোনালি আঁশ আর শ্রম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতাই তাদের সামনে খুলে দিয়েছে স্বপ্ন ও সম্ভাবনার সিংহদুয়ার। এসব নারীদের নির্মিত শিল্পপণ্য ইতালির বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হয়। আর এর ব্যবস্থা করতেন ফাদার জন আবিয়েত্তি। এই মানবপ্রেমী সাধক একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্বাসনেও অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি খ্রিষ্টান সম্প্রদায়সহ হতদরিদ্র নারীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

মূল্যায়ন

ভবরপাড়া গ্রামের মানুষ মূলত কৃষিজীবী। কৃষির উপর ভর করেই তাদের বহুকাল ধরে চলতে হয়েছে। পাটশিল্প এ অঞ্চলের মানুষের সামনে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন বলেন, ভবরপাড়া

www.pathagar.com

ও এর আশেপাশের গ্রামের মানুষ প্রায় গরিব। এরা চার্চের সাহায্য এবং ইউনিয়ন পরিষদের ত্রাণের জন্য বিভিন্ন সময় ধরনা দিয়েছে। এখন তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

ভবরপাড়া চার্চের ফাদার জন বিশ্বাস বলেন, "পাটশিল্পের সাথে যুক্ত নারীরা যথার্থই সৃষ্টিশীল ও পরিশ্রমী। সৃষ্টিশীলতা ও শ্রম দিয়ে তাদের ভাগ্যের চাকা বদলিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পর ভবরপাড়া ধর্মপল্লিসহ ক্যাথলিক মণ্ডলীতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। স্থানীয়ভাবে ক্যাথলিক চার্চসমূহ পরিচালনায় বাঙালি খ্রিষ্টানদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়। খুলনা ধর্ম প্রদেশের বিশপ মাইকেল ডি. রোজারিও-এর উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে ১৫ জন সিস্টার এবং ১২ জন ফাদার খ্রিষ্টধর্মের বাণী ও দর্শন প্রচারে যুক্ত হয়েছেন। সবার প্রত্যাশা, খ্রিষ্টধর্মের সাধক ফাদারগণ পাটশিল্পের প্রসার ও বিকাশ এবং অসহায় নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখবেন আগামী দিনে।"[৩]

৩. তাঁতশিল্প

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের আর্থিক ও নৈতিক...যে পেশা লক্ষ জনসাধারণকে কাজ দিতে পারবে সে হচ্ছে সুতা কাটা। সুতা কাটাকে আমি কৃচ্ছ্রসাধন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করছি।"[৪]

গান্ধীজি তাঁতকাজকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করেছিলেন স্বদেশি যুগে। চারণকবি মুকুন্দ দাসও এ যুগে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে দোকান বসানো, তাঁত জুড়ার কথা বলেছিলেন তাঁর গানে। কাজী নজরুল ইসলামও 'চরকার গান' গেয়েছিলেন গান্ধীজির ডাকে। একথা বলাই বাহুল্য যে, বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির পাশাপাশি তাঁতের গুরুত্ব ছিল। তাঁতিদেরও আর্থিক সচ্ছলতা ছিল তা বিভিন্ন ছড়ার মাধ্যমে জানা যায়। মেহেরপুরের পিরোজপুর গ্রামের তাঁতশিল্পী ও যাত্রাভিনেতা শরিয়তুল্লাহের মুখে চরকা নিয়ে একটি ছড়া শুনেছিলাম :

চরকা আমার ভাতার-পুত
চরকা ঘরের বাতি।
চরকার দৌলতে আমার
চলে প্রেম-পিরিতি।
চরকা আমার সহায়-সম্বল
চরকা আমার হিয়া।
চরকার দৌলতে আমার
সাত পুরুষের বিয়া।

সেকালে ঢাকাই শাড়ি বিশেষ করে, মসলিনের কদর ছিল দেশ-বিদেশে। জামদানি আজও মাথা উঁচু করে সগৌরবে টিকে আছে। ঢাকার জামদানি ছাড়াও শাড়ির ক্ষেত্রে পাবনা ও টাঙ্গাইলের খ্যাতি আছে। ঢাকার জামদানি শাড়ির পুরো জমিন নকশা খচিত আর টাঙ্গাইল শাড়ির পাড়ে রয়েছে জাঁকজমক। আর নদীয়া শান্তিপুরী শাড়ির রয়েছে জগৎ জোড়া খ্যাতি যা আজও ম্লান হয়নি। নদীয়ার শান্তিপুরের ঐতিহ্যের ধারায় মেহেরপুরে তাঁতশিল্প গড়ে ওঠে। এছাড়াও মেহেরপুরের গাংনী সন্নিকটবর্তী চুয়াডাঙ্গার

www.pathagar.com

আলমডাঙ্গা থানায় তাঁতের গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গীতিকার, আলমডাঙ্গা নিবাসী কুবির গোসাঁই (১৭৮৭-১৮৭৯) বুক ফুলিয়ে পেশা হিসেবে তাঁতশিল্পের গৌরব ঘোষণা করেছেন। নিজেকে তাঁতি হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি গেয়েছেন :

যুগীর ব্যবসা ভাতসানা
এই সুতোর গায়ে মাখিয়ে তাই কাড়াই তানা॥
আমার দুইদিকে খাটুনী।
আমার একবার কাড়াই একবার করি তাসুনি॥
আমি গেঁথে সানা মেড়ো তানা
করি নরাজ গুটানি।
দিই বোয়া জুড়ে গেঁড়েয় পড়ে
ঝাপে কোপে তাঁত বুনি॥

কুবির গোসাঁই আলমডাঙ্গার ঘোষবিলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং সেখানে তাঁতের নামডাক ছিল। তাঁর তাঁত আজও পূজিত হয় এবং বারুণী তিথিতে উৎসব হয়। মেহেরপুর ও আলমডাঙ্গার তাঁতশিল্প সমসাময়িক এবং এ দুঅঞ্চলের উপর শান্তিপুরের তাঁতের প্রভাব ছিল। শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের ইতিহাস বেশ পুরানো। নদীয়ারাজ রুদ্র রায়ের আমলে (১৬৮৩-১৬৯৪) শান্তিপুরে তাঁত তথা বয়নশিল্পের সূচনা হয় এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আজও শান্তিপুরের তাঁতশিল্পের সুনাম আছে এবং শান্তিপুর মানে তাঁতশিল্প ও শিল্পীদের তীর্থভূমি। এখানকার তন্তুবায়রা বংশপরম্পরায় এ শিল্পের সাথে যুক্ত। মোঘল আমলেই শান্তিপুরের সূক্ষ্ম তাঁতবস্ত্রের খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে এবং এর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ও বাজার তৈরি হয়। দুর্গাচরণ স্যান্যাল তাঁর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "ভারতের বাইরে আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, আরব প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং গ্রিস, ইতালি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে শান্তিপুরের তাঁতবস্ত্রের সমাদর হতো স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে। আবার মোঘল অন্তঃপুরচারিনীদের বরতনুতেও শোভা পেতো শান্তিপুরী তাঁতবস্ত্র।"[৫]

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও শান্তিপুরের তাঁতিদের কথা উল্লেখ আছে। 'অদ্বৈতমঙ্গলে' শান্তিপুরের বৈষ্ণবপন্থি তাঁতিদের সম্পর্কে বলা হয় :

শান্তিপুরে যত ছিল তন্তুবায়,
আচার্য প্রাঙ্গণে আসি হরি গুণ গায়।

তবে শান্তিপুরী তাঁতশিল্পের মতো মেহেরপুরের তাঁতশিল্পের ইতিহাস ততো সমৃদ্ধ নয়। ভৌগোলিক সংলগ্নতা ও নৈকট্যের কারণে দুঅঞ্চলের তাঁতিদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। এক সময় মেহেরপুর শহরসহ পিরোজপুর, দফরপুর, কোলা, আনন্দবাস, যাদবপুর, সাহারবাটি, কোদালকাটি, মটমুড়া গ্রামে তাঁতশিল্প গড়ে ওঠে। এসব গ্রামের তাঁতিদের তৈরি শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতি বহুকাল ধরে মেহেরপুরের মানুষের চাহিদা পূরণ করেছে।

১৯৮০-র দশক পর্যন্ত মেহেরপুর জেলায় ৬২৬টি তাঁত ছিল, এর মধ্যে ৩৩৫টি মেহেরপুর থানায় এবং ২৯১টি গাংনী থানায়। ৮০ দশক পর্যন্ত প্রায় এক হাজার

www.pathagar.com

পরিবার তাঁতশিল্পের সাথে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করতো। ১৯৮০ সাল নাগাদ তাঁতশিল্পে মেহেরপুর জেলায় উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যাদির হিসাব বিবরণী :

	শাড়ি	লুঙ্গি	চাদর	গামছা	মোট
মেহেরপুর	১,১৬,১৩৬	১,৪৭,৬৪৮	১২,৬৭২	১,৬০,৫৪০	৪৩,৭০০৪
গাংনী	২১,৭২০	১,১৩,৬১০	—	৩,২২,২০৬	৪,৫৭,৫৩৬
মোট	১,৩৭,৮৫৬	২,৬১,২৫৮	১২,৬৭২	৪,৮২,৭৫৪	৮,৯৪,৫৪০

মেহেরপুরের তাঁতশিল্প এখন ধুকধুক করছে। বস্ত্রশিল্পে প্রযুক্তির ব্যবহারে উন্নতমানের কাপড় সহজলভ্য ও দামে সস্তা হওয়ায় তাঁতশিল্প প্রায় মরতে বসেছে। এর মধ্যে পিরোজপুর গ্রামে কয়েকজন তাঁতি টিকে আছে সংগ্রাম করে।

পিরোজপুর গ্রামের তাঁতশিল্প

মেহেরপুর শহর থেকে আট কবর সড়ক হয়ে ১২ কিমি. দূরে পিরোজপুর গ্রাম। যাত্রা, তরজা, কবি, সার্কাসের জন্য এই গ্রামের খ্যাতি ছিল। তাঁতি, ধোপা, কলু, জেলে, বারুইসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের বসবাস এ গ্রামে। এক সময় পিরোজপুরে ২০০ ঘর তাঁতির বাস ছিল। পিরোজপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ফজলুর রহমানের বাবা কমরুদ্দীন এবং বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের বাবা আব্দুর রহমান ও চাচা খলিল বিশ্বাস তাঁতকাজ করতেন। মেহেরপুরের কাপড় ব্যবসায়ী প্রয়াত সুরুয কমল আগরওয়ালা এবং চুয়াডাঙ্গার মাড়োয়ারিরা পিরোজপুর থেকে শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, গামছা কিনে বাজারে বিক্রি করতেন। কিন্তু পিরোজপুরের তাঁতশিল্পের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য আর নেই। বংশপরম্পরাগত ভাবে যাদের তাঁতকাজ করার কথা ছিল, তারা এখন জন খাটে, মাছ ধরে, ভ্যান-রিকসা চালায়, আবার কেউ বা দোকানদারি করে। এক সময়ের তুখোড় যাত্রাভিনেতা, তাঁতশিল্পী শরিয়ত উল্লাহ (৭২) জানালেন, "তাঁতকাজ বিশেষ করে, শাড়ি, গামছার কাজ করে কারো আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। সবাইকে এক পর্যায়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিতে হয়েছে। আমার বাবা নজির হোসেন, দাদা ভোলা কারিকর তাঁতি ছিলেন, কিন্তু আমি দোকানদারি করি মাঝে মাঝে তাঁত বুনি।" এত কিছুর পরও পিরোজপুরের তাঁতশিল্প বিলীন হয়ে যায়নি। এখনও সায়রা বানু (৪০), স্বামী-মশিউর রহমান; খায়রন নেছা (৪৫), স্বামী-হালিম; বেলী, স্বামী-ছোট; শিরিনা, স্বামী-আজিজুর; মনোয়ারা, স্বামী-লুৎফর; কুলসুম, স্বামী-শরীয়তুল্লাহ প্রমুখ তাঁত বুনে জীবিকা নির্বাহ করে। এখনও তারা শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি বোনায়। শান্তিপুরের মতো পিরোজপুরের তাঁতশিল্পে নারীদের ভূমিকা বেশি। নারীরাই মূলত সুতো কাটার কাজ করে। এ গ্রামের সাথে শান্তিপুরের রয়েছে সুদীর্ঘকালের সম্পর্ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন-এ অঞ্চলের অনেকের আত্মীয়-স্বজন এখনও শান্তিপুরে বসবাস করে।

তাঁতশিল্পের উপকরণ

এর মূল উপকরণ রঙিন সুতা এবং রঙ।

www.pathagar.com

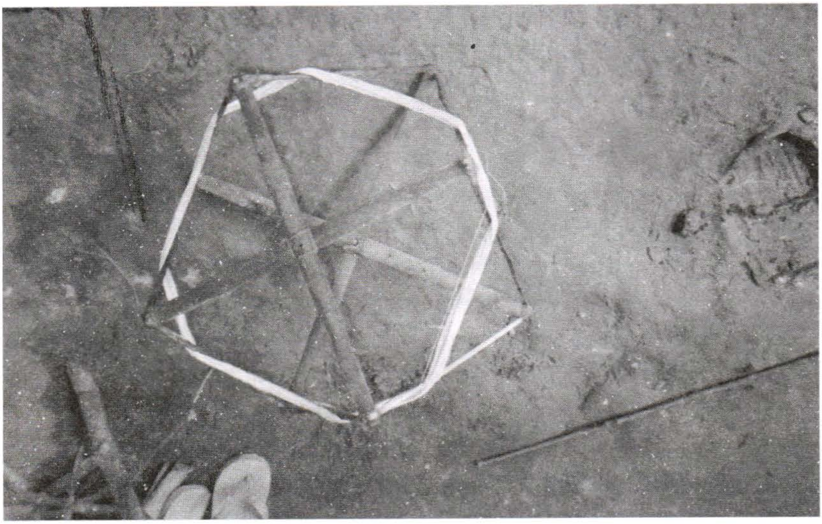

চরকায় সুতা

বুননরত তাঁতশিল্পী

www.pathagar.com

তাঁতের যন্ত্রপাতি

শাল কাঠ নির্মিত তাঁত, কোল নরাজ, বাহির নরাজ, সানা, বয়া, তালের শর ৪টা, কাঠি, পাশা ২টা, মাকু ৬টা, বেল্লাই, নাচনি ৮টা, পাখি ৪টা এবং চরকা টাটকি।

নির্মাণ কৌশল

বস্ত্র বুননের কৌশলটা বেশ জটিল এবং খুব সহজে আত্মস্থ করা যায় না। বাজার থেকে সুতা এনে এতে মাড় দিতে হয়। মাড় সাধারণত ময়দা পানিতে মিশিয়ে ফুটিয়ে প্রস্তুত করতে হয়। এরপর মাড় মাখানো সুতা টাটকি তোলা হয়। সুতা নাটানোর পর রোদে শুকাতে হয়। শুকানো সুতা পানি চরকায় তোলার পর চরকায় আনা হয়। চরকার কাজ সাধারণত নারীরা করে। চরকা থেকে সুতা ববিনে আনা হয় এবং পরবর্তীতে ববিনগুলো ঝাঁকায় সাজাতে হয়। তারপর সানা গেঁথে তানা কেড়ে করতে হয় নরাজ গুটানি। বোয়া জুড়ে তা তাঁতে তুলতে হয়।

পিরোজপুর তথা মেহেরপুরের তাঁতশিল্পের এক সময় খ্যাতি ছিল। মেহেরপুরের ধুতিকে অনেকেই শান্তিপুরের ধুতি বলে মনে করতো। মেহেরপুর শহরের তাঁতিপাড়ার তাঁতি নিতাইচন্দ্র বসাক ও কিশোরীমোহন বসাকের খ্যাতি ছিল। সাহারবাটির কাপড় ব্যবসায়ী মকলেচুর রহমান (৫২) বললেন, "আমার দাদা জহুর কারিগরের সুনাম ছিল। তাঁর তৈরি শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি হয়েছে।"

বিশ শতক থেকে তাঁতশিল্পে পরিবর্তন এসেছে। আগে সুতো কাটতো মেয়েরা, এখন মেশিনে সে কাজ করা হয়। এছাড়াও শাড়ির নকশা, পাড়ের কারুকার্যেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে।

এই পরিবর্তনের সাথে মেহেরপুর তথা পিরোজপুর, দফরপুর, আনন্দবাস, কোলা, আমঝুপি, সাহারাবাটি, মটমুড়া, কোদালকাটির তাঁতিরা তাল মেলাতে পারেনি। ফলে মেহেরপুরের তাঁতশিল্পের গৌরব হারাতে বসেছে। সেই সাথে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী হারিয়েছে পেশা। সুতার সঙ্গে রঙিন সুতা মিশিয়ে যারা তৈরি করতো বেনারসি, জামদানি কিংবা নীলাম্বরী শাড়ি তারা এখন দারিদ্র্য আর হতাশায় হাবুডুবু খাচ্ছে। সুতায় সুতা মিশিয়ে যারা নানা রঙের শাড়ি বুনতো, তারা জীবনের রঙকে বদলাতে পারেনি। তারপরও তারা স্বপ্ন দেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার।[৬]

৪. বাঁশ-বেতশিল্প

ভৌগোলিক প্রতিবেশের সাথে লোকশিল্পের একটা সম্পর্ক আছে। কলকাতার কালীঘাটের পটচিত্র, ঢাকা-ফরিদপুরের লক্ষ্মীর সরা, বাঁকুড়ার ঘোড়াপুতুল, ফরিদপুর-ময়মনসিংহ, বিষ্ণুপুর-কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প যেমন জীবন-জীবিকা ও ভৌগোলিক প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তেমনি মেহেরপুরের বাঁশ-বেতশিল্প ঐ একই কারণে গড়ে উঠেছে। বাঁশ-বেতের সহজলভ্যতার কারণে মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে বাঁশ-বেতশিল্প গড়ে ওঠে। বেতের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বেতশিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বাঁশশিল্প বহাল তবিয়তে টিকে আছে।

www.pathagar.com

ক্ষেত্র

বামনপাড়া বাঁশশিল্প

মেহেরপুর শহর লাগোয়া ছোট গ্রাম বামনপাড়া। গ্রামের গা ঘেঁষে বয়ে গেছে ভৈরব নদ। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর এ গ্রাম থেকে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণেরা দল বেঁধে চলে গেছে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে, তবুও এর নাম বামনপাড়া। গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ৩৫০০ জন, তার মধ্যে ২৫০ জন দাস সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু। বামন পাড়ায় ঢুকে কেষ্ট দাস (৭৫)-এর পেশা জানতে চাওয়া হলে সে বললো, "আমি শিল্পকাজ করি। আমার বাবা দুলাল দাসও বাঁশশিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন।" মধু দাস (৫০), পিতা : পদ দাস; সুধীর দাস, পিতা : পদ দাস প্রমুখ বাঁশশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র নয়ন দাস, উজ্জ্বল দাস, সুদেব দাসরাও পড়াশুনার পাশাপাশি শিল্পকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে সুফল দাস (৪৫), মাধব দাস (৪২), মন্টু দাস (৪২), শিল্পকাজ ছেড়ে দিয়ে জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে। তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, সূচিশিল্পের মতো বাঁশশিল্পেও মেয়েদের ভূমিকা রয়েছে। বাসন্তী দাস, স্বামী-তেঁতুল দাস; লিপি দাস, স্বামী-সাধন দাস; মায়ারানী দাস, স্বামী-ধর্মদাস প্রমুখ বাঁশশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এরা মূলত গৃহস্থালিতে ব্যবহার উপযোগী ঝুড়ি, টোকা, মাথাল, মুরগির খাঁচা, ডালি তৈরি করে। বাঁশশিল্পের মুল উপকরণ বাঁশ, দড়ি, তার। আর যন্ত্রপাতি হলো—দা, বটি, ছুরি, লোহার শিক এবং বাঁশের খেইটি।

প্রযুক্তি

বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ এনে সেই বাঁশ দিয়ে চটা তৈরি করা হয়। চটা আর জো তোলা চটা দিয়ে ঝুড়ি বুনন করা হয়। বামনপাড়ার ঝুড়ি সাধারণত কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিশেষ করে পান, ফলমূল, শাকসবজি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করণের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ব্যাধ সম্প্রদায়ের বাঁশশিল্প

মেহেরপুর শহরের গোহাট পাড়ার ব্যাধ সম্প্রদায়ও বাঁশশিল্পের সাথে যুক্ত। এরা ডালা, কুলা, সরপোশ তৈরি করে যা এ অঞ্চলে দারুণভাবে সমাদৃত। ব্যাধরা মেহেরপুরের স্থানীয় অধিবাসী নয় এবং এদের ভাষা, আচার-আচরণও আলাদা ধরনের। ১৯৭০ সালে কালু ব্যাধ (৫০), আলোরাণী (৪৫), রূপকুমারদের পূর্বপুরুষরা চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মেহেরপুরে চলে আসে। নিজস্ব জমি না থাকায় পরের জায়গা অথবা সরকারি জমিতে চালা তুলে এরা বসবাস করে। এক সময় এই ব্যাধ সম্প্রদায় মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ছাত্রাবাসে বসবাস করতো। এখন তারা মেহেরপুর পৌরসভার ৭/৮ কাঠা জমিতে ৫/৭টি পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। লালন ঘরানার সাধিকা হিসেবে পরিচিত রঞ্জিতা ব্যাধ আখড়ায় গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। সম্প্রতি সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাকে ফকিরি মতে সমাহিত করা হয়। তার দুভাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। উৎসব-আনন্দ

www.pathagar.com

ঝুড়ি বুননে বাঁশশিল্পী

বাঁশশিল্পী আলোরাণী ব্যাধ, মেহেরপুর

বাঁশ-বেতের শিল্পী পদদাস. বামনপাড়া

বাঁশশিল্পী লিপি দাস, বামনপাড়া

প্রিয় এই ব্যাধশিল্পী সম্প্রদায় আজ হতাশাগ্রস্ত। আলোরানী (৪৫) বললো, "মেলা, উৎসব, পাল-পার্বণও আগের মতো হয় না, সৌখিন ডালা-কুলা-সরপোশও বিক্রি হয় না। তাই আমাদের অনেককেই দেশ, ধর্ম, গোত্র ত্যাগ করতে হয়েছে।"

তথ্যনির্দেশ

১. বুলবন ওসমান, 'বাংলার লোকশিল্প', কালি ও কলম, চিত্রকলা সংখ্যা, বৈশাখ ১৪১৫

২. রামজয় পাল (৪০), পিতা : নবীন পাল, পেশা : মৃৎশিল্পী, গ্রাম : সাহারবাটি, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ২০.০৯.২০১১, সময় : সকাল ৯.০০টা

৩. সন্ধ্যারাণী মণ্ডল (৫০), স্বামী : জ্যাকব মণ্ডল, গ্রাম : ভবরপাড়া, উপজেলা : মুজিবনগর, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ১৬.০৯.২০১১, সময় : বিকাল ৪.০০টা

৪. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, 'আমার ধ্যানের ভারত', ভারত বিচিত্রা, মে ২০০৯

৫. কুমুদনাথ মল্লিক, 'নদীয়া কাহিনি', তৃতীয় সংস্করণ : কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৬১

৬. আজিজুর কারিগর (৫৬), পিতা : এরশাদ কারিগর, পেশা : তাঁতশিল্পী, গ্রাম : পিরোজপুর, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ২৫.০৯.২০১১, সময় : সকাল ১০.০০টা

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

মেহেরপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামই ঘনবসতিপূর্ণ। জেলা এবং উপজেলা শহরের আয়তন বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। অথচ জনবসতি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি মাত্রায়। ফলে পাশাপাশি ঠাসাঠাসি ঘরবাড়ির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় তা হয়তো বেশি নয়, তবে শহরের এইসব ঘরবাড়ি অধিকাংশই ইট-সিমেন্টের দালান। কিন্তু গ্রামের চিত্র ভিন্ন। ঘরবাড়ির গঠন প্রকৃতি মিশ্র ধরনের। কাঁচাবাড়ি বা মাটির ঘর ইদানীং চোখে পড়ে না বললেই চলে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা ইট-সিমেন্টে তৈরি শহুরে আদলের (ক্ষেত্রবিশেষে) একতলা বা দোতলা দালানবাড়িতে বাস করে। মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্তেরা ইটের দেওয়াল তুলে রড সিমেন্টের কংক্রিট ঢালাইয়ের ছাদযুক্ত বাড়িতে বাস করে, আবার অনেকে ঢেউটিনের চাল দিয়ে তৈরি আধাপাকা বাড়িতে বাস করে। উলুখড় দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হবার কারণে খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর একেবারেই দুর্লভ হয়ে পড়েছে। সেই জায়গা দখল করেছে টিনের ঘর। দরিদ্র মানুষেরা বাঁশের কঞ্চি বা চাটাই দিয়ে ঘরের বেড়া তৈরি করলেও উপরে টিনের ছাপরা চালা ব্যবহার করে। অতিশয় দরিদ্রেরা আমন ধানের বিচালি কিংবা গমের নাড়া দিয়েও উপরের চালা তৈরি করে নেয়। এ ধরনের ঘরে জানালা থাকে না, চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে তৈরি দরজা থাকে একটি।

এ জেলার গ্রামীণ জনপদের 'যৌথ পরিবার' প্রথা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে। এক পরিবার ভেঙ্গে জন্ম নিচ্ছে একাধিক পরিবার। যে ভিটের উপরে ছিল যৌথ পরিবারের ঘরবাড়ি, সেই জায়গাতেই তিন-চারটি বা তারও অধিক পরিবারের পৃথক ঘরবাড়ির জন্য স্থান সংকুলান করতে গিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে ভিটের জায়গা, ঘন হয়ে আসছে মনুষ্যবসতি। বাড়ির সামনে খোলা উঠোন বা প্রশস্ত আঙ্গিনা অতি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ ঘরবাড়ির অনিবার্য অনুষঙ্গ যে বৈঠকখানা, দহলিজ বা বাহিরঘর ছিল; যেখানে বসতো গ্রাম্য বিচার মজলিস, গানের আসর, যাত্রার মহড়া; সে সব বৈঠকখানার সংখ্যা এখন যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। শহুরে দালানবাড়ির আদলে গ্রামের গৃহস্থবাড়িতেও ড্রয়িংরুম হয়েছে। তবে এটা সাধারণ চিত্র নয়।

প্রায় সব গ্রামেই মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়িতে ৩/৪টি ঘর দেখা যায়। ঘরগুলোতে থাকে ইটের দেওয়াল, টিনের চাল। ঘরের দেওয়াল ইটের তৈরি হলেও অধিকাংশই সিমেন্ট, বালির প্লাস্টারবিহীন। সব ঘরের মেঝেও পাকা নয়। রান্নাঘর সাধারণত বাঁশের চাটাই ঘোর এবং টিনের চাল অথবা গমের নাড়া কিংবা মাটির টালি দিয়ে ছাওয়া চাল। এখন আর সব বাড়িতে গোয়ালঘর থাকে না। অনেক

www.pathagar.com

গ্রামেই এ ধরনের বাড়িতে পল্লিবিদ্যুতের আলো এসে পৌঁছেছে। তবে ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের ঘরে সে আলো পৌঁছেনি। রাস্তার পাশে সরকারি জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া একটি বা দুটি ঘর নিয়ে তাদের বাড়ি। ঘরের এক পাশে গমের নাড়া দিয়ে ছাওয়া চালা বেঁধে কেউ কেউ তৈরি করে গোয়ালঘর। চাষের জন্যে নয়, তারা একটি দুটি গরু পালন করে লাভের আশায়। সব পরিবারে পাকা পায়খানা বা স্যানিটারি ল্যাট্রিন না থাকলেও অধিকাংশ বাড়িতেই এখন কাঁচা পায়খানা বা মেটে পায়খানা আছে। মুজিবনগর উপজেলার কয়েকটি গ্রামে টালির চাল এবং গাংনী উপজেলার বেশ কিছু গ্রামে টিনের চালের ঘরবাড়ি বেশি দেখা যায়।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

লোকজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, দ্রোহ-প্রেম, লড়াই, সংগ্রাম, অধ্যাত্ম ভাবনা যে গানে প্রকাশিত হয় তাই লোকসংগীত। বাংলাদেশের রয়েছে লোকসংগীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার যার স্রষ্টা গ্রামের সাধারণ মানুষ। এ কারণে দারিদ্র্য পীড়িত, নিরক্ষরও নিম্নবর্গীয় মানুষের যাপিত জীবনের মর্মবাণী মূর্ত হয়েছে লোকসংগীতে। কখনো ধর্মীয় প্রতীক, উপমা, ভাষা ব্যবহার করে, কখনো তত্ত্বের সাহায্যে, কখনো প্রতিবাদের ভাষায় আবার কখনো বা সাধন-ভজনের কথা বলতে গিয়ে এ গান গীত হয়। এ গান গাওয়ার জন্য তালিম বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন নেই। কারণ কোনো সুর, তাল-লয়-রাগ-রাগিনী বা কেতাবি ছক মেনে এ গান গাওয়া হয় না। কেবলমাত্র ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস দিয়ে গাইতে হয়। গানের আসরে বসে অথবা আপন খেয়ালে লোকগান বাঁধা হয় বলে এতে অসংলগ্নতা উচ্ছ্বাস প্রবণতা, পুনরাবৃত্তি, অসংহতি পরিলক্ষিত হয়। ভাষাগত দুর্বলতা সত্ত্বেও ধর্ম-বর্ণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, নির্বিশেষে সকলের কাছে এ গানের একটি বিশেষ আবেদন রয়েছে যা অস্বীকার করা যায় না। মেহেরপুর জেলায় রয়েছে লোকসংগীতের এক বিশাল ভাণ্ডার যার জন্ম গ্রামীণ পটভূমিতে। মেহেরপুরের লোকসংগীতকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, লোকধর্ম বা মরমি ভাবনা প্রভাবিত সাধন সংগীত। দুই, জীবনমুখী লোকসংগীত। বাউলগান, হাড়ি সম্প্রদায়ের গান, কীর্তনগান মূলত অধ্যাত্ম ভাবনা পুষ্ট সাধন সংগীত আর ধুয়াগান, মানিক পিরের গান, কবিগানে জীবনের বাস্তব বিষয়-আশয় প্রকাশিত হয়েছে।

এ জেলার লোকসংগীতকে বিশ্লেষণ করতে হলে অবিভক্ত নদীয়া, আংশিক মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, যশোর অঞ্চলের গানের খোঁজ রাখা প্রয়োজন। এসব অঞ্চলের গান উচ্চারণ ও সুর পরিবর্তিত হয়ে মেহেরপুর আসতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। আবার মেহেরপুরের কোনো গান নদীয়া, মুর্শিদাবাদ কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে ভিন্ন উচ্চারণে ও সুরে গাওয়া হতে পারে। এ প্রসঙ্গে গাংনী ডিগ্রী কলেজের সহকারী অধ্যাপক এনামুল আযীম (৫৪) বলেন, "পাকিস্তান আমলে ঢাকা বেতার থেকে 'মহিলা মহল' ও 'দেশের মাটি' নামে দুটো অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। এসব অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক গান পরিবেশন করা হত। মেহেরপুর সীমান্ত অঞ্চলের গানও ঐ অনুষ্ঠানে থাকতো। ঐ একই গান কলকাতা আকাশবাণীতে ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে গীত হলে তা হয়ে যেত নদীয়া অঞ্চলের গান। আবার মেহেরপুরে লোকমুখে এসব গান শুনেছি ভিন্ন উচ্চারণে, ভিন্ন গায়কী ঢঙে।" তার কাছ থেকে পাওয়া দুটি গানের বাণী পাঠান্তরসহ উল্লেখ করা হলো :

একখান নৌকো, দুখান নৌকা,
নৌকো সারি সারি

www.pathagar.com

ঐ নৌকোখান যাবে আমার জামাইবাবুর বাড়ি
শাশুড়ি মাতা থেকে থেকে হাসে ফিকফিক।
(আকাশবাণী, কলকাতা)

পাঠান্তর,

একখান নাও দুখান নাও
নাও সারি সারি
ঐ নাওখান যাবে আমার দামান মিয়ার বাড়ি,
শাউড়ি মায়ে দেইখ্যা আবার হাসে ফিকফিক।
(ঢাকা রেডিও)

পাঠান্তর,

একখান নৈকু দুখুন নৈকু, নৈকু সারি সারি
ঐ নৈকুখান যাবে আমার জামাই মিয়ার বাড়ি
জামাই মিয়া পান খেয়ে ছুইড়ি মারে পিক
শাশুড়ি মাগি দেইখি আবার হাসে ফিকফিক।
(মেহেরপুর জেলায় প্রচলিত)

২

চিড়ে কুটি চিড়ে কুটি শাইল ধানের চিড়ে রে
ও দিদি কুটুম এসেছে বাড়িতে।
(আকাশবাণী, কলকাতা)

পাঠান্তর

চিড়া কুটি চিড়া কুটি শাইল ধানের চিড়া রে
ও বুবু কুটুম আইসাছে বাড়িতে।
(ঢাকা রেডিও)

পাঠান্তর,

চিড়ি কুটি চিড়ি কুটি শাইল ধানের চিড়ি রে
ও দিদি কুটুম এইছে বাড়িতে।
(মেহেরপুরের স্থানীয় ভাষায়)

রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সামাজিক পরিবর্তন, দ্রুত নগরায়ণ, পেশাগত পরিবর্তনের মাঝেও যেসব লোকগান টিকে আছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্ন প্রদান করা হলো :

১. বাউলগান

বাউল সাধনতত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। কেউ মনে করেন, 'বাউল' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, আবার কেউ বলেন, ফারসি শব্দ থেকে এসেছে। শব্দগত অর্থে 'বা' অর্থ সহিত আর উল অর্থ সন্ধানে। যার সাধারণ অর্থ পাগল, উন্মাদ, ভাবোন্মত্ত বা প্রেমোন্মত্ত। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "সংস্কৃত বাতুল অর্থাৎ

www.pathagar.com

প্রেমোন্মত্ত শব্দের প্রকৃত রূপ নিয়ে বাউল শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে।" তিনি বাউলদের তান্ত্রিক, সাংখ্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের শাখা রূপে গণ্য করেছেন। 'আবার একে কেউ কেবল সুফি সাধনার শাখা হিসেবে চিহ্নিত করেন। আবার কেউ বলেন, বজ্রযানী, সহজযানী থেকে নাথ, শিব, যোগী, বৈষ্ণব ও বিভিন্ন গুরুবাদের বেনামে হিন্দু-মুসলিম বাউল সাধনার বিকাশ ও বিস্তৃতি।'[১]

মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এ প্রথম বাউল শব্দটি ব্যবহার করেন। এতে আছে—

মুকুল তো মাথার চুল
ন্যাংটা যেন বাউল
রাক্ষসে রাক্ষসে বুলে রনে।[২]

ষোল শতকের শেষদিকে 'চৈতন্য চরিতামৃতে' বাউল শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—

আমি তো বাউল আন কহিতে আন কহি
কৃষ্ণের মাধুর্য স্রোতে আমি যাই বহি।

চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পদেও বাউল শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়ঃ

শুন মাতা ধর্ম বাউল হইন অতি
কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী।[৩]

আহমদ শরীফ এবং আব্দুল হাই-এর ভাষায়, পনের শতকের শেষ পদের শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে এবং ষোলো শতকের শেষ পদের চৈতন্য চরিতামৃতে 'ক্ষেপা' ও বাহ্যজ্ঞানহীন অর্থে বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[৪]

'বাউল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধতা থাকলেও এর সাথে ভাবোন্মত্ততা ও প্রথাবিরোধিতা গভীরভাবে যুক্ত। সে সাথে বাউল শব্দটি বায়ু সংলগ্ন যোগসাধনার ইঙ্গিত বহন করে। কারো মতে, বায়ু মানে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থ জীবন ধারণ এবং তাহা সংরোধ করিয়া দীর্ঘ জীবনলাভের সাধন করেন যাহারা তাহারাই বাউল। ...কাহারো মতে, সাধারণ সমাজ বহির্ভূত আচার-ব্যবহার সম্পন্ন ধর্ম সম্প্রদায় বাউল।[৫]

আবার কেউ মনে করেন, বাউল শব্দটি 'আউল' থেকে এসেছে, যা থেকে আউলিয়া শব্দের উদ্ভব। ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন, বাউল শব্দটি আউল শব্দজ। কেননা আমরা সাধারণত আউল বাউল বলি। আউল শব্দটি আরবি 'আউলিয়া' সম্ভবত, আউলিয়া মানে ঋষি।[৬] বাউল শব্দের অর্থ যাই হোক, এদেরকে ফকির, নেড়ার ফকির, বেশরা ফকির, মারফতি বা বেদাতি ফকির, রসিক বৈষ্ণব, রসিকপন্থি, বৈষ্ণবও বলা হয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "আমার মনে হয়, সুফি প্রভাবান্বিত মুসলমান 'নেড়া' বা বেশরা ফকিররাই বাংলার বাউল ধর্ম সাধনার আদি প্রবর্তক।"[৭] তবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ই বাউল দর্শন ও গান দ্বারা আকৃষ্ট। প্রাতিষ্ঠানিক শরিয়তি ইসলামের কাছে পরাভূত এই বেশরা বা ফকিরি মতবাদ বা দর্শন লোকজীবনকে আশ্রয় করে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। বিরুদ্ধ প্রতিবেশ সত্ত্বেও এই বেশরা, বেদবিরোধী অবৈদিক সংস্কৃতির ধারাটি বহমান রয়েছে ইসলামি ও বৈদিক ধারার সমান্তরালে। তবে এ

www.pathagar.com

দুধারার মধ্যে যেমন বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তেমনি মিলনাত্মক সম্পর্কও কম নেই। বাউল দর্শন মূলত সংশ্লেষণবাদী দর্শন। দক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদ, উত্তর ভারতের সন্ত ধর্ম, বৈষ্ণব সহজিয়া, যোগী শৈবধর্ম এবং ইসলামি সুফিবাদের সমন্বয়ে বাউল দর্শন সমৃদ্ধ হয়েছে। সুফিদের মতো বাউলরা মনে করে, সংগীতের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে খোদাপ্রেমের বাতি জ্বলে ওঠে, ধ্যানে তন্ময়তা আসে। আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগানো এবং সাধন-ভজনের জন্য তারা গান করে। তাই বাউলগান অন্যান্য লোকসংগীতের মতো গান নয়, এ গান হলো সাধকের সাধন-ভজনের সংগীত।

পণ্ডিত ও গবেষকরা নদীয়াকে বাউল সাধনার ভিত্তিভূমি হিসেবে মনে করেছেন বিভিন্ন লেখা ও গবেষণায়। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব নদীয়ার পথে পথে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মহামিলনের মন্ত্র শুনিয়েছিলেন। তাতে নদীয়ায় এক নতুন প্রেমধর্মের আবির্ভাব হয়, যার নাম বৈষ্ণব ধর্ম। এই নতুন ধর্ম নিম্নবর্গীয় মানুষকে দিয়েছিল বেঁচে থাকার অনিঃশেষ প্রেরণা। বৈষ্ণব ধর্মের ঐতিহ্য ও পরম্পরায় স্নাত হয়ে বাউল দর্শন ও সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ড. এনামুল হক বলেন, "নদীয়া জেলাই বাউল মতের উদ্ভবের স্থান। ঈশ্বরপুরী, চৈতন্যদেব, অদ্বৈতাচার্য্যের কথা' বাদ দিয়াও নদীয়ার আরও কয়েকজন প্রাচীনতম বাউলের নাম জানতে পারা যায়, তাহারা হরিগুরু, বনচারী, সেবাকমলিনী ও অখিল চাঁদ। ...এই নদীয়ার মধ্যেই গোবরা, হজরত, খুশী বিশ্বাস প্রমুখ মুসলমান এবং আউল চাঁদ, বীরচন্দ্র প্রমুখ হিন্দুর চেষ্টায় ভাববিদ্রোহী দলগুলো গঠিত হইল, বাঙ্গালায় বাউল মতকে প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত করিবার পক্ষে তাহাদের প্রভাব নিতান্তই কম নহে।"[৮]

বাউল ধর্ম ও দর্শন বিকাশে আঠারো শতকের বাংলার সংগীতাশ্রয়ী লোকধর্মগুলোরও ভূমিকা রয়েছে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সাথে বাউল ধর্মের মিল রয়েছে অনেকাংশে। এ মতের সূচনা হয় নদীয়ার নাকাশীপাড়া থানার শালিগ্রাম দোগাছিয়া গ্রামে। সংগীতাশ্রয়ী এ মতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা বলা হয়েছে। চাপড়ার বৃত্তিহুদা গ্রামকে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সাধনপীঠ মনে করা হয়। এ গ্রামে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গীতিকার কুবির গোঁসাই-এর সমাধিমন্দির রয়েছে।

বাউলগান ও দর্শনে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে কর্তাভজাদের প্রভাব বেশি। আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে এ সম্প্রদায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। আউল চাঁদ নামক একজন মুসলমান দরবেশ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। জনশ্রুতি আছে যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আউল চাঁদ ফকির ঘোষপাড়ায় আসেন এবং এই ধর্মের অন্যতম গুরু রামশরণকে দীক্ষা দেন এবং আউল চাঁদের ২২ জন শিষ্য মিলে কর্তাভজা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। রামশরণ পালের সহধর্মিনী সরস্বতী বা সতীমা এবং পুত্র দুলাল চাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়কে সংগঠিত করেন। দুলাল চাঁদ ভাবের গীত নামে এক ধরনের গান বাঁধেন।

১৮৩৩ খ্রি. দুলাল চাঁদের প্রয়াণের পর সতীমা এ সম্প্রদায়ের গুরু হিসেবে স্বীকৃতি পান। কর্তাভজাদের কোনো আখড়া কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গায় নেই। তবে বাউলদের একটি ঘরানার নাম সতীমার ঘরানা। বর্তমানে বাংলাদেশে বাউলদের মধ্যে

www.pathagar.com

পাঁচটি ঘর আছে। সেগুলো হলো—লালনের ঘর, পাঞ্জু শাহর ঘর, উজল চৌধুরীর ঘর, দেলবার সাঁই-এর ঘর এবং পাঁচু শাহের ঘর।

বাংলাদেশের বাউল সম্প্রদায় বিশেষ করে মেহেরপুরের বাউলরা বলরামী সম্প্রদায়ের দ্বারাও প্রভাবিত। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলরাম হাড়ি আনুমানিক ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

উচ্চ ধর্ম ও উচ্চ বর্ণের বিরুদ্ধে বলরাম হাড়ি প্রতিবাদী লোকধর্ম হিসেবে বলরামী সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। বাউলদের মতো এরাও শাস্ত্রের শৃংখলা কিংবা গঙ্গাজলের মহিমা মেনে নেয়নি। উনিশ শতকের শেষের দিকে গড়ে ওঠা এই লৌকিক ধর্মমতের অনুসারীরা ছিলেন হাড়ি, ডোম, বাগদি, মুচি, বেদে, নমশূদ্র, মালো এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানও। কর্তাভজা থেকে আরম্ভ করে বাংলার সকল লোকধর্মে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কিংবা বৈষ্ণবদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও বলরামী সম্প্রদায়ে উচ্চ বর্ণের লোকজন প্রবেশ করতে পারেনি। তবে এ লোকধর্মে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ভাবের সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দু ভক্তরা বলরাম হাড়িকে বলেন 'হাড়িরাম' আর মুসলমানরা বলেন, 'হাড়ি আল্লাহ'।

বলরামীদের গানে যে সমন্বয়বাদী ভাবনার মর্মবাণী প্রকাশিত হয়েছে তা মেহেরপুর অঞ্চলের বাউল ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে সব সময়। বাউলদের মতো বলরামীরাও জাতিভেদ মানে না। এরা কেউ গৃহস্থ, কেউ উদাসীন, উদাসীনেরা বিয়ে করে না অথচ ইন্দ্রিয় দোষেও লিপ্ত নয়। এদের কোনো শাস্ত্র, কেতাব নেই, বিগ্রহ পূজাও তারা করে না। তারা কেবল বলরামকে ভগবানরূপে পূজা করে। মেহেরপুরে বলরামী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেলেও মালোপাড়াস্থ বলরাম হাড়ির সমাধিমন্দিরে আশেপাশের হালদার বাড়ির কুলবধূরা সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে এবং প্রণাম করে। বছরান্তে বারুণী তিথি উপলক্ষে মালোপাড়ার বলরামের সমাধিপ্রাঙ্গণে যে মহোৎসব হয় তাতে লালন অনুরাগী বাউল, দরবেশ, বৈষ্ণব, নেড়ানেড়িরাও উপস্থিত হয়। তারাও প্রথম দিনের অন্ন মচ্ছব, দ্বিতীয় দিনের চিড়া মচ্ছব এবং তৃতীয় দিনের লুচি মচ্ছবে সেবা গ্রহণ করে।

বাউল দর্শন মূলত সমন্বয়বাদী দর্শন। এই দর্শনে হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। কর্তাভজা সাহেবধনী, বলরামী প্রভৃতি লোকধর্মের সারাৎসারের সাথে ইসলামি সুফিবাদের উদার মানবিকতা গ্রহণ করে বাউল দর্শন সমৃদ্ধ হয়েছে বলে এই দর্শনের অনুসারীরা অসাম্প্রদায়িকতা ও অখণ্ড মানবধর্মে প্রবলভাবে বিশ্বাসী। তবে বাউল তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার ফকির লালন সাঁই বাউল সাধনা ও দর্শনকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে পাঞ্জু শাহ (১৮৮১-১৯১৪) দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১৯) পাঁচু শাহ (১৮২৩-১৯২৮), ভোলাই শাহ (১৮৪৫-১৯৪০), মনিরুদ্দীন শাহ, হরিয়াঘাটার খোদাবক্স শাহ, অমূল্য গোসাঁই, শুকচাঁদ ফকির, বেহাল শাহ, মহিন শাহ (১৩১০-১৪০৩), গগন হরকরা, গোসাঁই গোপাল, আরজান শাহ (১৮৮৫-১৯৫৮), গোলাম ঝড়ুশাহ (১৯২১-১৯৯৮), খোদাবকসো শাহ (১৯২৭-১৯৮৯) প্রমুখের সুর ও বাণীর মাধ্যমে বাউল দর্শন ও সাধনা সমৃদ্ধ ও সুসংহত হয়।

www.pathagar.com

বাউলগানের আসর, আকুবপুর, গাংনী

মেহেরপুরের বাউলগান

ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় যে, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহের মতো মেহেরপুরও বাউল অধ্যুষিত অঞ্চল। মেহেরপুরের প্রায় গ্রামেই বাউল-ফকিরদের বসবাস আছে। বিভিন্ন গ্রামে গড়ে উঠেছে অসংখ্য আখড়া যেগুলো বাউলদের সাধনপীঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাউল মতের আখড়াগুলোর মধ্যে ভৈরবতীরবর্তী যাবদপুরের কালি ফকিরের আখড়া, ফতেহপুরের দৌলত শাহর আখড়া, রাজাপুরের চেরাগ শার আখড়া, ইছাখালীর আরজান শার আখড়া, টেঙ্গারমাঠের আতাহার ফকিরের আখড়া, বাবরপাড়ার হোসেন শার আখড়া, পিরোজপুরের আইনুদ্দীন শার আখড়া, শোলমারীর কায়েমুদ্দীন শার আখড়া, কাজীপুরের দবিরুদ্দীন শার আখড়া, আকুবপুরের মাতু ফকিরের আখড়া, কসবার শামসুল ফকিরের আখড়া, ভাটপাড়ার সাজদার ফকিরের আখড়া, জালশুকার লুৎফর শার আখড়া, সাহারবাটির কাজলা তীরবর্তী গোলাম ফকির মানব আশ্রম, ঝাঁঝার আজমত শার আখড়া, বলিহারপুরের খেজমত শাহর আখড়া উল্লেখযোগ্য। মেহেরপুরে বাউল ফকিরদের আধিক্যের মূল কারণ হলো পার্শ্ববর্তী নদীয়ার নবদ্বীপে নববৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আবির্ভাব এবং চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ ও মানবতার বাণী অবলম্বনে গড়ে ওঠা বৈষ্ণব পদাবলির প্রভাব। পাশাপাশি বাউল শিরোমনি লালন সাঁই-এর বাণী, দর্শন, গান এবং ছেঁউড়িয়াস্থ আখড়াবাড়ি, পাঞ্জু শাহ, পাগলা কানাই-এর সাধন পীঠের প্রভাবে এ অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় বাউল বিচরণ লক্ষ করার মতো। সারা দেশের মতো মেহেরপুরের বাউলদের

www.pathagar.com

মধ্যে পাঁচটি ঘরানা আছে। ঘরানাগুলো হলো—লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দেলবার শাহ, উজল চৌধুরী ও পাঁচু শাহর ঘরানা। পাঁচু শাহ মূলত পশ্চিমবঙ্গের ঘোষপাড়া সতীমার ঘরানার। এই ঘরানা মূলত সাধনভজন সংক্রান্ত, বাউলগানে এর প্রভাব খুব সামান্যই। মেহেরপুরের বাউলগানে লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের লালশশীর প্রভাব বেশি।

মেহেরপুরের বাউল ভাবনা ও গানে লালন শাহের গানের প্রভাব বেশি, কারণ লালন শাহের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল বৃহত্তর কুষ্টিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে। দুদ্দু শাহর একটি গানে পাওয়া যায় লালন শাহ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পার্শ্ববর্তী আলমডাঙ্গায় এসেছিলেন। এ কারণে আলমাডাঙ্গা ও গাংনীতে লালন ঘরানার বাউলদের সংখ্যা বেশি। দুদ্দু শার গানটি হলো :

আলমডাঙ্গা গ্রামে শুকুর শার আশ্রমে
আরজি করিনু আমি অতীব নির্জনে॥
দয়াল দরজি সাঁই করুণা করিয়া।
কহ কিছু আত্মকথা এ দাসে বুঝাইয়া॥

দুদ্দু শাহর গানের সূত্র ধরে বলা যায়, লালন শাহের চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ ছিল এবং জীবদ্দশায় তাঁর অনুসারী একটি শিষ্যমণ্ডলী গড়ে ওঠে। এই শিষ্যমণ্ডলীই চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা এবং তৎনিকটবর্তী গাংনী-মেহেরপুরে বাউল ভাবনা বিকাশে ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও হরিয়াঘাটার খোদা বকশ শাহের সংগীতশিষ্য অমূল্য শাহ, শুকচাঁদ ফকির, ননী গোপাল গোঁসাই-এর বাউল সাধনা ও সংগীতচর্চা ছিল চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল জুড়ে। এদের গান শুনেই মেহেরপুরে বাউল দর্শন ও গানের ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে বাউল গুরু আলমডাঙ্গার বেহাল শাহ এবং তার সংগীতশিষ্য জাঁহাপুরের খোদা বকশো শাহ, অঞ্জনগাছির করিম শাহ, যাদপুরের গোলম ঝড়ু শাহ এবং কাথুলীর গরীবুল্লাহ শাহ, কাজীপুরের দবির উদ্দীন শাহ প্রমুখ লালনের গান তথা বাউলগানকে মেহেরপুরের গ্রামে-গঞ্জে জনপ্রিয় করে তোলেন। এরাই মূলত এ অঞ্চলে বাউল দর্শন, সাধনতত্ত্ব ও গানের ব্যাখ্যাকারক ও ভাষ্যকার। তবে মেহেরপুরে বাউলগান ও দর্শনকে জনপ্রিয় করতে যে দুজন সাধক-গায়ক পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন আরজান শাহ (১৮৮৫-১৯৫৮) এবং বেহাল শাহ। আরজান শাহের জন্ম মেহেরপুর জেলার ইছাখালি গ্রামে আর বেহাল শাহের জন্ম চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার ফরিদপুরে। তিনি ছিলেন একাধারে সাধক, সুগায়ক, পদকর্তা এবং বাউলতত্ত্বের ব্যাখ্যাকারক। তাঁর গান মেহেরপুরের বিভিন্ন আখড়ায় আজও গীত হয়। বেহাল শাহের সংগীত-শিষ্য গোলাম ঝড়ু শাহ (১৯২১-১৯৯৮) এর গানের খাতা থেকে কয়েকটি গান সংগ্রহ করে তুলে ধরা হলো :

১.
আবদুল্লার ঘরেতে নবি জন্ম সে হলো।
সেই নবি দীনের পয়গম্বর আইসে শুনা গেল।
যার নূরে হয় ত্রিকুল সংসার

www.pathagar.com

সে কেন হয় হাজুত মাঝার
সেই হাজুতের নাম কি বলো।
মক্কার মসজিদ ঘরে
নবি একদিন নামাজ পড়ে।
কি কারণে কও কোন জনে সামনে এনে চিনে দিলো।
এইসব কথা শুনে মনে হুতাস
নবিরে আর হয় না বিশ্বাস।
বেহাল তোমার চরণের দাস
বুঝায়ে করো ভালো॥

২.
নবিরে অবিশ্বাস করলে কাফের হতে হয়।
বুঝিতে হবে কি কারণে হাজুতে নবিজি রয়।
আল্লার হুকুম নবির পরে
তুমি সহজভাবে রও সংসারে।
আবু জেহেল ছিল সে জন
নবি তবু মনে দুঃখ নয়।
তিন দিবস সরাব খণ্ডকে নবিজিকে বন্দি রাখে।
তথায় নবিজি সুখে থাকে
আল্লার হুকুমে নিশ্চয়।
আবু জেহেল হুকুম দিলো
তাই শুনে থুথু ঢালিল।
তবু নবিজি নামাজ সারিল
না করিল সে সব ভয়।
হাবিব চাঁদ কয় বেহাল অদ্ভুত
শুধু শাস্ত্র পড়ে পাবা না সুত।
এই মানুষ বিনা আর হবে না
হযরত নবির পরিচয়॥

৩.
হযরত নবির জন্মকথা বলি তোমারে।
আদম ওফাত হলে নবি হয়
ছয় হাজার একশ তেষট্টি সাল পরে।
আবার ছয়শত সাল ইছা মরিলে মহম্মদ এলেন সংসারে।
এক হাজার আটশো সাল দাউদ মরিলে
মহম্মদ ভবে এলো গো
আবার দুই হাজার আটশো সাল মুছা গেলে

www.pathagar.com

মহম্মদ হয় মায়ের উদরে।
হাবিয়া ছাকিয়া বিবি দুজন
তাদের দেন মোহর চারিশত দেরম।
বেহাল বলে দেখ এখন
আছে কেতাব মাঝারে।

বেহাল শাহের এ গানগুলো মূলত প্রশ্নমূলক ধুয়াগান। বাউলের বড় আসর বা সাধুসঙ্গে উতর-চাপান পদ্ধতিতে প্রহেলিকার আকারে তত্ত্বমূলক জটিল প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় প্রতিপক্ষ গায়ককে। এসব প্রশ্নের জবাবে গায়কের শাস্ত্রজ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় মেলে। বেহাল শাহ গানের আসরে প্রশ্নমূলক কিংবা তত্ত্ব-আলোচনায় সব সময় মেধা-মনীষা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বাউলগানের আসরে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

মেহেরপুরের বাউলগানকে লালনের গান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করার অবকাশ নেই। এ অঞ্চলের সাধক ও পদকর্তারা লালনের ভাব-ঐশ্বর্য, ধ্বনি-মাধুর্য, শব্দ-লালিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গান রচনা করেন। লালনের মতো এদের গানেও অসাম্প্রদায়িকতা, দেহবাদ, গুরুবাদ, মানুষতত্ত্ব, অবতারতত্ত্ব, উদার মানবিকতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের গানে যেমন নবি-রসুল প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি সহজিয়া সাধনভজনের কথাও পাওয়া যায়। এরা লালন, পাঞ্জু, দুদ্দু, পাগলা কানাই-এর মতো উঁচু দরের সাধক কিংবা পদকর্তা না হলেও এদের গানই মেহেরপুরের বাউল সম্প্রদায়ের সাধনসংগীত হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব পদকর্তা অনেকে উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও স্বসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হন নি। যেমন—আরজান শাহ (১৮৮৫-১৯৫৮), আজাদ শাহ (১৯১৫-১৯৮৭), মাতুফকির, দবির উদ্দীন শাহ, মকসেদ সাঁই উচ্চ বংশে জন্মালেও শিক্ষিত ও প্রথাগত সমাজ তাদের মর্যাদার সাথে গ্রহণ করেনি। তাদের অবজ্ঞাসূচক 'নাড়ার ফকির' হিসেবে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। যেমন লালনকেও কট্টরপন্থি মুসলমানরা 'নাড়ার ফকির' বলে অবজ্ঞা করেছে। উচ্চবর্গের আলেম, মৌলবি, শরিয়তপন্থিদের অবিশ্রান্ত শত্রুতার বিরুদ্ধে এসব নাড়ার ফকিরদের সব সময়ই লড়াই করতে হয়েছে কখনও সংঘবদ্ধভাবে, কখনও বা গানের মাধ্যমে। যেমন-লালন প্রতিবাদ করে গেয়েছেন :

কুলের বউ হলাম ভারি হলাম নাড়ি নাড়ার সাথে,
নাড়ার সাথে সাথে নাড়ি হয়ে পরনে পরেছি ডুরি।
দিব না আঁচির কড়ি বেড়াবো চৈতন্য পথে॥
ভাবের নাড়ি ভাবের নাড়া
কুলমজানো জগৎ জোড়া
করণ তাহার দৃষ্টি ছাড়া
বিধির ফাঁড়া কাটবে যাতে।

আমাদের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত সমাজ যাদের নাড়ার ফকির, ব্রাত্য, মন্ত্ররাজিত, বে-শরা বলে অবজ্ঞা ও অবহেলা করেছে, তাদেরকে আবার কেউ কেউ সুফিসাধক। বলে এদের

www.pathagar.com

কাছে টেনে এদের 'লোক' সাজার ফন্দি করছে। কিন্তু এদের কাছে আসতে হলে অবশ্যই ধর্মের ঘেরাটোপ ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে, তবেই এদের জানা যাবে। লোকধর্মের দিগন্ত প্রসারিত উদার জমিনে দাঁড়িয়েই বাউল ধর্ম ও গানকে বুঝতে হবে। মেহেরপুরের বাউলগানকে উপলব্ধি করতে হলে নদীয়া-যশোরের সাধক, ফকির দরবেশদের লোকদর্শন এবং লোকধর্মের ঐতিহ্যকে বিবেচনায় আনতে হবে। মেহেরপুরের সিংহাটির আফসার ফকিরের আখড়ায় ২৩/১০/১১ তারিখে হারুন বাউলের কণ্ঠে একটি গান শুনেছিলাম। এ গানের কথায় ধ্বনিত হয়েছে মানবপ্রেমের অমীয় বাণী, যেখানে রাজনৈতিক ভূগোলের বেড়া, ধর্মের ভেদবুদ্ধি নেই, আছে কেবল মনুষ্যত্ব, মানবিকতা আর ঔদার্য। গানটি হলো :

সর্ব চরণে পাপীর এই নিবেদন।
আউলে বিসমিল্লা বর্ত দোয়েমে পাঁচ পঞ্চতন॥
আব আতস খাক বাদ শুনি
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভূমি
কিবা দিনরজনী চন্দ্র সূর্যের রয় কিরণ
সাঁই সাহেবের মসজিদ খানা
মাধবপুরে তার ঠিকানা
রহিম শাহ করিম শাহ দুজনা
আলবেড়ের পতিত পাবন॥
ভিটেপাড়ায় মদন শাহর আসন
ডোমপুকুরে বিশ্বাস বদন
ঘোষপাড়ায় সতীমার আসন
হুদোপাড়ায় পাল চরণ
কেরামত উল্লা হুজুর মিয়া
শরিয়তে দুজন দিয়া
পাঞ্জু খোন্দকার ময়নুদ্দি শাহ
এদের দিয়ে হয় পঞ্চজন॥
যাদু বিন্দু এরাই দুজনা
পাঁচ লাখি গাঁয় তার ঠিকানা
শেওয়া তলায় আহাদ সোনা
আরও আছে কতজন॥
ষোলো দাড়িয়ায় পাঁচু শাহর আসন
গরিব গোসাঁই নারায়ণ চেতন
উদয় চাঁদ কোদাই শাহ দুজন
আনন্দ মোহিনী আর মদন॥
চড়ুই শুকুর শা রয়
বৃত্তিপাড়ার তিনকড়ি কয়

www.pathagar.com

কামার পাড়ায় ভোলাই শা রয়
ছেঁউড়িয়া দরবেশ লালন॥'

গানের ভণিতা দেখে বোঝা গেল পদকর্তার নাম নদীয়ার বৃত্তিপাড়ার তিনকড়ি। গানের ভাষা সহজ-সরল তবে তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। গানের পদকর্তা নিতান্তই একজন গ্রাম্য ভাবসাধক, কিন্তু অবচেতনই তিনি নদীয়া-যশোর-বর্ধমান-এর বিশাল অঞ্চলের নামী-অনামী অসংখ্য সাধু-দরবেশ-ফকিরদের একই সূত্রে গেঁথে ফেলেছেন। গানের কথায় জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদ নেই, দেশকাল নেই—আছে কেবল বিনয়, ভক্তি আর প্রেম-মানবিকতার জয়গান। গানের তালিকায় শরিয়তপন্থি কেরামতউল্লাহ ও হুজুর মিয়াকেও রাখা হয়েছে।

এই ঔদার্য কেবল বাউলগানেই দেখানো হয়েছে যা আমাদের সংস্কৃতিতে বিরল বিষয়। সকল ধর্মের নির্যাসকে বাউলরা গ্রহণ করতে পেরেছেন বলেই বাউলগানে সমন্বয়বাদী দর্শন ফুটে উঠেছে বারবার।

২. জারিগান

ইতিহাসের পাতা উল্টালে মেহেরপুর অঞ্চলে পাওয়া যাবে জারিগানের গৌরবময় ঐতিহ্য। মেহেরপুর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা হওয়ায় জারিগানের প্রচলন এ অঞ্চলে নবাবি আমল থেকেই ছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পর্ব মহরম উপলক্ষে সাধারণত জারিগান গীত হয়। জারিগানের বিষয়বস্তু কারবালা প্রান্তরের যুদ্ধ এবং হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যু। জারিগান মুলত দুঃখের গান, এর সুর করুণ ও মর্মস্পর্শী—এতে নেই শৌর্য-বীর্য কিংবা পৌরুষের স্পর্শ। মেহেরপুর অঞ্চলে সাধারণত গ্রামের সহজ, সরল, নিরক্ষর মানুষ এ গান গেয়ে থাকে। জারিগানের রচয়িতাদের নাম জানা যায় না। রচয়িতারা আসরে যে গান বাঁধেন তা লিপিবদ্ধ বা সংরক্ষণ করেন না। লোকসংস্কৃতির এই জনপ্রিয় শাখাটিকে সমৃদ্ধ করতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তারা হলেন—আমদহের আকালি বিশ্বাস, বাগোয়ানের গোফুর মুন্সি, ওলিদাদ মুন্সি, মসলেম বিশ্বাস, হিতিমপাড়ার দায়েম বিশ্বাস, কুতুবপুরের নিয়ামত বিশ্বাস, জুগিন্দার কোকিল বিশ্বাস, সাহেবপুরের মকসেদ আলী, আমঝুপির নিজাম মিয়া প্রমুখ। বিরূপ প্রতিবেশের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় লোকসংস্কৃতির অনেক শাখা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। কিন্তু জারিগান এ অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়নি বরং বিরূপ প্রতিবেশকে জয় করে বহাল তবিয়তে টিকে আছে। জারিগানের গায়েন ও বয়াতিরাই এ অঞ্চলের সংস্কৃতিচর্চার প্রাণপুরুষ। ভৌগোলিক প্রতিবেশ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনীতি একটি জনপদের সমাজ, সংস্কৃতি ও মনন গঠনে ভূমিকা রাখে। নদীয়া-কুষ্টিয়া-যশোর নিকটবর্তী ভৌগোলিক অবস্থান, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক উত্থান-পতন মেহেরপুর জেলার সংস্কৃতিকে আলাদা রকমের স্থানিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তবে সংস্কৃতির স্বরূপ কোনো স্থির বা অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। সংস্কৃতির রূপান্তর ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো কিছু নয়, এটা স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য বিষয়। উনিশ শতকের মেহেরপুর আর একুশ শতকের মেহেরপুর এক নয়।

www.pathagar.com

এর উৎপাদন ব্যবস্থা, পারিবারিক কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধরন অনেক কিছুই বদলে গেছে। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতির অভিঘাতে সংস্কৃতির অনেক উপকরণই হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে সেই স্বনির্ভর, স্বচ্ছল, নিস্তরঙ্গ গ্রাম। সেখানে যে বিবিধ পালা-পার্বণ, উৎসব-আনন্দ, ধর্মীয় আচার, প্রথা, সংস্কার ছিল তাও নেই। গ্রামে যে সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তা আজ কল্পনার অতীত। চণ্ডীমণ্ডপে বসতো আসর, উঠোনে রামায়ণ আর পুঁথিপাঠ চলতো। মহরম উপলক্ষে দরগাতলায় হতো জারিগান, ভাবগান আর লাঠিখেলা। উৎসবে-পার্বণে গ্রামের জমিদার ও ধনী সম্প্রদায় আয়োজন করতো যাত্রাপালা আর কবিগানের। মেহেরপুরে অনেক গ্রামেই ছিল সৌখিন যাত্রাদল। মুখার্জি-মল্লিক বসু জমিদার বাড়িতে নৃত্য-গীতের আসর বসতো, হতো যাত্রা আর পালাগানের মহড়া। গ্রামের কবিয়ালরা গান বাঁধতেন, বৈষ্ণব-বাউলরা ভোরের আলো ফোটার আগে গান গেয়ে গেয়ে গ্রাম ও পরবাসীর ঘুম ভাঙাতো। রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত পালাগান আর কীর্তন শুনতে আসতো হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই। গান শুনেই মানুষ শিখতো সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, মানবপ্রেমের মর্মকথা। এ অঞ্চলে যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, প্রেক্ষাগৃহ ছিল না, তখন যাত্রাপালা, জারি-সারি, কবিগান, কীর্তন, পাঁচালি, পালাগান, কথকতা শুনেই লোকশিক্ষা চলতো। মেলা-উৎসবের নৃত্য-গীত, পালাগান, কথকতা, পুঁথিপাঠ ছিল সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু সময়ের বিরূপ প্রতিক্রিয়া, নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশ, তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষ, বিশ্বায়ন, দেশভাগ-দেশত্যাগ, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান, ভোগবাদী সংস্কৃতির বিকাশ, রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধোগামিতা বিপন্ন বিধ্বস্ত করেছে গ্রামীণ লোকজীবন, লোকশিল্পের গৌরবময় ঐতিহ্যকে। কর্পোরেট ভাবনা আর নাগরিক সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে অপাঙক্তেয় হয়েছে লোকসংস্কৃতি, লোকদর্শন, লোকশিল্প। অথচ "বাঙালির ইতিহাস লোকধর্মের, লোকায়ত দর্শনের, লোকসাহিত্যের, লোকশিল্পের, লোকসংগীতের ও লোক বিশ্বাস-সংস্কারের ইতিকথার অন্য নাম।"

কালচক্রে বন্ধ হয়েছে মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের গাজন-উৎসব, নায়েববাড়ি থেকে রথযাত্রা বেরুলেও রথের মেলা হয় না, কুতুবপুরের ঐতিহ্যবাহী মহরমের মেলার জৌলুস হারিয়েছে অনেক আগেই, যাদবপুরের কালী শাহের বিশাল আখড়াবাড়ি বেদখল হয়ে গেছে। অনেক দরগাতেই জ্বলে না আর সন্ধ্যাবাতি। তবে সব কিছু একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, বিপন্ন-বৈরী প্রতিবেশের মধ্যেও মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে টিকে আছে অসংখ্য কবিয়াল, বয়াতি, ভাবুক, সাধক, পালাকার, গায়েন, যারা আজও আমাদের সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মেহেরপুরের আধুনিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে গৌরবময় লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্পের পাটাতনের উপর। মেহেরপুরের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাস মূলত বাঁক বদলের ইতিহাস, নানা উত্থান-পতন আর বাঁক-বদলের মধ্য দিয়ে আজকের এ পর্যায়ে উপনীত। দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, লোকসমাজ, লোকজীবনের "সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানই মেহেরপুরের সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন"।

www.pathagar.com

কারবালার ইতিহাস যেন বীররস ও করুণরসে ভরা এক মহাকাব্য। কারবালার প্রান্তরে মহানবী (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন ও তাঁর বংশধরদের করুণ মৃত্যু ও শোকাবহ ঘটনাকে অবলম্বন করে মীর মশাররফ হোসেন (১৮২৪-১৮৭৩) রচনা করেন কালজয়ী উপন্যাস 'বিষাদ সিন্ধু'। এই কালজয়ী উপন্যাস পড়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই গভীরভাবে আবেগ মথিত হয়। মীর মশাররফ ছাড়াও অনেকেই কারবালা কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করেছেন। বাংলার লোককবি বয়াতিরা রচনা করেছেন জারিগান। 'জারিগান মূলত কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়। এক ধরনের মাতম, শোকাচ্ছন্ন আবহ ও বেদনাবিধুর অনুভূতি জড়িয়ে থাকে জারিগানে। এ গীতিশিল্প ইতিহাসকে যতখানি না অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক অবলম্বন করে কল্পনা আর মানবিক উপলব্ধিকে।"[৯] জারিগান মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। মেহেরপুর জেলায় বৃটিশ আমলেই মোট জনংসখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান হওয়ায় এ জেলায় জারিগান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। জারিগানের বয়াতি ও দোহাররা অধিকাংশই মুসলমান। মহরম উপলক্ষে সাধারণত নৃত্যের সাথে জারিগান পরিবেশন করা হয়। কেবলমাত্র পুরুষ গায়েনরাই এ গানে অংশগ্রহণ করে। কারবালার করুণ কাহিনি অবলম্বনে জারিগান রচিত হলেও এ গানে নৃত্য অপরিহার্য।

জারি শব্দটি আরবি জাহিরী বা জাহরী থেকে এসেছে। তাই সাধারণভাবে বলা যায় জারি শব্দের অর্থ জাহির করা, প্রবর্তন বা প্রকাশ্যে প্রচার করা। এ থেকে অনুমান করা যায়, জারিগানের স্রষ্টা মুসলমান বয়াতি, দোহার ও পদকর্তারা। একজন মূল বয়াতি বা গায়েন মাঝখানে থাকেন আর তাকে ঘিরে থাকে দশ-বারোজন সহগায়ক বা দোহার। সকলেই ধুতি বা সাদা লুঙ্গি, পাজামা পরেন। মূল গায়েনের কাঁধে উত্তরীয় বা হাতে রুমাল থাকে। মূল গায়েন প্রথমে এককভাবে বিষণ্ন সুরে গানের প্রথম কলি গান, পরে তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে দোহাররা গান ধরে এবং দুহাতে বুক চাপড়ে তাল ধরেন। কোনো কোনো অঞ্চলের জারিগানে বাদ্যযন্ত্র থাকে না। কিন্তু মেহেরপুর অঞ্চলে জারিগানে ঢোল, জুড়ি ব্যবহার করা হয়। এ গানে মূল গায়েন পায়ে ঘুঙুর বাঁধেন। জারিগানে মেহেরপুর জেলার রয়েছে সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য। ঝিনাইদহের পাগলা কানাই-এর জারিগানের ধারায় স্নাত হয়ে এ অঞ্চলের বয়াতিরা জারিগান রচনা করেন। জারিগান ও ধুয়াগানকে সমৃদ্ধ করতে এ অঞ্চল যারা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন—আব্দুল গোফুর মুন্সি (১৮৮১-১৯৪০), ওলিদাদ মুন্সি (১৯০৪-১৯৮৬), পণ্ডিত ইছারুদ্দীন, দায়েম বিশ্বাস (১৩০৪-১৩৯৪ বঙ্গাব্দ), মসলেম মীর (১৩২২-১৩৮২), জেহের শেখ, গুলজার শেখ, মসলেম আলী শেখ, রমজান আলী প্রমুখ।

মল্লিকপাড়ার জারিগানের আসর

বৈষ্ণব সাধক ও কবি রমণীমোহন মল্লিকের উত্তর পুরুষরা আর মেহেরপুরে নেই। কিন্তু মল্লিকদের দিঘি, বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ, মন্দির আজও রয়েছে। রমণীমোহনের পূর্বপুরুষ জমিদার কৃষ্ণকান্ত মল্লিক যে পাড়ায় বসবাস করতেন সে পাড়ার নাম 'মল্লিক পাড়া' আজ অবধি। মল্লিক পুকুরের পাড়ে ৪ ডিসেম্বর ২০১১ মহরম উপলক্ষে আয়োজন করা হয় জারি ও ধুয়াগানের আসর। আসরের আয়োজক ছিলেন হিন্দু-

www.pathagar.com

মুসলমান নির্বিশেষে সকলে। দুটি দল আনা হয়। এক দলের মূল গায়েন মেহেরপুর সরকারি কলেজ সংলগ্ন নুতন শেখপাড়ার মোফাজ্জেল শেখ। আরেক দলের মূল বয়াতি গাড়াডোবের আব্দুস সালাম। মোফাজ্জেল শেখের বাবা হায়াত ছিলেন জারিগানের বয়াতি আর সালামের ওস্তাদ খোকসার খ্যাতিমান বয়াতি ও ধুয়াগানের রচয়িতা মসলেম মিয়া। আসরে উপস্থিত হয়েছেন কবিয়াল ও বয়াতি আব্দুল মান্নান। তিনি মেহেরপুর জজ কোর্টের মহুরি এবং তার পিতাও বয়াতি ছিলেন। দোহার হিসেবে আসরে আছেন মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা আকরাম শেখ, চাঁদ আলী, আদম আলী, আব্বাস আলী, ফরু এবং যন্ত্রী আবুল কাশেম, হ্যাবল শেখ। আসরে গানের খাতা নিয়ে হাজির হয়েছেন আশরাফ খান। বয়াতি ও দোহারদের পায়ে বাঁধা আছে ঘুঙুর এবং পরনে সাদা থান ও গায়ে ফতুয়া। আসরের শুরুতে আসর বন্দনা পরিবেশন করেন বয়াতি আব্দুস সালাম। আসর বন্দনার সময় দোহাররা মণ্ডলাকারে একই সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত পরিবেশন করতে থাকে। বাগোয়ানের গোফুর মুন্সী রচিত আসর বন্দনাটি নিম্নরূপ :

সেজদা সজুত করি খোদা খোদার দরগাতে।
জানাই সেজদা একিনের সাথে।
আরস কুরশী লোহ মাহফুজ সালাম সব ফেরেশতাতে॥
হুরি নুরি যত আছেন গো সালাম সবাতে।
এক লাখ চব্বিশ হাজার পির পয়গম্বর দুনিয়ায়॥
তাদের আমি সালাম জানাই।
পাক পাঞ্জাতন সালাম এখন আর সালাম পিতামাতার॥
যার জন্যেতে বান্দা হয়ে এলাম দুনিয়ায়॥
সালাম আর মা বাপ ও ওস্তাদ পির চারি জনায়।
শিক্ষা গুরুর যারা দুনিয়ায়।
সালাম আমার পাক এলেমা আর সালাম সংগীত বিদ্যার॥
যা গাহিতে আসরেতে গো এসেছি আমরায়-
হাজিরান মজলিসেতে সালাম মোর দশ জনাই॥
দিবেন দোয়া আপনারা সবাই।
দশের দোয়া পেলে পরে অধম জনা তরে যায়॥

আসর বন্দনার পর জারিগানের আসরটি উপভোগ্য ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। পালাগান, ধুয়াগান, কবিগানের প্রারম্ভে মুখবন্ধ হিসেবে গায়েনরা বন্দনা পরিবেশন করে। এ ধরনের বন্দনা জারিগানের পথিকৃৎ পাগলা কানাইও করতেন আসরের শুরুতে।

আসর বন্দনার পর আরেক বয়াতি শুরু করলেন কারবালার ইতিহাস অবলম্বনে জারি। জারির বিষয়বস্তু হোসেন পরিবারের জলকষ্ট, ফাতেমার বিলাপ, হোসেনের হাহাকার।

সকালে উঠিয়া কহেন গো জননী।
বিদায় দাও মা রণে যায় এখুনি॥
বলে কহে. হোসেন রণে চলে গেল॥
রণে যেয়ে কত কাফের মারিয়া ফেলিল॥

www.pathagar.com

মেহেরপুরের জারিগানের আসর

এসময় এক সঙ্গে দোহাররা গায় :

ডাকরে হোসেন মা বলে, ও তোর দুঃখু দেখে বুকের পাষাণ যায় গলে।

আবার বয়াতি গায় :

ঝাঁপ দিয়া কাফের বুকেতে বসিল
বুক হইতে নাম হে সিতাবী॥
এই বুকে চুমা দিয়ে নানা নবী॥
আমার বুক ফেটে গেল॥
প্রাণের নানা আমার কোথায় রহিল॥
বুক ভেসে যায় নয়নের জলে॥
খঞ্জর তুলে হোসেনকে কাটিল।

হোসেনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পরলোকবাসী মা ফাতেমা যে বিলাপ করেছেন তাও জারিগানে ফুটে উঠেছে :

কারবালার খবর বেহেশতে পৌঁছাইল।
বসে ডাকে মা মা বলে॥
কারাবালাতে মা তোর হোসেন হারাইল॥
শুনে যখন তখন মা কহিল॥
কোথায় রেখে এলি আমার হোসেন সোনারে।

www.pathagar.com

যাদুমণির জন্য আমি এখনি যাবো সকালে॥
কাঁদতে কাঁদতে মা কারবালাতে গেল॥
বেটার ধড় দেখে মাগো আছাড় খেয়ে পলো॥
তখন কেঁদে কেঁদে বলে আল্লা আমার কি করিলে॥
দুটি পুত্র আমি রেখে এলাম গোরে।
তারা এসে ঘুমের ঘোরে দাগা দেয় আমারে॥

কারবালার মর্মস্পর্শী শোকগাথা করুণরসে সিক্ত হয়ে গীত হয় জারিগানের মাধ্যমে। জারিগান মূলত নিরক্ষর, সহজ সরল মানুষের দুঃখের গান। এতে আনন্দরস কিংবা শৃঙ্গাররস নেই, নেই পৌরুষের স্পর্শ। জারিগানের বয়াতি, পদকর্তারা অধিকাংশই ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, প্রান্তিক চাষি, শ্রমজীবী, মেহনতী মানুষ এবং ধর্মে 'লৌকিক ইসলামে' বিশ্বাসী। মেহেরপুরের জারিগানে পাগলা কানাই এবং তাঁর শিষ্য-প্র-শিষ্যদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

৩. ধুয়াগান

জারিগানের পরিপূরক হলো ধুয়াগান বা ধুয়াজারি। এ দুয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ইসলামি ধর্মতত্ত্ব তথা কোরাআন-হাদিসের বিষয়বস্তু এ গানের মাধ্যমে সহজ-সরলভাবে পরিবেশন করা হয়। "ধর্মের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং মানুষকে আরও ধর্মপ্রাণ করাই হলো ধুয়োজারি গানের মূল লক্ষ্য। মুসলমান সুফি বা পির-দরবেশদের তৌহিদ বা সাম্য, ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ববোধ বা প্রসারিত হৃদয়ের মানবতার মর্মবাণীও ধুয়ো জারিগানে রূপান্তরিত হয়েছে।"

আসরের শেষ পর্যায়ে সালাম ও মোফাজ্জেল 'প্রশ্নমূলক ধুয়া' পরিবেশন করলেন। চাপান-উতর পদ্ধতিতে দুজনেই জটিল সব প্রশ্ন উথাপন করলেন। আমঝুপির গুলজার শেখের পদ দিয়ে সালাম গাইলেন :

দেখবি যদি সেই নুর তাজুল্লা
দম ভরেতে করো গা খেলা,
ওরে কোথায় আল্লা, কোথায় নবী,
কোথায় আপন শফিউল্লাহ।
দেখতে পাবি নুরের খেলা, সেখানে হয় নুরে মেলা।
সেই খানেতে কেবা গিয়েছে,
স্বচক্ষেতে কেবা দেখেছে,
যেতে পারে সেইখানেতে সাধ্য বলো কার আছে
যাবে যারা ওমনি তারা
মারা যাবে হুতাশে।
একেতে তিন তিনেতে এক
ওরে সে ভেদ বোঝা বড় দায়
ওরে তিন হরফের ফেরে পড়ে

www.pathagar.com

নুসার নাগাল পেলাম না
ইয়াদ বলে ওরে গুলজার হাসরের বেলায়॥

এরপর শরিয়ততত্ত্ব ব্যাখ্যা করে মোফাজ্জেল গাইলেন :

শরিয়ত ছাড়া নাইরে বস্তু বলে জানাই তোমারে
দেহখানা সব শরিয়ত দেখ না নজর করে
সে হরফে তাইতে খোদা গো মুখ তৈয়ার করে॥
জিমেতে হইল জিহবা, হে হরফে হাড় হইল
সে হরফে শিরের খুলি কিতাবে খবর ভালো।
তোমার দীনের নবীর নাম কী হবে,
আর শাফায়াত কে করিবে,
রোজ হাশরে কেয়ামত দিনে কী নাম ধরে ডাকিবে,
সেই নামের পরিচয়টিকে ভাই আমারে দিবে॥
শোন বয়াতি, হবে কতি
তোমার কিতাবের নামটি কী?

ধুয়াগানের গীতধারা অসংখ্য বয়াতি, পদকর্তার অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। এরা অধিকাংশই ব্রাত্যজন তথা নিরক্ষর, দরিদ্র এবং প্রান্তিকজন। এদের গানের ভাষা ও সুর সব সময় নিয়ম মেনে চলে না। তথাপি এ গান যুগ যুগ ধরে গ্রামীণ জনমানুষকে আনন্দ প্রদান করে আসছে। কালের গর্ভে লোকগানের অনেক ধারা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও মেহেরপুরে জারিগান ও ধুয়াগানের ধারাটি টিকে আছে।[১০]

৪. ঝাঁপান গান (সাপের মন্ত্র জাগানো গান)

মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে ভাদ্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ঝাঁপান গান হয়। একে সাপের মন্ত্র জাগানো গানও বলা হয়। ভাসান গান, মনসামঙ্গলের পালাগানের মতোই ঝাঁপান গান। মনসা দেবীর মাহাত্ম্য ও বেহুলা-লখিন্দরের পুনর্জীবনের লোককাহিনিকে ভিত্তি করে এ গান রচিত হয়েছে লোকপালাকারদের দ্বারা। প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুতে মিল থাকলেও গায়কি ঢঙ ও উপস্থাপনার কৌশলে ভিন্নতা রয়েছে। গানের শুরুতে সাপুড়িয়ারা সাপের ঝাঁপি খুলে দেয় এবং সাপের খেলা দেখাতে থাকে। এরপর চলতে থাকে সভাবন্দনা, মনসার বাল্যলীলা, জন্মবৃত্তান্ত, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য, একে একে সাত পুত্রের সর্পদংশনে অকাল মৃত্যু, লখিন্দরের বিবাহ, সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু এবং বেহুলার সাধনা ও প্রচেষ্টায় লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভ।

মেহেরপুর শহর থেকে ১০ কিমি. দূরে আমঝুপি ইউনিয়নের বেলতলাপাড়া গ্রামে প্রতি বছর এ গান অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে বেলতলা পাড়ার পাকুড়তলায় ভাদ্র সংক্রান্তি উপলক্ষে গান হতো। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকুড়তলায় অনুষ্ঠিত হয়। এ গানের আয়োজক ও ওস্তাদ আশকার আলী (৬০) জানালেন, "প্রায় একশ বছর ধরে এ গ্রামে ঝাঁপান গানের আসর হয়। আমার দাদা রহিম শেখ এবং চাচা বকসো শেখ ঝাঁপান গান গাইতেন। তারা দুজনে সাপুড়ে ছিলেন।"

www.pathagar.com

ঝাঁপান গানের আসর, বেলতলাপাড়া

এক সময় ঝাঁপান গানকে কেন্দ্র করে বেলতলাপাড়া গ্রাম উৎসবমুখর হয়ে উঠত এবং দূর-দূরান্ত থেকে সাপুড়েরা আসতো। সেই সাথে বেহুলা-লখিন্দরের পালা গাওয়ার জন্য দল আসতো। এবারে ভাদ্র সংক্রান্তিতে ঝাঁপান গাইলেন দারিয়াপুর খানপুরের দল এবং বেলতলাপাড়ার দল। খানপুরের দলের বয়াতি ছিলেন জিয়ারুল ইসলাম (৩০) ও দোহার-নেকছার, সাজ্জাদ, বকুল, আশাদুল, লাভলু, ফরিদ এবং বেলতলাপাড়া দলে গায়ক ছিলেন-আশকার আলী ও দোহার-আলহাজ আলী, মিনারুল, মল্লিক শেখ আমানুল হক, জেহাদুল ও গরীবুল্লাহ। এ গানের বয়াতি বা গায়ককে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, ঢোলক, করতাল ব্যবহার করা হয়। ঝাঁপান গান পরিবেশনের জন্য কোনো মঞ্চ নির্মাণ করা হয় না। দর্শক-শ্রোতাদের সাথে একাকার হয়ে বয়াতি ও দোহাররা গান পরিবেশন করে। প্রথমেই দেব-দেবতা, মা-বাবা ও তাদের মাহাত্ম্য গেয়ে করা হয় আসর বন্দনা।

মায়ের শ্রীচরণে বন্দিলাম, দয়া করো মা,
দয়া করো নিজ গুণে আসর বন্দিলাম।
আমি বন্দিলাম বন্দিলাম মাগো যন্ত্রে দিয়া ঘা,
অবদান রেখো মাগো জগৎ গরিমা।
প্রথমে বন্দিলাম মাগো গণেশের চরণ,
দ্বিতীয় বন্দিলাম মাগো লক্ষ্মী নারায়ণ,
তৃতীয়ে বন্দিলাম মাগো গোবিন্দের চরণ।

www.pathagar.com

তারপরে বন্দিলাম মাগো মহেশ্বরের চরণ,
হাজার হাজার প্রণাম করি সত্য নারায়ণ ।
তারপরে বন্দিলাম মাগো মা-বাবার চরণ,
মা-বাবা আমার করবেন দয়া আমারই আসরে ।
তারপরে বন্দিলাম মাগো ওস্তাদের চরণ,
ওস্তাদ আমার বকসো শেখ বেলতলাপাড়ায় বাড়ি,
ওস্তাদ আমায় করবেন দয়া আমারই আসরে ।
তারপরে বন্দনা করি দশ ভাই-এর চরণ,
দশ ভাই আমার করবেন দয়া আমারই আসরে ।
এ পর্যন্ত বন্দনা আমি স্থগিত রেখে যাই,
চাঁদ-মনসার পালা বলি শোনেন সর্বজনায় ।

আসর বন্দনার পর শুরু হয় পালা । মহাদেবের মানসকন্যা মনসা বা পদ্মাবতী একটি নীলাম্বরি শাড়ি পরে কৈলাস পর্বতে পিতা মহাদেবের নিকট উপস্থিত হলেন । মহাদেব তখন ভাং খেয়ে পার্বতীর সাথে রসালাপ করছিলেন । মনসার আকস্মিক উপস্থিতিতে তাদের রঙ্গ ভঙ্গ হল । মনসা অর্থাৎ পদ্মাবতী পিতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে পার্বতী আশ্রয়দানে অসম্মত হলেন । মহাদেব তখন নিরূপায় হয়ে পদ্মাবতীকে মর্ত্যে বাস করার অনুমতি দান করলেন এবং বললেন, "চম্পাই নগরের চাঁদ সওদাগর তোমার পূজা করিবে, তাহার পূজায় পৃথিবীর লোক তোমাকে চিনিতে পারিবে ।" তখন পদ্মাবতী কৈলাস পর্বত থেকে চাঁদ সওদাগরের গৃহে এসে তাঁকে বললেন :

চাঁদ বেনে সওদাগর চম্পাই নগরে,
নাম শুনে এলাম আমি চম্পক নগরে,
ভক্ত মুক্ত করবো বলে এলাম ধরাধামে
খালি হাতে ফিরায়ো না সওদাগর
বলছি যে বারে বারে॥
যে জন আমার ভক্তি করে
ধন-পুত্র দিই ঘর ভরে
অভক্তি করলে পরে
ছাড়ি না তারে॥

এরপর চাঁদ সওদাগর মনসাকে বলছে :

ধূল ফুল হেলায় মাটি
বন্দন চম্পক নগরের মাটি,
এদিকে রাম ওদিকে লক্ষ্মণ
আকাশে চন্দ্র পাতালে বালি,
আমাকে রক্ষা করো জয় মা কালী॥
তুমি কে গো সুন্দরী নারী,
কোথায় থেকে এলে তুমি
আমি জিজ্ঞাসা করি ।

www.pathagar.com

কোথায় তোমার বসত বাড়ি
কোথায় তোমার ঘর,
কি নাম তোমার মাতা-পিতার
তাই বলো আমার॥

মনসা আবার গানে গানে বলছে :

কৈলাসেতে বসত আমার, কৈলাসেতে ঘর
পিতা আমার শিব ঠাকুর গো,
দিলাম পরিচয় ।

পরিচয় দেওয়ার পর চাঁদ সওদাগরের নিকট পূজা আদায় করার জন্য কথা বলতেই সওদাগর রেগে গেলেন । চড়া সুরে মনসাকে চাঁদ সওদাগর বললেন :

হ্যাঁকা-ব্যাঁকা মনসা কানি,
তোরে আমি ভালোই চিনি
পূঁজিতে ঠেকিছে কোন দায় হে ।

আর বলছেন,

মনসা কানি, শয়তানি তুই এখনই চলে যা ।
নয়লে পরে পড়বে শিরে এই হেতালের ঘা ।

মনসা তখন রেগে অগ্নিমূর্তি হয়ে দুহাত আকাশের দিকে তুলে বলছে :

কোথায় আছিস ধর্ম রে, তুই সাক্ষী হয়ে থাক
শোধ নেব এ অপমানের, ভাঙ্গবো চাঁদের জাঁক ।

এভাবেই কাহিনি এগিয়ে যেতে থাকে । মনসার অভিশাপে চাঁদ সওদাগরের ছয় পুত্রের মৃত্যু হয় নৌকাডুবিতে । মহাদেবের বরে চাঁদ সওদাগরের আবার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, অন্নপ্রাশনে যার নাম রাখা হয় লখিন্দর । এই লখিন্দরের সাথে সতী বেহুলার বিয়ে হয় এবং বাসর রাতে লখিন্দরকে সর্পে দংশন করে । কালনাগিনীর দংশনে লখিন্দর প্রাণ ত্যাগ করে । সর্পদুষ্ট দেহ দাহ না করে ভেলায় তুলে ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হলো । বেহুলা ভেলার উপর মৃত স্বামীর পা দুটি বুকে নিয়ে অকূলে ভেসে চলল । অবশেষে ভেলা গহরপুর ঘাটে ভিড়ল । এই ঘাটে বেহুলা মনসাকে প্রসন্ন করতে সমর্থ হলো । প্রসন্ন মনসা তখন বেহুলাকে বললো :

করলো পূজা বেহুলা রাঁড়ি
আমার পূজা করো,
বেঁচে মরা পরি,
এমনই আমার বর ।

বেহুলা নদীতীরে মনসার পূজা করলো এবং মনসার বরে লখিন্দর পুনর্জীবন লাভ করল । চাঁদ সওদাগরের সোনার সংসার ধনে-পুত্রে ভরে উঠলো । এই পালাকে ঝাঁপান গান বলা হয় । পালার মধ্যেই মাঝে মাঝে ঝাঁপের ঝাঁপান গাওয়া হয় বলে এই গানকে ঝাঁপান গান বলা হয় । ঝাঁপান গানের সাথে যুক্ত বয়াতি ও দোহাররা অধিকাংশই প্রান্তিক কৃষক, দিনমজুর । এদের কারো তেমন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই । ধর্ম ও সম্প্রদায়গতভাবে এরা মুসলমান হলেও বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবতা ও তন্ত্র-মন্ত্রে

www.pathagar.com

এদের বিশ্বাস আছে। ঝাঁপান গানের আসরে আর আগের মতো ভিড় হয় না। তবে গ্রামের সবাই এ আয়োজনের বিরোধিতা করে না। বাড়ি বাড়ি চাল আদায় করা হয় এবং খিচুড়ি রান্না করে সবার মধ্যে বিতরণ করা হয়।[১১]

৫. আলকাপ গান

মেহেরপুর জেলার অনেক গ্রামে আজও আলকাপ গানের প্রচলন রয়েছে। মুর্শিদাবাদের আলকাপ গানের ধারায় স্নাত হয়ে মেহেরপুরে আলকাপের উদ্ভব ও বিকাশ। শ্যামপুর, সাহারবাটি, কুলবাড়িতে এ গানের গায়ক ও শিল্পী রয়েছে। এসব গায়ক ও শিল্পী অধিকাংশই নিরক্ষর দরিদ্র। যাত্রাপালার মতো অভিনয় করে আলকাপ পরিবেশন করা হয়। দর্শকদের একঘেয়েমি দূর করার জন্য পালার মাঝে মাঝে রঙ্গ-রসিকতা ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। পুরুষ গায়েনরা ধুতি-গেঞ্জি এবং নারী চরিত্রে যারা অভিয় করে তারা শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করে। আলকাপ গানে সাধারণত পুরুষরাই 'ছুকরি' বা নারী চরিত্রে অভিনয় করে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, ঢোল, ডুগি-তবলা, জুড়ি, খঞ্জনি ব্যবহৃত হয়। আসরের প্রথমে বন্দনা করা হয়। গায়করা মুসলমান হলেও দেব-দেবতার নামে বন্দনা করে তারা আসরে নামেন। আসর বন্দনা নিম্নরূপ :

বন্দি প্রভু নারায়ণ নিখিলের পতি
যাহার চরণ সেবে দেবী সরস্বতী।

এরপর কথা, গান আর সংলাপের ঝলকানিতে জমে ওঠে পালাগান। পালার বিষয়ও খুব সহজ, যেমন স্বামী-স্ত্রীর পালা, সৎমার পালা, শাশুড়ি-বধূর পালা, রাধা-কৃষ্ণের পালা। আলকাপের পালায় সবাই গান করে। রাজা, রাজকুমার, রানি, জল্লাদ পর্যন্ত সকল চরিত্রের গলায় থাকে গান।

পোশাক-আশাকের তেমন কোনো ছক বাঁধা নিয়ম থাকে না। কোঁচানো ধুতি, ডান হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা, পায়ে স্যান্ডেল আর হাফ হাতা জামা পরে রাজা সেজে আসরে নামা যায়। শাড়ি পরিধান করেই রানির পার্ট করা যায়। মেহেরপুর জেলার শ্যামপুর গ্রামে আলকাপ গানের একটি দল আজও রয়েছে। দলের ওস্তাদ পঞ্জত আলী (৭০) একজন প্রান্তিক চাষি। দলের দোহার মেহের আলী, হারু কামার, নঈমদ্দিন, আজিমদ্দীন, আজাত আলী, ঢুলী আনিস আলী খাঁসহ অন্যান্য শিল্পীরা চাষি-জেলে-দিনমজুর ও কামার। এদের নিকট থেকে সংগৃহীত আলকাপের কয়েকটি গান তুলে ধরা হলো :

১.

একবার মধুর সুরে বাজো মোহন বাঁশি রে
বাঁশি আমার রঙের ভীষণ, তারে আমি
বড্ডো ভালোবাসি রে।
ও বাঁশি পরান হইতে কত ভালোবাসি রে,
একবার মধুর সুরে বাজো মোহন বাঁশি রে।

www.pathagar.com

২.
কুল তেজিয়া অকুল সাগরে ভাসি
তুমি বিনে রাই মোর কেহ নাই,
আছে যে মনে বাঁশি ।
শোন বলি, চিকন কালা,
তোমার প্রেমের এত জ্বালা,
ব্রজবালা রইতে না দেও ঘরে,
না ধরিয়ে বাঁজায় বাঁশি ।

মেহেরপুরের আলকাপ গানের কথা শুদ্ধ এবং এর গ্রাম্য রূপ প্রায় হারিয়ে গেছে। আলকাপের গায়েনরা যদিও নিরক্ষর ও অমার্জিত, তবুও তারা শুদ্ধ ভাষায় সংলাপ বলে পালায়। দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য এরা সবই করে। কখনও দ্বৈতভাবে আবার কখনও এককভাবে নৃত্য পরিবেশন করে। সেই সাথে চলে রঙ্গ-রসের গান।

চ্যাঙড়া বন্ধুয়া রে, জোর করে দেয়
পিরিতের বায়না
আমি পিরিত জানি না,
চ্যাঙড়া বন্ধু ছাড়ে না,
জোর করে দেয় পিরিতের বায়না ।

রসাত্মক গানের আসর জমে ওঠে। উৎফুল্ল হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দ। মাঝে মাঝে ছড়াকারে ব্যাঙ্গাত্মক গান গাওয়া হয়। যেমন-

ও প্রিয়ে যেতে করেছ মানা
কলকাতায় দেখে আইলাম চিড়িয়াখানা ।
সকাল বেলায় তাড়াতাড়ি চড়লাম রিস্তেমারি,
ফিরতে হাতে টিকেট কেটে
চাপলাম রেলগাড়ি
রাস্তার খবর যায় না ভুলা,
চলে গেলাম ধর্মতলা
সেখানে কয়লা হারের পানি ।
কত মানুষের আমদানি ।

আলকাপ গানের ওস্তাদ পঞ্জত আলী (৭০) জানান, মালদহ, মুর্শিদাবাদের মতো মেহেরপুর জেলাতেও কয়েকটি আলকাপ গানের দল ছিল। অধিকাংশ দলগুলোই এখন বিলুপ্তির পথে। অথচ এরাই এক সময় গ্রামের মানুষের চিত্তবিনোদনের খোরাক যোগাত।[১২]

৬. হাড়ি সম্প্রদায়ের গান

বাউল, বৈষ্ণব, সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মতো হাড়ি সম্প্রদায়ও সংগীতাশ্রয়ী লৌকিক ধর্ম। গানের মাধ্যমে তারা জগৎ-জীবনের ভাবসত্যকে তুলে ধরে। হাড়ি সম্প্রদায়ের গান বাংলা লোকগানের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলেও মেহেরপুরের লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনে এর একটি ক্ষীণ ধারা বহমান রয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই লোকধর্মের

www.pathagar.com

প্রবর্তক বলরাম হাড়ির জন্ম মেহেরপুরের মালোপাড়ায়। আনুমানিক ১৭৮০ সালে জন্মগ্রহণ করে ৬৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মেহেরপুর নিবাসী লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন : "বাঙ্গালা ১১৯০ বা ১১৯৯ সালে বলরামের জন্ম হয়।" অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৮৭০) উল্লেখ করেন, বলরামের "১২৫৭ সালের ৩০ অগ্রহায়ণ অনুমান ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যু হয়।" সুতরাং বলা যায়, আঠারো শতকের শেষ দিক এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এ ধর্মের উদ্ভব হয়। এক পর্যায়ে বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত এই লোকধর্ম নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এ সম্প্রদায়ের অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়ায় বিশ হাজার। এ সম্প্রদায়ই বাংলার একমাত্র লোকধর্ম যারা সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য তথা নিম্নবর্গ ছাড়া উচ্চবর্ণকে তাদের লোকধর্মের বলয়ে প্রবেশ করতে দেয়নি। এদের অনুসারীরা হাড়ি, ডোম, মুচি, বাগদি, নমশূদ্র এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এই নিম্নবর্গীয় মানুষগুলো বৈদিক মন্ত্র কিংবা গঙ্গাজলের মহিমায় বিশ্বাস করে না। তাদের উপাস্যের নাম বলরাম হাড়ি। বলরামকে অনুসারীরা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে জানে ও মানে। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে (৩০ অগ্রহায়ণ ১২৫৭ বঙ্গাব্দ) বলরামের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর মেহেরপুরের মালোপাড়ায় সমাহিত করা হয়। এই মহান সাধকের স্মৃতি রক্ষার্থে জমিদার জীবন মুখোপাধ্যায় সমাধি সংলগ্ন পঁয়ত্রিশ শতক জমি দান করেন। এই জমির উপর নির্মাণ করা হয় বলরাম হাড়ির সমাধিমন্দির এবং আখড়া। প্রতি বছর বারুণী তিথিতে মন্দির প্রাঙ্গণে হাড়ি সম্প্রদায়ের 'মচ্ছব' হয় এবং মেলা বসে। ১৯৮৫ সালে বলরাম হাড়ির সর্বশেষ সেবাইত বৃন্দাবন হালদার-এর মৃত্যুর পর এ অঞ্চলে এই লোকধর্মের অনুসারীদের তেমন দেখা যায় না। কুষ্টিয়া সংলগ্ন বারোখাদার বলরামীরা আজও টিকে আছে। মেহেরপুরের আখড়ার আশেপাশের মৎস্যজীবীরাও নিজেদের হাড়িরামের অনুসারী বলে দাবি করে। এই পাড়ায় কুলবধূরা সন্ধ্যাবেলায় সমাধিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে এবং ধূপধুনো দেয়। মেহেরপুর থেকে অনতিদূরে নদীয়ার তেহট্ট থানার নিশ্চিন্তপুরে হাড়ি সম্প্রদায়ের একটি সাধনপীঠ রয়েছে। বলরামীরা একসময় বিনা ছাড়পত্রে নিশ্চিন্তপুরে যাতায়াত করতো। হাড়ি সম্প্রদায়ের একটি গানে আছে :

তোমার মেহেরপুর ধাম
করলে পাকিস্তান।
নিশ্চিন্তপুরে এসে করলে নিত্যধাম॥

তবে, অন্য একটি গানে বলা হয়েছে :

দিব্যযুগে যে হাড়িরাম
মেহেরপুর তার নিত্যধাম।
বৈষ্ণবদের নিত্যধাম নবদ্বীপ,
কর্তাভজাদের ঘোষপাড়া,
সাহেবধনীদের বৃত্তিহুদা,
তেমনি হাড়িরামের নিত্যধাম মেহেরপুর।

www.pathagar.com

কারণ বলরামীরা মনে করে, হাড়িরাম দিব্যযুগে মানুষরূপে মেহেরপুরে জন্ম নিয়ে মানবলীলা সাঙ্গ করেন। তাই তারা গানে বলেছেন :

এক অসম্ভব কথা শুনে
লাগলো জীবে দিশে।
যার দেখি না আকার-প্রকার সর্বশাস্ত্রে বলে
সেই বস্তু মানুষরূপে মেহেরপুরে আসে।

বলরামীরা সাধক হাড়িরামকে দেবতার অবতার বলে মনে করেন না। তারা তাকে দুর্বোধ্য দিব্যবস্তু বলে গণ্য করেন। আর এই দিব্যবস্তু মানুষরূপে মেহেরপুরে এসেছিলেন। সাধক হাড়িরাম মেহেরপুরে জন্মগ্রহণ করলেও সাধকজীবনের অনেক সময় কাটান নিশ্চিন্তপুর গ্রামে। এ গ্রামে তাঁকে কেন্দ্র করে ভক্তমণ্ডলী গড়ে ওঠে। তেহট্ট থানার অনেকগুলো গ্রামে হাড়ি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আজও আছে বলে জানালেন মেহেরপুর বলরামী আখড়া কমিটির সম্পাদক অনন্ত দাস। তেহট্ট থানার পলাশীপাড়া, নিশ্চিন্তপুর, সাহেবনগর, গোপীনাথপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষ হাড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত। এছাড়া হাড়িরামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে সব পদকর্তা পদাবলি রচনা করেছেন তাঁরাও ছিলেন সমাজের নিম্নবর্ণের শূদ্র কিংবা অন্ত্যজ জাতি ও উপজাতিভুক্ত। পদকর্তা দীনু মুচি, অনু মণ্ডল, বৃন্দাবন হালদার, বলাই গেঁড়ো, রাজু ফকির—এরা সবাই নিম্নশ্রেণিভুক্ত। কুষ্টিয়া বারোখাদা এবং মেহেরপুর মালোপাড়ায় বসবাসকারী বলরামীরাও নিম্নশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। হাড়ি, মুচি, বাগদি, বেদে, নমশূদ্র, নিম্নশ্রেণির মুসলমানরাই মূলত হাড়ি সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিক ও গীতিকার। উনিশ শতকের এসব গ্রাম্য অশিক্ষিত পদকর্তা বা গীতিকারদের গানই হাড়ি সম্প্রদায়ের গান। এই গানের সার্বজনীন আবেদন নেই বললেই চলে। তাছাড়া বলরামীদের মেলা বা উৎসব ছাড়া অন্য কোনো মেলা বা উৎসবে এসব গান তেমন গাওয়া হয় না এবং এদের গায়কেরা অংশও নেন না। এ কারণে হাড়ি সম্প্রদায়ের গানকে বাংলার লৌকিক গানের ধারায় যুক্ত করতে চান না অনেকে। প্রতিভাবান গায়ক ও পদকর্তাও এ গানের ক্ষেত্রে নেই, যেমনটি লোকগানের অন্যান্য ধারায় রয়েছে। বাউলগানে লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, কবিগানে ভোলা ময়রা, দেহতত্ত্বের গানে হাউড়ে গোসাঁই, সাহেবধনীদের গানে কুবির গোসাঁই-এর যেমনটি স্বীকৃতি আছে, তেমনি স্বীকৃতি পাওয়ার মতো গীতিকার কিংবা গায়ক হাড়ি সম্প্রদায়ের গানের ক্ষেত্রে নয়। তনু মণ্ডল, দীনু মুচি, রামচন্দ্র, রাজু ফকির কিংবা হাল আমলের অনন্ত, অশোক, বলাইরা তেমন উঁচু মাপের গায়ক নন। এছাড়া তাদের গানে ভাব ও ভাবুকতার গভীরতা না থাকায় এবং বিনোদনমূল্য কম হওয়ায় গ্রামে-গঞ্জে, মেলা-মহোৎসবে ছড়িয়ে পড়েনি। তবুও চৈত্র মাসের একাদশী তিথিতে বলরাম হাড়ির সমাধিপ্রাঙ্গণে যে মহোৎসব হয় তাতে ব্রহ্মময়ী দীনু, সদানন্দ, তনু, প্লাহাদ, গোষ্ঠদাস, বাবু প্রমুখ পদকর্তাদের গান গাওয়া হয়। এসব গানই হাড়ি সম্প্রদায়ের গান। গানগুলো অনেকটা বাউল ঢঙে গীত হয় এবং বাদ্যযন্ত্র হিসেবে একতারা, দোতারা, ডুগি-তবলা, খোল, হারমোনিয়াম ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য

www.pathagar.com

ভাবগানের মতো এ গানগুলো সুরের চেয়ে বাণী ও ভাবপ্রধান। হাড়ি সম্প্রদায়ের কয়েকটি গান সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করা হলো :

১.

হাড়িরাম তত্ত্ব নিগূঢ় অর্থ বেদ বেদান্ত ছাড়া।
করে সব ধর্ম পরিত্যাজ্য সেই পেয়েছে ধরা॥
সেই তত্ত্ব জেনে শিব শ্মশানবাসী
সেই তত্ত্ব জেনে শচীর গোরা নিমাই সন্ন্যাসী।
সেই ত্যাজে মাতা-পিতা সোনার বিষ্ণুপ্রিয়া,
তার দুনয়নে বয় ধারা॥
চতুর্বেদ আর চৌদ্দ শাস্ত্র কয়
দেখ তার উপরে মানুষ লীলা করেছেন গোঁসাই॥
তিনি আবির্ভাবে সর্বজীবে বলো হাওয়া,
আছে ব্রহ্মাণ্ড জোড়া॥
হাড়িরাম যে তত্ত্ব ধরে,
এবার হিসাব দিতে যেতে হবে মেহেরপুরে,
বলরামদীন যারে কৃপা করে,
ভবে জন্মে পাবে ওই ধারা॥
সদানন্দ বলে রে হরি,
যে হাড়ির ঝি হৈমবতী সেও তো এই হাড়ি,
তিনি হাড় হাড্ডির থাম খুঁটি দিয়ে
চাম দিয়ে আছে ঘেরা॥

২.

মানুষ রূপেতে আল্লা করছে খেলা
বারিতালা মেহেরপুরে।
আখেরেতে জীবের তরে
বারাম দিলে তনু দেখলে নজর করে॥
স্বাভাবিক মানুষ বেশে সৃষ্টির আগে
এক দেহ সে পত্তন করে।
কুদরতি আদম ছবি, হযরত নবি বরকত বিবি হাঁইয়ে কারে।
মা সদাই বসে থাকে
হর্ষচিতে গঙ্গাধর তুই দেখ সে আয় রে॥
এখন আর কী করিব, কোথায় যাব
যার জীবন সে এসেছে রে॥
যার হাঁইয়ে হৈমবতী, আদ্যাশক্তি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে,
সে মহারাগের ফকির মারলে জিগির

www.pathagar.com

কোটি সমুদ্র গভীর পারে॥
বাবু কয় সাঁইয়ে কদম জপ মুদোম
হরদম কেউ ভুল নারে॥
৩.
আগে বলে হাড়িরামের নাম
বলো ভাই পরে অন্য কথা॥
হাড়িরামদীন সৃষ্টিকর্তা, পালকপিতা
শুনতে পেলাম তারই কথা
কথা সত্য বটে নয় কো মিথ্যা॥
হাড়িরামদীন সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে শক্তির পরে
ব্রক্ষা বিষ্ণু মহেশ্বরে, আছে এই তিন তারে জগৎ গাঁথা
সদা বলে শুন রে হরি, রামদীন আছেন পার কাণ্ডারি
বল বিনে চলে না তরী, রামের এই চরণে রেখো মাথা॥
যথা পূর্বে তথা পরে, উদয় হলেন মেহেরপুরে
হাড়িরামের নামটি ধরে সেধেছিল মাতা॥
৪.
হাড়িরামে নাম পেয়েছ ভুলো না।
পেয়েছ মানব জনম, দুর্লভ জনম এমন জনম আর হবে না।
যে নামে শিব শ্মশানবাসী
সেই নামে নিমাই সন্ন্যাসী
সর্বদা মনে আসি, করে রাম নাম জপনা।
কত মুনি-ঋষি যোগ তাপসী ধ্যানে জানতে পারলো না।
হাড়িরাম অগতির গতি, তিনি সৃষ্টি প্রলয় করেন স্থিতি
যা করেন হয় আকৃতি, সাকৃতি যন্ত্রণা।
ওই নাম প্রহলাদ জপে দণ্ডে দণ্ডে অগ্নিকুণ্ডে মলো না॥
হাড়িরামের অভয়চরণ,
সে চরণ করলে স্মরণ, হয় না মরণ
ঐ পদে রেখে নয়ন, করো আরাধনা।
নীলু বলে রাম নিলে যম যন্ত্রণা থাকবে না।
৫.
ছাড় রে মন অসৎ সঙ্গ, খুঁটিনাটি।
ভুলো নারে মনে হাড়িরামের চরণ দুটি।
বন্দী হয়ে ফন্দির ফাঁসে, মায়ার বেড়ি কিসে কাটে,
দয়াল হাড়িরামের চরণ বিনে
ত্রিভুবন সব ধূপের কাঠি॥
হাড়িরামের চরণ ধূলি,
যাবৎজীবন হাতের লাঠি,

www.pathagar.com

ও লাঠি হাতে করে অন্ধকারে
সলকেতে পথ দেখবি॥
ব্রহ্ম বলেছে ওরে দীনু
আসবে রে যেদিন তোর ডাকের চিঠি
সেদিন আসবে শমন বাঁধবে কষে
সেদিন হবে তোর কাঁদাকাটি।

৬.

পারের কর্তা, তারণ কর্তা আছেন রামদীন নারায়ণ।
রাম নামেতে মারো ডঙ্কা, শঙ্কা কিরে অবোধ মন॥
রামদীন যখন পঞ্চবটি সঙ্গেতে বাষট্টি কোটি,
হাড়িরামের চরণধূলি গায়ে মাখিল ঐ অতুল চরণ॥
হাড়িরাম পারের কাণ্ডারি, তরঙ্গে ভাসাও তরী,
হাড়িরাম গুণ গাও রে সারি সদাই সর্বক্ষণ॥
একটা নদীর ত্রিমোহনা সুর, ধ্বনি আর যমুনা,
তা দেখে মন ভয় পেও না ওরে আমার অবুঝ মন॥
খবরদার ছেড়ো না বটে কত তুফান যাবে কেটে,
হাড়িরামের চরণতরী ধরো এঁটে
দীনু তাই ভেবে বলে রে মন।

৭.

দয়াল হাড়িরাম,
তোমার অপার লীলা বুঝব কবে।
যেদিন আসবে শমন বাঁধবে কষে,
সেদিন আমার কী হবে॥
অপার লীলা বোঝার আগে,
কত ধনী চলছে ধেয়ে,
আমি রইলাম অন্ধকারে
মনের ঘোর যাবে কবে॥
আমি বন্দিলাম রইলাম মায়ার ফাঁদে
মায়ার ফাঁদ কাটবে কিসে,
ঘোর সংকটে বাঁচতে চেয়ে
তোমার দোহাই দেয় সবে॥
অধম ভক্ত দাসে ডাকে
নিষ্ঠা যেন থাকে তোমার দয়াল নামে
দয়াল হাড়িরাম নাম হিয়ায় রইলে
ভয় কিরে তার এই ভবে॥[১৩]

www.pathagar.com

৭. মর্সিয়াগান

কারবালার শোকাবহ ঘটনা বাঙালি মুসলিম মানসকে স্পর্শ করেছে গভীরভাবে। কারবালার কাহিনি অবলম্বনে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) রচনা করেন কালজয়ী উপাখ্যান 'বিষাদ সিন্ধু'। বাঙালিচিত্ত শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আপ্লুত হয়েছে 'বিষাদ সিন্ধু'র করুণরসে। বাংলা ভাষায় কারবালা এবং মহরমকেন্দ্রিক বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। লোককবি, কবিয়াল, জারিগানের পদকর্তা, বয়াতিরা কারবালার ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেন অজস্র শোকগাঁথা। এই শোকগাঁথার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মর্সিয়াগান। জারিগানের মতো মর্সিয়াগানও কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এ গানেও শোকের মাতম ও বেদনার্ত অনুভূতি জড়িয়ে থাকে। 'বিষাদ সিন্ধু'র স্রষ্টা মীর মশাররফ হোসেন যেমন ইতিহাসের চেয়ে মানবিক আবেগকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, মর্সিয়াগানেও কল্পনা ও মানবিক আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। কারবালা প্রান্তরের মানবিক বিপর্যয় নিয়ে জারিগানের প্রধান প্রবর্তক পাগলা কানাই (১৮২৪-১৮৮৯) অসংখ্য পদ রচনা করেছেন। কারবালার প্রান্তরে ফাতেমাপুত্র হোসেন-এর মৃত্যুতে গভীর আর্তি ও বেদনা প্রকাশিত হয়েছে এসব পদে :

হোসেন কয় মা জননী বলি তোমারে
ও পানি দিলো না মোরে
ও পানির জ্বালায় জান ছাড়ে যায়
এই মা দেখলে না নজর করে
আজ আমি শহীদ হলাম কারবালার প্রান্তরে।

আবেগমথিত কণ্ঠে অন্তিমকালে হোসেন তার প্রিয় ঘোড়াকে বলছে :

ও আমার আগে কইও সমাচার
তোমার বেটা হোসেন আলী
সে যে ফিরে না আসিবে আর।

পুত্রশোকে কাতর পরলোকবাসী ফাতেমা যখন বিলাপ করেন তখন চারিদিক আরও ভারী হয়ে ওঠে। সেই বেদনাবিধুর অবস্থা পাগলা কানাই গানে গানে জারি করেন :

ও নিশি প্রভাতকালে কাঁদে ফাতেমা
আরও কোলশূন্য মদিনাখানি সোনার বালাখানা।
তাই পাগল কানাই কয়
ও সাতে রোজের অনাহারী কেউ না কয় 'মা'
হায়রে ইমাম মরতো কোলে, গোর দিতাম সামনে
ও দেখতাম বেয়ান বৈকালে॥
ওরে সমুদ্দুরে বিষম তুফান ওঠে মায়ের মনে
ওরে বেটার শোক রয়ে রয়ে পড়ে মায়ের মনে
হায়রে দুঃখীর ধন বাছা নীলরতন।
এই ধুলায় লুটাইয়া কাঁদে মায়ের সোনার পন্দবদন
হায় বেটা বেটা বলে মায়ে করছে রোদন।

www.pathagar.com

কারবালার মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা অবলম্বনে রচিত পাগলা কানাই-এর পদসমূহ আজও গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ফিরে, আর জারিআসরে তো বলাই বাহুল্য। মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন বাগোয়ান গ্রামে পাগলা কানাই-এর জারির মতো এক ধরনের গান মহরম উপলক্ষে গীত হয়। এ গানকে মর্সিয়াগান বলা হয়। এ গানের প্রতিটি শব্দ ফারসি। মহরম-এর চাঁদ দেখা দিলে পাড়ায় পাড়ায় গানের আয়োজন করা হয়। গানের প্রথম আসর হয় বাগোয়ান দরগাপাড়ার মোড়ে এবং ১০ মহরমের দিন মর্সিয়াগানের আসরের পরিসমাপ্তি ঘটে। কারবালার ট্র্যাজেডি ও মানবিক বিপর্যয় অবলম্বনে এ গান রচিত হয়েছে বলে গানে কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। দোহারা বসে এবং মূল বয়াতি দাঁড়িয়ে গান পরিবেশন করেন। এ গানের রচয়িতা বয়াতি, দোহার প্রায় সবাই নিরক্ষর এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে নিম্নবর্গীয়। কিভাবে, কোথা থেকে এ গান বাগোয়ানে এসেছে তার তথ্য কেউই হাজির করতে পারেননি। এ গানের বয়াতিদের মধ্যে সাদিমান দরগাই (৮৫), পিতা খবিরউদ্দীন দরগাই অন্যতম। তিনি, তাঁর পিতা খবিরউদ্দীন দরগাই, পিতামহ সদরউদ্দীন দরগাই, প্র-পিতামহ হারু দরগাই বংশ পরম্পরায় বাগোয়ানের শেখ ফরিদের দরগার খাদেম। সাদিমান দরগাই দরগাপন্থি সাধক ও জারি-ধুয়া গানের বয়াতি। সাদিমান এবং তার গানের দলের দোহার হামজা শেখ, আমীর শেখ, হোসেন মোল্লা, দলিল খান, রজব আলীর কাছ থেকে কয়েকটি মর্সিয়াগান সংগ্রহ করে এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো :

১.

আয় আয় মহরম চাঁদ ছাবকায়ে সালাম,
বোলো কাছে ভাই মেরা বোধ হামারা দোসকো
ভায়কো কারবালা মে যা, কর সালাম হযরত নবিকো
গোলা হোয়া যা কর সালাম।
ঘরে ঘরে মাতম ইয়া মসিবাতে
সাদি কাঁদন সাদিক ঘরে মো
ওরে ওয়া বাণী হা আজ দোলেহান।
বানকো সিহারা ও রানেমো খাড়ে হ্যায়
কাসেম সাজন।

ভাবার্থ : এসো এসো মহরমের চঁদ, লও সকলের সালাম। আমার বেদনার্ত হৃদয় কেঁদে কেঁদে বলে, কারবালাকে সালাম জানাই। হযরত নবী (সা.) এর প্রিয়তম দৌহিত্রকে সালাম জানাই। কারবালার বেদনাবিধুর ঘটনার কারণে ঘরে ঘরে আজ শোকের মাতম। বিষাদময় পরিস্থিতিতে বিয়ের আয়োজন। বরের সজ্জা পরে কাসেমের যুদ্ধযাত্রা।

২.

আঁখে দিয়ো আশুবিরা মোমে ভাইয়ো জোলজালা
জোলজালা বাবা মেরা জোলজালা কেউ সে অস্তে,
ও সারবে ছার কেঁউ ঘর নাহি কেউ মাঝেরা

www.pathagar.com

জোলজালা কেঁউ সো অস্তে,
রোকাহে জয়েনালের বাকা লিফেরাই
জোলজালা কেঁউ সো অস্তে।

ভাবার্থ : দেখ, দুচোখে অশ্রু ঝরছে, কিন্তু সর্বাঙ্গে যুদ্ধের উন্মাদনা। চোখে মুখে কিসের বিভা? হোসেন বংশের কেউ ঘরে থাকে না। সত্যের জন্য আত্মবলিদানে তারা উদ্বেল। এই যুদ্ধে কেবল জয়নাল বেঁচে থাকলো।

৩.
ঘোড়া কাসেম কাজাব এ রণেছে॥
আঁখে দেউড়ির ওপার রানছে খাড়া হ্যায়
আজ কাজু খাবর ওমাইনে থাকে
ঘোড়াকান এলাহি শোন বিবি তোমার আরজ কোথায়?
ও জালেম লড়তো হ্যায়॥
কিসকি কাহো ফরিয়াদ মাইনে যাকে
বিবি দোলেহান তোম কাঁদনে রো রো॥

ভাবার্থ : কাসেম ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যখন যুদ্ধযাত্রী, তখন দরজার ওপারে তার নজর পড়ে। আজকের যুদ্ধের সংবাদ আমি সেখানে গিয়ে সংগ্রহ করবো। খোদার কৃপায় ঘোড়ার কান শুনেছে, তুমি শোন বিবি। জালেমরা যুদ্ধ বাধিয়েছে। আমার ফরিয়াদ সেখানে গিয়ে কাকে নিবেদন করবো। হে নবপরিণীতা বধূ। তোমাকে ক্রন্দনরত রেখেই আমি যুদ্ধে গেলাম।

৪.
ওমিত গায়ে মহরম ছিতেকা সিঁদুর
লাকোবে লতিয় তারা গাহিল॥
লতি পিতি বালি দোলেহান
আসগার সোয়ামি মারা গাহিল॥
আকাবার গাহিল আছাবার গাছিল
গানছে ধরা পিয়া ধরা রহিল॥
লতি পিতি বালি দোলেহান
আসগার সোয়ামি মারা গাহিল॥

ভাবার্থ : মহরম এসে মুছে দিলো অনেক সধবার সিঁথির সিঁদুর। শোকগাথা তারা গাইতে থাকলো। বালক-বালিকা, সধবা-বিধবা সকলেই কাঁদে। স্বামী আসগার মৃত্যুবরণ করেছে। শোকে মুহ্যমান আকবার-আসগার সকলেই মর্সিয়াগানে শোকতর্পণ করে। আর এই শোকতর্পণ শোকগাথা হয়ে ধরণীর বুকে ধরা থাকলো। বালক-বালিকা, সধবা স্বামীহারা হয়ে কেঁদে আকুল হয়ে শোকগাথা গাইল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, পাগলা কানাই-এর জারিগানেও বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ, হিন্দু পুরাণ এবং সখিনার সিঁথির সিঁদুর মুছে যাওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। বৈধব্যের যন্ত্রণা ও স্বামীর মৃত্যুতে কাতর সখিনার মর্মবেদনা তুলে ধরে কানাই গেয়েছেন :

www.pathagar.com

আমার বিয়ের রাতে মলো পতি এই ছিল কর্মে
কাল সকালে বেরন বলে গয়না দিছ গায়
আজ কেন মোর সিন্তার সিঁদুর গয়না খোলা যায়।

৫.
যাব কাহেলা লায়া খবর মাদিনা শহর মে॥
বাইঠে দিখোর মেঘের ডালে রো রো কে ফোর কাবে কে।
দুনো বাচা গায়া মেরা
কই নাই হিয়া ফেরকে
জান রাইয়া হ্যায় রণমে হুয়া
জের পড়ে জামিন মে॥
পড়কে ফজর মে নামাজ
মা খাতুনে জান্নাত কোহেল কাহিল
ইমাম তেরা মহা হ্যায় কারবালা মে॥

ভাবার্থ : যখন দুঃসংবাদ নিয়ে কাসেম মদিনা শহরে এলো, তখন ডালে ডালে পাখিরা কেঁদে কেঁদে বলল তোমার ছেলেরা মারা গেছে। কেউ আর ফিরে আসবে না। যুদ্ধে সবাই নিহত হয়েছে। ফজরের নামাজরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননীকে কোকিল বলল, তোমার ইমাম হোসেন কারবালায় নিহত হয়েছে।

৬.
দেলবার জমিরা গায়ামারা আপনেরা
হোকা হ্যায়।
কেঁয়ছে হ্যায় মেদি কেঁয়ছে হ্যায় সাসি
কেঁয়ছো হো ইলাদন।
হাতে বে চুরিয়া লাখোবে চুরিয়া
তুয়ৎ লিতিরা।
হায়রো খোদা হ্যায় মুজগো বেওয়া হ্যায়
সাদি কাঁদন।
চালে সামান কো লেকে তাবোধ
সাধুকার লেগাকান।

ভাবার্থ : আমার হৃদয়ের ধন ও আপনজনদের কি অবস্থা? তাদের মেহেদিমাখা ও সজ্জিত হাত চুড়ি বিহীন। ভাগ্যের পরিহাসে স্বল্প বয়সী রমণীরাও হায় খোদা, বিধবা হয়ে গেল। বাসরশয্যা ক্রন্দনগৃহে পরিণত হল। সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে ইমামপক্ষ কারবালার প্রান্তর থেকে ফিরে আসে। কবিগণ এসব ঘটনা নিয়ে অমর শোকগাথা রচনা করেছেন।

৭.
ফাতেমা কাতে হ্যায় রো রো
আয় মেরি বাবা হোসেন॥

www.pathagar.com

কেন জঙ্গল মে ছোরা হাতম
আয় মেরি বাবা হোসেন॥
কাতরা পানি কেউ না দিয়ো
আয় মেরি বাবা হোসেন॥
ফর্স ফজর হোগা হাতম
ঘর চলো বাবা হোসেন॥
ফজর হোয়া নামাজ পড়ো
আয় মেরি বাবা হোসেন॥

ভাবার্থ : মা ফাতেমা কেঁদে বলে, এসো মোর বাবা হোসেন। কোন জঙ্গলে তুমি পড়ে আছো? এসো বাবা হোসেন। কেউ তোমায় এক ফোঁটা পানি দেয়নি। এসো বাবা হোসেন। এখন তো রাত ফর্সা হয়ে এলো। বাবা হোসেন ঘরে চলো। ফজরের সময় হয়ে গেছে। বাবা হোসেন, নামাজ পড়ো।

পাগলা কানাই-এর জারির মতো এসব মর্সিয়াগানেও রয়েছে জলতৃষ্ণার হাহাকার, সধবার স্বামী-বিয়োগ, এজিদ বধ, নবী (সা.) দুহিতা ফাতেমার বিলাপ-এর কথা। ভিন্ন ভাষায় রচিত এসব গানের মধ্যেও সার্বজনীন মানবিকতার ব্যঞ্জনা খুঁজে পাওয়া যায়, যা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব বাঙালিকেই কাঁদায় এবং ভাবায়।[১৪]

৮. কীর্তনগান

বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তাদের দ্বারা রচিত রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা ভিত্তিক গানকে কীর্তনগান বলা হয়। বিভিন্ন রাগসংগীত, জটিল তাল, ছন্দের বৈচিত্র্য ও ভাব-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ এ গান। কীর্তনগান দুভাগে বিভক্ত—পদাবলি কীর্তন ও নাম সংকীর্তন। পদাবলি কীর্তন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে পুষ্ট। এই কীর্তনকে রসকীর্তনও বলা হয়। আর নাম সংকীর্তন নগর সংকীর্তনে গাওয়া হয়। শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)-এর সময় থেকে নামকীর্তন ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জন করে। এর মূল মন্ত্র 'ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর'।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥

মেহেরপুরে কীর্তনগানের ব্যাপক প্রচলন ও প্রসিদ্ধি ছিল। কবি জগদীশ্বর গুপ্ত (বাংলা ১৮৪০-১৮৯২), রমণীমোহন মল্লিক-এর বৈষ্ণব সাধক ও পদকর্তা হিসেবে খ্যাতি ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরের হরিসভা মন্দির ও চাঁদবিলের রাধা-শ্যাম মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বছর নাম সংকীর্তন ও পদাবলি কীর্তনের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে বৈষ্ণব ভক্তগণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে জড়ো হয়। এছাড়াও মেহেরপুর নায়েববড়ি মন্দিরপ্রাঙ্গণে এবং ক্যাশ্বপাড়ার অনিল কুমার বিশ্বাসের বাড়িতে দোলযাত্রা উপলক্ষে কীর্তনগানের আসর বসে।

দূর-দূরান্তের বৈষ্ণব ভক্তগণ তাঁর বাড়িতে হাজির হয়। ১৯৪৭ সালে হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে মেহেরপুরে কীর্তনগানের ধারাটি ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। গাংনীর কসবা গ্রামের অনিল গোসাঁই, জুগিন্দার শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চাঁদবিলের চণ্ডিচরণ

www.pathagar.com

হালদার পদাবলি কীর্তনের ধারাটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। কীর্তনগানের পাঁচটি অঙ্গ-কথা, দোহা, আখর, তুক ও দুট।

ক. মূল কীর্তনীয়ার ব্যাখ্যান অংশকে বলা হয় কথা।

খ. শ্লোক, পয়ার, ত্রিপদীর অংশকে দোহা বলা হয়।

গ. পদাবলির ব্যাখ্যান অংশকে আখর বলা হয়।

ঘ. অজ্ঞাতনামা পদকর্তার অংশকে বলা হয় তুক।

ঙ. তাল ফেরতা ও সুরবৈচিত্র্যের অংশকে বলা হয় দুট।

পদাবলি কীর্তনকে একটি গীতিনাট্য মনে করা হলেও রাধা-কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা অনুযায়ী কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়। উপবিভাগগুলো হলো : জন্ম, বাল্য, গোষ্ঠ, দান, নৌকাবিলাস, অভিসার, মানভঞ্জন, বিরহ, ভাব সম্মিলন, নিবেদন ও প্রার্থনা। আর গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকে কীর্তনের নান্দী বা সূচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মেহেরপুরের ক্যাশ্বপাড়ায় অনিল বিশ্বাসের বাড়িতে আয়োজিত এক আসরে এক কীর্তনিয়া গাইলেন :

আমার গুরু গৌরাঙ্গ শ্যাম ত্রিভঙ্গ
রাম নারায়ণ হরি॥
আমি তোমারই উদ্দেশে ঘুরি দেশে দেশে
কোথায় রইলে গৌর হরি॥
তুমি অমল ধবল, স্বভাব কোমল
দূরান্ত বৃতান্তকারী॥
তোমার নামেতে আনন্দ, রূপেতে আনন্দ হেরি,
তুমি নীল নটবর, রূপে মনোহর
মহা সংকীর্তন কারী॥
আমি বড় দুঃখী, করি নিবেদন
দিয়ো মোরে চরণ তরী॥

পদাবলি কীর্তনকে গীতিকবিতা হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এই গীতিকবিতায় কবির আত্মগত ভাবের প্রকাশ ঘটে। এই গানে কীর্তনীয়া বা পদকর্তা রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজের মনের কথাও তুলে ধরেন। এজন্য পদাবলি কীর্তনের আবেদন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছে সমান। তবে, বৈষ্ণব মতের অনুসারীদের কাছে কীর্তনগান কোনো গান নয়। এ হচ্ছে তাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম বা সাধন সংগীত। বৈষ্ণবগণ গুরুবাদে বিশ্বাসী আর তাই গুরুবন্দনার মধ্য দিয়ে কীর্তনের আসর শুরু হয়।

আশ্রয় করিয়া বন্দি শ্রী গুরুর চরণ,
যাহা হইতে মেলে ভাই কৃষ্ণ প্রেমধন।
জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সূত হরি
ভুবনে প্রকাশ হন গুরু রূপ ধরি।
মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জানো

www.pathagar.com

গুরু আজ্ঞা হৃদে সদা সত্য করি মানো।
সত্যজ্ঞানে গুরু বাক্যে যাহার বিশ্বাস,
অবশ্য তাহার হয় ব্রজধামে বাস।
কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে,
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে।
গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু হন পতি,
গুরু ভিন্ন ত্রিজগতে আর নাহি গতি।
গুরুকে মানুষ জ্ঞান না করো কখনো
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না করো শ্রবণ।
শ্রী গুরুর পাদপদ্মে করহ্ বন্দনা,
যাহা হইতে ঘোচে এই এ ভব যন্ত্রণা।

গুরুবন্দনার পর পরই শুরু হয় গোষ্ঠলীলা, রাসলীলা কিংবা নৌকাবিলাস। নৌকাবিলাস পর্বে দেখা যায়—যমুনার তীরে কৃষ্ণ তার ভাই শ্রীদাম, সুদামকে নিয়ে খেলা করছে। হঠাৎ রাধার কথা মনে হতেই কৃষ্ণ বিষণ্ন হয়ে যমুনার তীরে বসে পড়ল। তখন সুবল কানাইকে বলছে, তুই কী আমাদের সাথে খেলবি না ? কৃষ্ণ তখন গানে গানে বলছে :

খেলা ভালো লাগে না
আমায় যে খেলায়, সে খেলায় নারে।
আমার রাধার বিরহে অনলে জ্বলি
রাধা ছাড়া যে আর জানি নারে।

(কথায়) ভাই সুবল, আমি যে রাধাবিরহে অনলে জ্বলে মরছি। আমার রাধামিলন ঘটিয়ে দাও।

সুবল-ওরে কানাই, তোর রাধামিলন আমি কেমন করে ঘটাবো। তুই যোগমায়া যোগেশ্বরীকে ডাক। সে তোর সাথে রাধার মিলন ঘটিয়ে দেবে।

ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে বাজাইলো বাঁশি
শ্রী রাধিকার কর্ণে প্রবেশিল আসি।
যশোদা সুনীল বাঁশি বাজাইছে জননী,
অঞ্জনপুরে ননী লয়ে ধায় নন্দরানি॥
রাখালে শুনিল বাঁশি গোঠে চলো ভাই,
খোঁয়াড় ভেঙ্গে ফসল খেলো তোর দোয়া গাই॥
ক্ষেতের ফসল সব খেয়ে গেল।
একবার ফিরে চাহিলি নারে কেউ,
ক্ষেতের ফসল সব খেয়ে গেল।
নামের বেড়া দিলো না কেউ
ক্ষেতের ফসল খেয়ে গেল।
বাজলো বাঁশি বৃন্দাবনে
যার যেমন কান সে তেমনি শোনে।

www.pathagar.com

১৯৪৭-এর আগে পদাবলি কীর্তনের ধারাটি শক্তিশালী ছিল। এক সময় বৈষ্ণবেরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ঢোল-করতাল বাজিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতো। মেহেরপুর নিবাসী লেখক দীনেন্দ্র কুমার রায়ের 'পল্লি চিত্র' গ্রন্থে এরকম একটি পদাবলির উদাহরণ পাওয়া যায় :

হরি নাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে,
বিফলে মনুষ্য জনম যায় দিনে দিনে।
কৃষ্ণ ভজিবারে ভাই সংসারে আইনু,
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হেনু।
ফলরূপে পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে,
কালরূপে বৃক্ষ সাথে 'পক্ষ' বাস করে।
যেদিন বৃক্ষ জন্ম নিল দেবকী উদরে,
মথুরায় দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সংকীর্তনের দল এক সময় বড় বাজারের রাস্তায় কীর্তন করে বেড়াতো। তারা দুহাত ঊর্ধ্বে তুলে ষোলো-করতাল বাজিয়ে গাইতো :

হরিনাম বিনে রে, কি ধন আছে রে?
বল মাধাই, মধুর সুরে,
হরিনামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মঞ্জুরে,
নারদ ঋষি দিবানিশি বীণা যন্ত্রে গান করে।

কীর্তনগান একটি সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। চিত্তবিনোদন কিংবা কেবল রসাস্বাদনের জন্য এ গান গীত হয় না। দীক্ষিত বৈষ্ণব কীর্তনিয়ারা ধুতি পরিধান করে, গায়ে নামাবলি চড়িয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে এ গান পরিবেশন করেন। ভক্ত শ্রোতাকুল অশ্রুসিক্ত হয়ে এ গান শোনে এবং কেউ কেউ মাঝে মাঝে হা-হা করে কেঁদে ওঠে।[১৫]

৯. ভাসান গান

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করে চলে যাওয়া সীমান্ত অঞ্চলের চারপাশে বিশেষ করে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর অঞ্চলে ভাসান গানের প্রচলন আছে। ভাসান গান মূলত সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার মাহাত্ম্য, চাঁদ সওদাগরের দ্রোহ, লখিন্দরের সর্প দংশনে অকাল মৃত্যু এবং বেহুলার সতীত্ব রক্ষার কাহিনিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কানা হরিদত্তের মনসামঙ্গল, নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ রূপান্তরিত রূপই ভাসান গান বা বেহুলা-লক্ষিন্দরের গান। ভাসান গান হলো এক ধরনের কাহিনি ভিত্তিক পালাগান। ২০১১ সালের ৯ অক্টোবর গাংনী উপজেলার প্রাণিসম্পদ হাসপাতালের সামনে আয়োজন করা হয় ভাসান গানের আসর। গাংনী অঞ্চলে এ গানকে ভাসান যাত্রাও বলা হয়। এ পালা পরিবেশনের জন্য কোনো মঞ্চ লাগে না। শামিয়ানার নীচে মাদুর বা চাটাই পেতে রাখা হয়। এই মাদুর বা চাটাইয়ের উপর পালা পরিবেশিত হয়। গাংনীর আসরে ছিল পাঁচজন বাদক যার মধ্যে হারমোনিয়াম বাদক বসেছেন গায়েনদের পিছনে, জুড়ি, ঢোলকবাদকরা দক্ষিণে আর উত্তরে প্রেম-জুড়ি আর দোতারাবাদক।

www.pathagar.com

মনসা দেবীচাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, বিশ্বকর্মা, নেতাই ধোপানীর চরিত্রে যারা অভিনয় করছেন তারা সবাই পুরুষ, পেশায় কৃষিকাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, মুটে ও রিকশাচালক। এদের সবাই মুসলমান, কেবল একজন হিন্দু। আসর বন্দনার পর পালা শুরু হয়। পালায় চাঁদ সওদাগর গায় :

যে হাতে পুজেছি আমি আমি দেব শূলপাণি
সেই হাতে পূজা চাস তুই মনসা কানী?
মনসা কানী, শয়তানী তুই এখনই চলে যা!
নৈলে পরে পড়বে শিরে এই হেঁতালের ঘা।

চাঁদ সওদাগরের আচরণে অগ্নিশর্মা হয়ে পদ্মাদেবী বা মনসা নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। কিন্তু ঘটনার সমাপ্তি হলো না। চাঁদ সওদাগর ছয় পুত্রসহ বাণিজ্যতরী নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তখন পদ্মাদেবীর অভিশাপে ছয় পুত্র সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ করে। তারপর মায়াবলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় এবং চাঁদ-এর চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকরসহ ডুবে যায়। তখন একজন গায়েন গান ধরে :

কালী দহে পড়ে চাঁদ পান করে জল
ক্ষণকাল যায় ভেসে ক্ষণে তল।
সাত দিন নয় রাত্রি ভাসিল সাগরে।
ইচি মাছ বাসা বাঁধে দাড়ির ভিতরে।
দ্বিজ রাধানাথ বলে ভাবি পদ্মাবতী
না জানি চান্দের কত রয়েছে দুর্গতি॥

ভাসান গানের সুর বড় করুণ। সাতদিন ধরেও এ পালা চলে। গানের কথাও সহজ। কালনাগের দংশন কালে এক গায়েন গাচ্ছে :

ঘরে প্রবেশিয়া নাগ নিরখিয়া যায়,
দেখে বালা লখিন্দর সুখে নিন্দ্রা চায়।
রূপ দেখি নাগিনী হইল চমৎকার,
ভাবে হেন অঙ্গ কিসে করিব সংহার।
সাত-পুত্র-মাতা আমি জানে ত্রিভুবনে
কেমনে পরের পুত্র বধি অকারণে॥

কালনাগে দংশিত হয়ে লখিন্দর গায় :

ওঠো বলি জ্বালো গো আলো,
আমার বিষে হইল অঙ্গ জ্বরো।
উপুড় করে ঢালো গো গঙ্গার পানি,
ওরে বেহুলার বাপে দান করিল
আমার চড়ার ঘোড়াখানি।
উপুড় করে ঢালো গঙ্গার পানি,
বেহুলার বাপে দান করিল
আমার হাতের ঘড়ি খানি॥

www.pathagar.com

লখাইকে ঘুমে মগ্ন দেখে আর্তনাদ করে বেহুলা গায় :

ওঠো ওঠো প্রাণনাথ কত নিদ্রা যাও
নিশি অবসান হলো আঁখি মেলে চাও॥

ভাসান গানের পালায় পুরুষরাই বেহুলার অভিনয় করে। বেহুলারূপী গায়েন বেদনার্ত হয়ে গায় :

জাগো মা জাগো সুনুকা রাণী
মলো যে তোমার কোলের মানিক।
জাগো মা জাগো কমলারাণী
হারালো যে তব কুড়ানো মানিক।
দেখা করে তুমি যাও মা
শেষ দেখা দেখে যাও।

বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। মরা স্বামীর জন্য বেহুলা যখন ঔষধ খুঁজতে যাচ্ছে, তখন গাওয়া হচ্ছে :

ওষুধ তুলতে যায় বেহুলা নিশি ভরা রাতে গো,
ওষুধ তুইলি পাঁজা পাঁজা ঝোড়ে বাঁধে বোঝা গো॥
ডান হাতে খোন্তা-কোদাল, বাম হাতে মোমবাতি গো,
চম্পাই খুঁজে বেহুলা ওষুধ নাহি পেল গো॥

অলক্ষুণে, পোড়া কপালি বলে বেহুলাকে খোঁটা দেওয়াও হয় :

ভিট কপালি মেয়ে তুমি কত কলা জানো,
বাসর ঘরে পতি মেরে এখন কেন কাঁদো॥

উত্তরে বেহুলা গায় :

ভিট কপালি মেয়ে আমি
ওমা সবাই তোমরা জানো,
কথা দিয়ে ব্যথা দেওগো
সহেনা পরানে গো॥

সোনার পালঙ্ক ছেড়ে লখিন্দর যখন মাটিতে পড়ে আছে, তখন অশ্রুভরা নয়নে কেঁদে কেঁদে বেহুলা গাইছে :

সোনার পালঙ্ক ছাড়িয়া,
ধুলাতে লুটায়ে পড়িয়া আছে প্রাণপতি,
আমি কার বা করলাম ক্ষতি,
না পোহাইলো রাতি॥
আমি বাসরে হারালাম প্রাণপতি,
একবার ওঠো ওঠো নাথ,
রজনী প্রভাত হইল, উঠিল দিনমনি
আমার যে বাঁচাবে পতি, দান করিব রতি
দিয়ে বাপের জমিদারি।

www.pathagar.com

বেহুলা আবারও গায় :

আমি কাঁচা চুলে কেন গো আঁড়ি হলাম মা
কাজ কি আমার এটাই প্রাণে, পতিশোক সহে না প্রাণে।
আমার হলুদ শাড়ি, ফুল বিছানা রইলো বাসরে পড়ে
আমার সিঁথির সিঁদূর কেন মুছে গেল মা,
কাজ কি আমার এ চাই প্রাণে॥

ভাসান গান এক সময় মেহেরপুরের সব গ্রামে প্রচলিত ছিল। গাংনী থানার রামনগরের নিমু নাপিত, সাহারবাটির খেডু নাপিত, মায়ামারীর হকাজ্জেল আলী, গাংনীর সিদ্দিক ঘরামী, তেকালার নুরাল উদ্দীনের ভাসান গানের জন্য খ্যাতি ছিল। এখনও সাহারবাটি হিজলবাড়িয়া, কুলবাড়িয়া, মায়ামারী, রামনগরে ভাসান গানের দল আছে।[১৬]

১০. মানিক পিরের গান

মেহেরপুর জেলার গ্রামে গ্রামে এখনও মানিক পিরের গানের প্রচলন আছে। মানিক পিরকে কেউ গো-বাছুরের রক্ষাকর্তা এবং কেউ তাকে ব্যাধির দেবতা হিসেবে শনাক্ত করে। মানিক পিরের গানে মূলত পিরের মাহাত্ম্য ও কেরামতি নিয়ে বর্ণনা করা হয়। তাঁর কেরামতি নানা রকম—তিনি পশুপাখির প্রাণ ফেরাতে পারেন, অসুস্থকে সুস্থ করেন, বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দেন এবং মৃতকে দেন পুনর্জীবন। সর্বোপরি, তিনি নিদানকলে অসহায়ের সহায় হোন।

মানিক পিরকে নিয়ে যে আচার-অনুষ্ঠান চালু আছে, সেগুলো নিম্নবর্গের মানুষ পালন করে। মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর, বুড়িপোতা, সাহারবাটি, কুলবাড়িয়া, চিৎলা, বাহাগুন্দা, হাঁড়িয়াদহ, তারানগর, গোভীপুর, বেলতলাপাড়া গ্রামে এ গান পৌষ মাসের প্রথম ভাগে শুনতে পাওয়া যায়। মানিক পিরকে গৃহস্থের গরু-বাছুরের রক্ষাকর্তা এবং রোগ-বালাই নিরাময়কারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই তাঁর নামে এ অঞ্চলের ভক্তেরা শিরনির আয়োজন করে। পৌষ মাসের প্রথম ভাগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানিক পিরের গান বা পাঁচালি গেয়ে চাল-ডাল-তরকারি, টাকা সংগ্রহ করে। সংগৃহীত মাগন রান্না করে সবাই মিলে শিরনি হিসেবে খায় এবং বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়।

২০০১ সালের পৌষ মাসের ১ তারিখে সন্ধ্যায় সাহারবাটি ইয়ুথ ক্লাবের সামনে আয়োজন করা হয় মানিক পিরের গান। সাহারবাটি গ্রাম মেহেরপুর জেলার বড় গ্রামগুলোর একটি। যাত্রা-থিয়েটারের জন্য গ্রামটি মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে বেশ পরিচিত। বাউলগান, জারিগান, ভাসানগান, আলকাপ গানের চর্চা ও নিদর্শন এ গ্রামে রয়েছে। পৌষ পার্বণ উপলক্ষে মানিক পিরের গানের আয়োজন করেছেন তোজাম্মেল হক (৫৫), আলী হোসেন (৫০), গোলাম ফারুক (৪৮), ইয়াসিন আলী (৩৬), তামজিদুর রহমান মুক্তি (৩৭), আনারুল ইসলাম আকালী (৩৫)সহ গ্রামের কয়েকজন সংস্কৃতিমনস্ক যুবক। মানিক পিরের গান পরিবেশনার জন্য শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, সেই সাথে জ্বালানো হয়েছে লাইট। আসরে উপস্থিত প্রায় সকলেই মুসলমান, কয়েকজন হিন্দু নারীও উপস্থিত হয়েছেন। মঞ্চ হিসেবে চাটাই বিছানো হয়েছে। আসরের মূল গায়েন মসলেম আলী শেখ (৬০)। তিনি আলকাপ গানও গাইতে পারেন। হারমোনিয়ামবাদক

www.pathagar.com

বাণী হোসেন (৫০), ঢোলক সাজু আহ্মেদ, ঢোলবাদক ময়নাল, ডুগি-তবলায় হান্নান (৫২) ছিলেন। মূল গায়েন ও যন্ত্রশিল্পী সবাই সাহারবাটি গ্রামের অধিবাসী এবং পেশায় কৃষক। দোহার হিসেবে আছেন ইদ্রিস, কাশেম, বিশারত, রফিক, জামাল। এরা মানিক পিরের গান ছাড়াও বাউলগান করেন।

মেহেরপুর জেলায় মানিক পিরের গানের ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের। কারণ এ অঞ্চলে ঘোষদের বসবাস ছিল, যারা গরু পালন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। মসলেম আলী পরিবেশনার শুরুতেই গাইলেন :

মানিকের নামে তোমরা হেলা করো না,
মানিকের নাম থাকলে বিপদ হবে না॥
মানিকের নামে চাল পয়সা যে করিবে দান
গাইলে হবে গরু বাছুর ক্ষেতে ফলবে ধান॥

মসলেম আলী পরিবেশন করলেন মানিক পিরকে ঘিরে কানু ঘোষের পালা। তিনি আসরে গান গাইছেন এবং অভিনয় করে কাহিনি বর্ণনা করছেন। বাদকেরাও প্রয়োজনে অভিনয় করছেন মাঝে মাঝে। গায়েন সাদা লুঙ্গি ও ফতুয়া পরেছেন এবং বাদক ও দোহাররা সাধারণ পোশাক পরে আছেন। কানু ঘোষের পালা এরকম—মানিক পির পথে নেমেছেন জীবনকে উপলব্ধির জন্য। হাজার ক্রোশ পেরিয়ে তিনি হাজির হলেন গোকুল নগরের কানু ঘোষ আর তার ভাই কিনু ঘোষের বাড়িতে। তার দুজনে হাজার গোধনের মালিক। মানিক পির কানু ঘোষের কাছে দুধ মাঙলে কানু দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পাশাপাশি কানু মানিক পিরকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে কানুর বাড়ি-ঘর, গরু-বাছুর মানিক পিরের অভিশাপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কানু ভিখারিতে পরিণত হয় এবং এক পর্যায়ে সাপের দংশনে মৃত্যুবরণ করে। পুত্রশোকে কাতর কানুর মা মানিক পিরের কাছে এক পাত্র দুধ নিবেদন করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে ফকির তাকে ক্ষমা করে দেয়। কানু পুনর্জীবন লাভ করে এবং গরু-বাছুরে গোয়াল ও সোনার ধানে উঠান ভরে যায়। মানিক পিরের গান অগ্রহায়ণে আমন ধান ওঠার পর পরই মেহেরপুরের কোনো কোনো গ্রামে শুরু হয়। এ গান রাজশাহী, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলের জাগগানের মতো। এ অঞ্চলের মানুষ রাত জেগে কখনও শোনে মানিক পিরের গান, কখনও নিমাই-এর গান।

হিন্দু রমণীরা গায় :

পঞ্চ মাস কালে নিমাই, পঞ্চ ফুল ফোটে
ছয় মাস কালে নিমাই, মাথার চুল ওঠে,
সাত মাস কালে নিমাই, সাত সুরে গায়,
অষ্টমাসের কালে নিমাই, শুইয়া নিদ্রা যায়।

এ গান হয় পৌষ মাসে, আমন ধান গোলায় তোলার সময়। মেহেরপুর অঞ্চলে চাষি, ক্ষেতমজুররা দল বেঁধে মানিক পিরের গান গেয়ে বেড়ায়। আজও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রান্তসীমায় বসবাসকারী মানুষ মনে করে, মানিক পিরের গানে অংশ

www.pathagar.com

নিলে তাঁর করুণায় গরু-বাছুরের ক্ষতি হয় না। কারণ তারা মনে করে যে, বেহেস্তের সভায় খোদা বলেছেন,

সেই জনে দিব আমি দুনিয়ার ভার।
কলিকালে মানিক হবে অবতার॥[১৭]

১১. আরজান শাহর গান

১.
গুপ্ত লীলা বৃন্দাবনে হেরো নয়নে
আহা মধুর লীলা কে জানে রসিক বিনে॥
লীলা নিত্য স্থানেতে মোহিত প্রেমেতে
অঙ্গ হয় প্রসঙ্গ যুগল একসাথে
কিশোর-কিশোরী দেহে জীর্ণ জ্বরা দুইজনে॥
সখী সম্পদ যে জন, অঙ্গে সঙ্গ অষ্টজন
গুপ্ত লীলা প্রেমের খেলা পেল না চেতন
অচেতনের রূপ দর্শন কোন জন তা না জানে॥
প্রেমের গুরু যে জন হয় ভক্তের দ্বারে প্রেম বিলায়
মানবলীলার নিগূঢ় জানে গোসাঁই
চাঁদপতি গোসাঁই-এর লীলা
দাস আরজান কয় রাত্রি দিনে॥

২.
আয় গো সখী দেখি চাঁদ গৌর লীলে।
এসে মানবরূপে নবদ্বীপে চণ্ডালে চরণ দিলে॥
দেখে ডেকে করলে পলায়ন তারপরে দয়া হলো না কিসের কারণ
কাষ্ঠতরী সোনা হলো যাহার চরণের জলে॥
অবতীর্ণ কলি যুগেতে জীব তরাতে এলেন প্রভু মানব রূপেতে
মনে মন মিশায় না কেন দেখো এই জীব সকলে॥
আরজান বলে লোমকূপেতে আসমান জমিন
চৌদ্দ ভুবন হইল তৈয়ার
সে মানবরূপে ভবকূপে ভক্তের কাছে দেখালে॥

৩.
মানুষ বিনে আর কিছু নাই
নৈরাকারে ডিম্ব পরে ভেসেছে এই মানুষ গোঁসাই॥
ধন্ধকারে অন্ধকারময় সাকারেতে আকার ধেয়ায়
দীপ্তকারে হয়ে উদয় মানুষ রূপে লীলা দেখায়॥
মানুষে মানুষ কারবার আশুক নাম দুহাকার
মনসুর হাল্লাজ মানুষ কারবার, সে ফুকারিয়া আল্লা কবলায়॥

www.pathagar.com

চাঁদপতি কয় আরজানেরে, ভজো বর্তমান এই মানুষ ধরে
এই মানুষ অটল বিহারে অখণ্ড গোলকে আশ্রয়॥

৪.

খোদার নূরে সেই নবি নূরি
আউল আখের বাতেন জাহের দুই ভেদ করলেন জরি॥
বিলায়েত জানলে সিনায় নবুওত বোঝায় জাহেরায়
রসুলের তরিকার রাস্তায় আইন তারি॥
দায়েমী নামাজ আদায় কর, বরজখ নিহার তরিকতের
নকশাবন্দি আশকের নিহাজ জরুরি॥
জুলমাতে সেই কঠিন দিনে কিনারো নাই সেই নূর বিহনে
লিখেছে নবির আইনে বিধান তাহারি॥
প্রকাশিয়া আকারেতে তরিক জানায় এ জগতে
আরজান কয় আদায় করিতে নামাজ দেল হুজুরি॥

৫.

বিবেকেতে খেলো খেলা তাস লয়ে হাতে
গুরুরূপে টেক্কা খানা রয়েছে এক ফোঁটাতে॥
ভাবসাগরে দিয়ে মেলা বোঝো রে ভাই দুরির খেলা
ত্রিগুণেতে তৈরি চালা স্বাদ বুঝিবে চৌকাতে॥
পঞ্চ ভাবের পঞ্চ খানা ধরলে কেউ তুলতে পারবে না
ভুলো নারে মন রসনা ছয় রিপুর ছক্কাতে॥
সপ্ত রসের সাতা খানা অষ্ট সখীর আটালে না
নব দ্বার এই নওলা খানা চৌদ্দ হরে রঙেতে॥
দশ ফোঁটা ইন্দ্রিয় জানো বিবেকে প্রাণবিবি আনো
সহজ ভাবে সাহেব টানো ইস্তক হবে তাহাতে॥
নিম্নভাগে গোলাম রহে সুস্বভাব মিশাও হে তাহে
রঙ পঞ্চাশে খেলা নাই হাতের পাঁচ থাকবে হাতে॥
যদি গোলাম রঙের হয় আপন জোরে চলে যায়
কেউ ঠেকাতে পারবে না তাই, আরজান রয় পতির কাছেতে॥

৬.

খবর দিয়েছ হে সাঁই দলিলে
ওয়ারাব্বাকুম ফা আবদুল বলে॥
তুমি বটে পালনকর্তা তুমি সবের জীবন আত্মা
তুমি পতি, তুমি পিতা সর্বদাতা ভূমণ্ডলে॥
বুঝিতে কুদরত তোমার সাধ্য কার এ জগৎ মাঝার
দেখিয়ে বিষম নৈরাকার ভেসে যায় রে গঙ্গাজলে ।
ত্বরাও পতি দাসী বলে বিষম ফাঁসি মায়াজালে
আরজানকে ত্বরাও মুশকিলে ফেলো না হে ঠেলে॥[১৮]

www.pathagar.com

১২. আজাদ শাহ্‌র গান

আজাদ শাহ-এর শিষ্য গোলাম হোসেন মাস্টারের কাছ থেকে প্রাপ্ত আজাদ শাহের কয়েকটি গান এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো :

১.

ভগীরথী তীর্থ নদী গড়েছে বিধি ভূমণ্ডলে
স্নান করেছে সবাই, কেউ বাকি নাই এ তীর্থ নদীর জলে॥
সাড়ে তিনশ ক্রোশ নদীর সীমানা, ভিতরে আছে ত্রিমোহনা,
না জেনে নামে যে জনা পড়ে যায় অতল তলে॥
শুকায় না নদী বহে ধারা, তিনশ ঊনত্রিশ দিন থাকে রসে ভরা,
ছত্রিশ দিন বহে স্রোতের ধারা, জলের ঢেউ ছাপিয়ে চলে॥
বারো মাসে বারো যোগ আসে, যোগ ধরার আশায় সাধু থাকে বসে,
যোগ পেলে মনের উল্লাসে যোগের জল নেয় তুলে॥
আরজান বলে আজাদকে ডেকে, নদীর স্নান করিস তুই যোগ দেখে,
নইলে ঢেউ তরঙ্গ থেকে বাঁচবি না কোন কালে॥

২.

তুমি এসো দয়াল, দেখ বেহাল,
কাঙাল বলে আমায় ফেলো না॥
সবাই গিয়েছে চলে আমায় ফেলে,
মানব কুলে কেউ নিলো না॥
কী হবে আমার গতি, চায় না কেহ আমার প্রতি,
আমার দুর্গতি কেউ দেখে না॥
আমি বসে ভাবি একা, কেউ নাই কো সখা,
কেউ দেয় না দেখা, আমি অভাগা একজনা॥
আমি কার কাছে যাই, কারে জানাই
আমার কেহ নাই দুনিয়ায়॥
বলে নিই আশ্রয়, পর করে সেইজনা॥
আমি কূলে বসে অকূল ভাবি, কার কাছে জানাবো দাবি,
আরজানের করলে পায়রবি, আজাদের এ দশা হতো না॥

৩.

মানুষ চিনলে মানুষ মিলে, এই মানুষে মানুষ আছে,
মানুষ রেখে কাছে, খুঁজিস মিছে দেশ-বিদেশ বেড়াস নেচে॥
এই মানুষ চিনে ধর, মানুষে মানুষ করছে বিহার,
যায়নি তোর মনের আঁধার, অবিশ্বাসে আছিস বসে॥
'সবার উপরে মানুষ সত্য', এই মানুষ শিব শান্তি,
মুছে ফেল আজাদ মনের ভ্রান্তি-আরজানের উপদেশে॥

www.pathagar.com

৪.
তুই কেন মরতে এলি গৌরপ্রেমের হাটে,
না বুঝে মুড়ালি মাথা তোর বুদ্ধি নাইরে ঘটে॥
গৌরপ্রেমের কত জ্বালা, বুঝবি তখন কত ঠেলা,
ছবি যখন মাতুয়ালা দুঃখ হবে তোর ললাটে॥
ওলো সখী মরি মরি, আমরা তোকে বারণ করি,
এখনই যা তুই ঘরে ফিরে, নইলে পড়বি সংকটে॥
গৌরপ্রেমের এমনি ধারা, হতে হবে সর্বহারা,
কলঙ্কিনী হবি তোরা, বেড়াবি পথে ঘাটে॥
গৌরপ্রেমের করে যে আশা, ঘর ছেড়ে বাঁধে জঙ্গলে বাসা,
আজাদ বলে তার থাকবে না দুর্দশা
যে মরতে এসেছে এই প্রেমের হাটে॥[১৯]

১৩. দবির শাহর গান

দবিরের কাজীপুরের মাঠপাড়া আখড়াবাড়ি থেকে শিষ্য তরিকুল ইসলাম ও কন্যা তহমিনার মাধ্যমে দবির রচিত কয়েকটি গান সংগ্রহ করা হয়। এ গানগুলো বিভিন্ন আখড়ায় পাল্লার গানে গীত হয়।

১.
পারি না বইতে পাপের তরী,
পাপীরে তরাও যদি, চরণ দাও হে দয়াল হরি।
তরীতে আছে যাত্রী ছয় জন
ছয় দিকে দেয় ছয়মত যাজন,
ঘোর দেখি থাকতে নয়ন
কোথায় রইলে হে কাণ্ডারি॥
জীর্ণ তরীর দশম পাড়া, খুঁজতে দেয় না কূল-কিনারা,
মাঝ দরিয়ায় ডুবাও ভারা, কেমনে দেব পাড়ি॥
পড়েছি তাদের কুমন্ত্রণে, থাকে না তরী নিয়ন্ত্রণে,
দবির বলে মোফাজ্জেল শাহ গুণে
এবার কিছু পেতে পারি॥

২.
দাও হে দয়াল আমায় চরণ তরী
ভবের ঘাটের ঝড় তুফান, যেন বইতে পারি॥
ভরা নদীর এমনি তুফান, দেখে আমার কাঁপে প্রাণ,
মরে বুঝি যাবো শ্মশান, কোথা রইলে মায়া করি॥
ভজন শূন্য পাপের ভাণ্ডার, জ্ঞানচক্ষু নাই দেখি আঁধার
নাহি আজ আমার নিস্তার, বাঁচালে বাঁচতে পারি॥

www.pathagar.com

ফেলে দাও যদি এ নিদানে ডুবে যাবো নদীর বানে
মোফাজ্জেল শাহর চরণে, দবির কয় ভক্তি করে॥[২০]

১৪. ঝড়ু শাহর গান

ঝড়ু শাহ-এর শিষ্য তৌহিদ সরকার-এর নিকট থেকে সংগৃহীত ঝড়ুর কয়েকটি গান :

১.
মন মুর্শিদ হয়ে দেখি মুরিদ করতেন।
কী কারণে এই তনে মুর্শিদ ভজার প্রয়োজন॥
কোন তন মুর্শিদের বলকা বলো
কোন মুর্শিদ হয়ে দাঁড়াল।
মনের মুর্শিদ কেবা হলো
বলো দেখি মহাজন॥
কোন তনে অক্ষদ ভাণ্ডার আছে
কী কী নাম বলো আমার কাছে
জাহের কি বাতন মাঝে
শুনবো মনের আছে ভ্রম॥
শুনেছি দেহের অবাক বিধান
সপ্তম মাসে মহামন্দ্র করে দান।
আবার কেন বায়েত বন্দির নাম
বল এহার বিবরণ॥
অজদ বিচে কয়টি আজাদ রয়
কোন অজুদের কি নাম হলো বলো মহাশয়।
দীন ঝড়ু বলে জোনাব চাঁদ সাঁই
খুলে বলো করে বর্ণন॥

২.
দেখ না খুঁজে অজদ মাঝে মুর্শিদ মূলাধার।
সেই জন্যে এ ভুবনে মুর্শিদ ভজার দরকার॥
মনের গুরু কল্পতরু শাস্ত্রে লেখা
সবার গুরু তিনি একা সেই চালায়
এ অজদ ভাণ্ডার॥
চারি তন আছে রে মন অজদ ভিতরে
লতিফা, কছিফ, বাকা, ফানা দেখ বিচারে।
এসব বলতে পারে খণ্ড খণ্ড করে
চেতন মুর্শিদ আছে যাহার॥

অন্যান্য সাধকদের মতো ঝড়ু শাহ মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ মনে করতেন। দেহের উপাসনাকে তিনি সর্বসার মনে করেছেন। তিনি বলেছেন :

www.pathagar.com

পাঁচটি আত্মা বেদান্তরে হয় লিখন
জীবাত্মা, ভূত আত্মা, আর আছে পরমাত্মা।
আত্মারাম আরো আত্মরামেশ্বর স্থানে
বসায়ে সৃষ্টি ধর॥
আত্মার সাধন আগে করো
পরমাত্মা হয় মূল ধারা-আরেক নাম তার হয় অধর
হাওয়াতে জল ফেরে
দ্বৈত-অদ্বৈত দেহ দুটি হয়॥
জীবাত্মা চতুর্দলে, ভূতাত্মা ষড়দলে-দশম দলে পরমাত্মা জানো,
দ্বাদশ দলে হৃদকমলে আত্মারাম।
ষোড়শ দলে পদ্ম পরে আত্মা রামেশ্বর বিরাজ করে
উজল স্থান সহস্রারে আহ্লাদিনী শক্তি ধরে॥

দেহতত্ত্বের আরেকটি গান :

কই হলো মোর তাস খেলা
বিবি দেখে আপ্ত সুখে হয়েছি বেভুলা॥
না জেনে খেলার ধারা, সাধের গোলাম গেল মারা,
করে অবহেলা॥
হাতে ছিল পিরাই দশ, সেও তো তাই নাই বশ,
টেক্কা কালুবালা॥
যখন খেলি রুইতন, হরতন, সব সময় করে হরণ,
হয়ে মাতুয়ালা।
সাধের ইস্কাপন, সদা সর্বক্ষণ, ঘটায় বিষম জ্বালা॥
ইস্তক কিস্তির খেলা হাতে, গুনে গুনে পিঠ তুলিতে,
হয়ে যায় আলাঝালা।
জোনাব চাঁদ কয় ঝডু পাগলার বুদ্ধি নাই এক তোলা॥

ঝডু শাহের তিরোধানের পর দেড় দশক পেরিয়ে গেছে, কিন্তু মেহেরপুরের আউল-বাউল সাঁই, দরবেশ এবং সংগীতপিপাসু মানুষ তাঁকে ভোলেনি। সাঁইজির গানের পাখি বেহাল শাহ, মকছেদ শাহ, খোদা বকসো শাহ, মহেন্দ্র গোসাঁইকে যেমন ভোলেনি, তেমনি ভুলবে না লালনে নিবেদিত জাতবাউল ঝডু শাহকে।[২১]

১৫. মাতু ফকিরের গান

মাতু ফকিরের পুত্র বান্টু বিশ্বাসের নিকট থেকে সংগৃহীত মাতু ফকিরের কয়েকটি গান :

১.

নিরাশ আধারে, গুরু তুমিই আশার আলো॥
তারাই গেল তরে অকূলও আঁধারে
(তুমি) যাহারে বেসেছ ভালো॥

www.pathagar.com

জগাই-মাধাই দুই পাষণ্ড তোমাকে ভাবিয়া ভণ্ড
কত কুকাণ্ড ঘটালো (গো)
তুমি মার খেয়েও দিয়েছ চরণ, তাইতো তরে গেল॥
না জানি কোন অপরাধে পায়নি তোমায় এত সেধে
খুশালো অন্তরে।
তোমায় পেতে কাঁদতে কাঁদতে জনম গেল॥
অপরাধ করেছি বলে তাই কী রাখলে দূরে ফেলে
অভিমান অন্তরে।
এবার হাতে পেলে ঝাঁটা ফেলে মারব নাকি বলো॥
মনসুর তুমি আশা দিলে কিঞ্চিৎ এই ভরসা,
আমার হতো ভালো,
ও তুই দেখ না চেয়ে খাবি খেয়ে মাহাতাব তোর মলো।
২.
গুরু প্রেম যে করেছে
সেই তো জানে কী আনন্দ
ভাগ্যে যার জোটেনি সে প্রেম
কি বলবো তার কপাল মন্দ॥
গুরু প্রেমে ইব্রাহিম আদহাম
ছেড়ে রাজ্য ছেড়ে বলক ধাম
তামিল করে সে গুরুর কাম
কিঞ্চিৎ ভুলে হয় নিরানন্দ॥
করে ফের বারো সাল দাস্যপনা
কেটে গেল তার ভুল ধারণা
গুরুর সাথে হয়ে ফানা
দুই দেহ হয় একই অঙ্গ॥
গুরু প্রেমে ওয়াসকরনী
ছেড়ে ঘর আর ঘরনি
তার পিঠে বাঁধা মা জননী
তবু ছাড়ে না গুরুর সঙ্গ॥
মাহাতাব হতভাগা
গুরুর দ্বারে নাই তার জাগা
বারে বারে দিয়ে দাগা
ভেঙে দিলো গুরুর প্রেম তরঙ্গ॥
৩.
আর কী আসবো দুনিয়ায়
কি ভাগ্যে এই মানবজনম এসেছি হেথায়॥

www.pathagar.com

কোথায় ছিলাম, এলাম হেথায়,
আমার তো আর কিছুই জানা নাই,
দেহ ছেড়ে যাবো কোথায়,
না জানি কোন বিছানায়॥
অজানা অচেনা পথে, কে আমায় নিয়ে যাবে সাথে,
আমি ভেবে ভয়ে ভীতে, না জানি মোর কি বা হয়॥
ভালো ভেবে করলাম কুকাজ,
(করেছি) গর্হিত অপরাধ, বুঝিলাম আজ।
বুঝে মাহাতাব কাঁদে সদায়,
আমার শেষ ফলাফল কি দাঁড়ায়॥

৪.

তুমি আর কতকাল দুঃখ দিবে হে আমায়,
ভবে এনে বারংবার॥
আমি কি কহেছি তোরে এই মানব আকারে
পাঠাও সংসার মাঝার॥
সকলেই এসেছি তোমারই ইচ্ছায়,
এখন কেন দেখাও নিকাশের দায়,
তখন মনে জেনে মিষ্টি করলে বান্দা সৃষ্টি
এখন কেন করো কষ্টি, একি তোমার অবিচার॥
পির-পয়গম্বর, ফেরেশতা-জিন, সকলের সাক্ষাতে,
অঙ্গীকার করেছ তুমি জানলাম কোরানেতে,
তুমি না বললে হতো না তাই শোন হে রাব্বানা,
এখন কেন লেখ গোনাহ, তোমার এ কোন বিচার।
অধম ও অজ্ঞানে, মাহাতাব তোর দীন হীনে,
মনসুর কি আছ এখানে, ঘুচাও মনের অন্ধকার॥

৫.

ধর্ম যদি সবই ধর্ম
অধর্ম আর থাকে না॥
কি করিলে হবে ধর্ম
এই মর্ম তো পেলাম না॥
কেউ কয়, ধর্ম নামাজ-রোজা
কেউ কয় বলি কালী পূজা
তাই ধর্ম গেল না বুঝা
আমার ধর্ম করা হলো না॥
কেউ কয়, ধর্ম ব্রহ্মচারী

www.pathagar.com

কেউ কয়, না হয় ত্যাজ্য নারী
কেবল গৌরাঙ্গ বললে হরি
ধর্ম বাকি থাকে না॥
কেউ কয় ধর্ম হজ্জ আর তীর্থে
কেউ কয় এসব ভ্রমণ মাত্র
কি করলে হয় ধর্ম সত্য
মাহাতাব তা বোঝে না॥

৬.

বায়ু বহ্নি জল মিলে তুমি অবতার
পেয়েছে এই মাটির দেহ, কেমনে কোথা হবা পার॥
পারের কথা ভাবছে ভোগে, অবতার পার এই ভোগ ত্যাগে,
দেহ লয়ে কোথায় যাবে, করেছ কি তার বিচার॥
পরের কথা ভাবতে বহুদূর, যে পারে আছ তুমি সেই পারই মধুর,
মম কেনুল ছাড়িয়া ওয়াজেবুল পেতে
করো সাধন এবার॥
যে পারে আছ তুমি এপার মম কেনুল,
ওয়াজেবুল প্রাপ্তি হলে পাবা অপর কুল,
মাহাতাব না বুঝে বিষয়, জগত দেখে অন্ধকার॥

মাতু ওরফে মাহাতাব ফকির গান বেঁধেছেন এবং গেয়েছেন সারা জীবন। তার গান শোনার জন্য আখড়ার শামিয়ানার নীচে রাতভর মানুষ জেগে থেকেছে। তিনি যে গান শুনিয়েছেন, সে গান দিলো জাগানো-মন ভোলানো, মানুষের গান, প্রেম-মহব্বতের গান, মানুষ হয়ে উঠবার গান। তার এই গানগুলো আমরা ধরে রাখতে পারিনি লিখিতরূপে। মেহেরপুর গাংনীর পথে-ঘাটে, আখড়া-আশ্রমে, সাধক-গায়কদের কণ্ঠে ও খেয়ো জীর্ণ খাতায় তার গানকে খুঁজে পাওয়া যায়।[২২]

১৬. মন্টু শেখের গান

সুফিধারার যে সকল সাধক বাউলগানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে মতিয়ার রহমান কাদেরিয়া ওরফে মন্টু শেখ অন্যতম। তাঁর জন্ম মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাধীন ছাতিয়ান গ্রামে। মন্টু শেখের পিতা নুরুল ইসলাম ছিলেন সচ্ছল কৃষক। ১৯৭৬ সালে মন্টু ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলাধীন উঁচাবাড়ি গ্রামের কাদেরিয়া তরিকার সাধক সৈয়দ জমির উদ্দীন আল কাদেরিয়ার নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। কাদেরিয়া তরিকার সাধকরা সংগীতানুরাগী না হলেও মন্টু শেখ সংগীতপিপাসু এবং কিছু গানও বেঁধেছেন। তাঁর গানে সুফিবাদ, দেহতত্ত্ব, লৌকিক আধ্যাত্মবাদ ও মারফতি তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এ গানগুলোকেও বাউলগানের পঙ্‌ক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মতিয়ার রহমান ওরফে মন্টু শেখের শিষ্য বামন্দীর ইলিয়াস হোসেন এবং নিশিপুরের বজলুর রহমান ছাতিয়ানের খানকায় বসে ১৭ আগস্ট, ২০১১ তারিখে হারমোনিয়াম

www.pathagar.com

এর সাথে ডুগি-তবলা, করতাল, ঝুমকি সহযোগে দুটি গান শোনালেন। গান দুটিতে উপরোক্ত ভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে

১.

অমরত্বের ফুল গুরু গো
কোথায় তার মূল
কোন কমতে খোয়াজ খিজির
পেয়ে গেল কূল॥
শুকালো মোর দেহের সরোবর
হল ধূ ধূ বালিচর
বারি বিনে হাহাকার অন্তর
পাব কি পারের পুল॥
ঐ ফুলের আশে যোগী বেশে
ঘুরি আমি দেশ বিদেশে
মোর বেলা শেষে হিসাব কষে
দেখি সবই তো ভুল॥
জাতি সমাজ বিবাদি স্বজন
কেমনে করব ভজন
মতির কুল গেল কলঙ্ক হলো
অনেকেরই চক্ষুশূল॥

২.

লবণাক্ত মিঠা দরিয়ায়
মতি প্রবাল পয়দা হয়
উভয় জলের স্রোত মিশে না
ওর মাঝে অন্তরায়॥
মিহির কিরণ সাদৃশ্য মদন
ফুটিল জ্ঞান নয়ন
দেখিব উজ্জ্বল বরণ
মতি বিনে রতি হারায়॥
আসমান হতে চন্দন বর্ষণ
ঝিনুকে পড়িলে রতন
সে ছাড়ে স্বদল প্রপঞ্চের জল
থাকে নিঝুম নিরালায়॥
নজর রেখ তেলওয়াত কালে
দেখ সুরা রহমানে
জমির সাঁইজি বলে মতি ভেঙে
ডুব দিয়া তোল তাই॥

www.pathagar.com

মেহেরপুরের বাউলগান মূলত বাংলাদেশের বাউলগানের পরম্পরার সাথে যুক্ত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে। এ অঞ্চলের বাউলগানের বাণী ও সুরে লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। কুষ্টিয়া উদিবাড়ির চিশতিয়া সিলসিলার সাধক মনসুর আল চিশতিয়ার বাণী, দর্শন, আধ্যাত্ম সাধনা মেহেরপুরের বাউলগানের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনপীঠ নবদ্বীপ এবং কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনকেন্দ্র কল্যাণীর ঘোষপাড়া মেহেরপুরের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় এ অঞ্চলের গান বৈষ্ণব ভাবধারা ও লালশশীর গান দ্বারা প্রভাবিত। বৈষ্ণব ভাবধারা এ অঞ্চলের বাউলগানে শিল্পসুষমা দান করেছে। এখানে বলা প্রয়োজন 'বৈষ্ণবরা একান্ত ভাবে প্রেমিক ও প্রেমসাধক ও বাউলেরা তাত্ত্বিক। বৈষ্ণবেরা পার্থিব ব্যাপারে উদাসীন। বাউলেরা কিন্তু জীবন, সমাজ ও পরিবেশ সচেতন। ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রীতির সুউচ্চ মিনারে বসেই বাউলেরা সাধনা করে। তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিকদের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সাম্য প্রেমের বাণী শোনায়।

প্রেম ও মানবিকতার ধারায় স্নাত মেহেরপুরের বাউলগানে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। এ গান এক সময় আখড়া-আশ্রমের সাধুরা সাধনসংগীত হিসেবে রচনা করতেন এবং গাইতেন, এখন তা মধ্যবিত্তের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে। ভাবুক চিত্ত এ গান শুনে তৃপ্ত হয়। অনেকেই ঘরোয়া পরিবেশে বাউলগান আয়োজন করছেন, সেখানে জাতবাউলেরা গান গাইছেন। বাউলগান গেয়ে আয়-উপার্জন করছেন, যা পূর্বে কল্পনা করা যেত না। এ ধরনের প্রয়াসকে অনেকেই বাউল দর্শন ও ঐতিহ্যের পরিপন্থি বলে মনে করেন। মেহেরপুরের বাউলগানের পদকর্তারা অধিকাংশই অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বাউল, আধুনিক শিক্ষার সাথে তাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। তবু তাদের গান নানা চড়াই-উতরাই-এর মধ্যে যেভাবে টিকে আছে এবং সাধারণ মানুষকে আন্দোলিত করে চলেছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

১৭. মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত গ্রামবাংলার মেয়েদের গান। মেয়েরাই এ গানের রচয়িতা এবং পরিবেশনকারী। পারিবারিক-সামাজিক বিভিন্ন উৎসব এবং নারীজীবনের নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই মেয়েলি গীতগুলো সাধারণত রচিত হয়ে থাকে। এক অর্থে এ গানে নারীজীবনেরই নানা অধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়। এই নানা অধ্যায়ের মধ্যে আবার প্রধান জায়গা জুড়ে আছে বিয়ের প্রসঙ্গ। বিবাহপূর্ব প্রস্তুতি যেমন-ঢেঁকিতে ধান ভানা, ক্ষীর-পায়েস-পাকান তৈরি, বর-কনের গোসল করানো, গায়ে হলুদ দেওয়া, মুখে ক্ষীর দেওয়া; অতপর বিয়ে এবং কনে-বিদায়, সবশেষে পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে শ্বশুরবাড়ির বৈরী পরিবেশে নিরানন্দ জীবনযাপন—নারী জীবনের অম্ল-মধুর আনন্দ-বেদনার মর্মনির্যাস থেকেই রচিত হয় মেয়েলি গীত। মেয়েলি গীতের ভাব-ভাষা-ছন্দ অত্যন্ত সরল ও অকৃত্রিম। কেবল মেয়েলি মনের নানাবিধ অনুভূতির স্বাভাবিক প্রকাশই এ গানের লক্ষ্য। সারা দেশের মতো মেহেরপুর জেলাতেও নানা প্রকার মেয়েলি গীতের প্রচলন রয়েছে। শহরে নয়, গ্রামেই

www.pathagar.com

বিবাহকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদিকে কেন্দ্র করে এই সব মেয়েলি গীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে। দিনে দিনে এই চর্চাও বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে। মেহেরপুরের মেয়েলি গীতকেও বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। আমরা সেদিকে না গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকটি মেয়েলি গীত তুলে ধরতে চাই।

ঢেঁকি মোঙ্গলানো গীত

বিয়ের আগে আছে 'থুবড়া দেওয়া' বা ক্ষীর খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। সেই ক্ষীর রান্নার জন্য চাউল (অসিদ্ধ চাউল বা আলো চাউল) প্রস্তুত করা উপলক্ষে ঢেঁকিতে ধান ভানার আয়োজন করা হয়। বিয়ের কনেকে ঢেঁকির উপরে বসিয়ে ধান ভানার সঙ্গে সঙ্গে দাদি, নানি, ফুপু, খালা, চাচি, বোন শ্রেণির আত্মীয়েরা যে গান সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করে, তাকে বলা হয় ঢেঁকি মোঙ্গলানো গীত। যেমন :

১. ছোট ছোট ধান মাদুলি
সোয়ামির গলেতে দেব যে
মন আমার বাঁধা আছে।
উলু কেশের গামছাতে ওহে,
গামছা যদি ছেঁড়ে ওহে দামাদ
চালান করব শিউলির দেশে
দেব সোয়ামির মুখেতে।

২. ওরে লাল মোলামের ঢেঁকি তোর
মাথায় সিঁদুর ওঠে
ওরে মাছ এনেছে বড় রুই
পাঁচ মেয়েতে কোটে।
লাল মোলামের ঢেঁকি
কুসুম কাঠের পোয়া
ভাসুর যদি তেমন হয়
ছ্যামায় ঢেঁকি পেতে দেয়। (ছ্যামা=ছায়া)

ক্ষীর খাওয়ানো গান

বিয়ের পূর্বের রাতে বর ও কনের নিজ পিত্রালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষীর-পাকান খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানকে স্থানীয় ভাষায় থুবড়ো খাওয়ানো অনুষ্ঠান বলা হয়। এ উপলক্ষে বাড়ির উঠোনে চৌকি পেতে বর বা কনের জন্য আসন তৈরি করা হয়। নতুন কাপড় বা পোশাক পরিহিত অবস্থায় বর বা বধূর আসন গ্রহণের পর আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী সবাই একে একে তাদের মুখে ক্ষীর-পাকান তুলে খাওয়ায়। এ উপলক্ষে পাত্র-পাত্রীর জন্য শুভকামনা করে নগদ বখশিসও প্রদান করা হয়। বিবাহপূর্ব এই অনুষ্ঠানে মহিলারা দলবদ্ধভাবে মেয়েলি গীত পরিবেশন করে থাকে। যেমন :

আলোয়ার চালে কাঞ্চন দুধে ক্ষীরোয়া পাকালাম
সেই না ক্ষীরোয়া খেয়ে ভারমি লেগেছে।

www.pathagar.com

কোথায় আছ বড় ভাবি পাকাও হালুয়ারে
কোথায় আছ বড় বুবু পাকাও ক্ষীরোয়ারে॥

গায়ে হলুদের গান

এ অঞ্চলের বিয়েতে 'গায়ে হলুদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বিবাহপূর্ব আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্ব এই 'গায়ে হলুদ'। উঠোনে স্থাপিত অস্থায়ী আসনে, বর বা কনেকে গায়ে হলুদের বিশেষ পোশাকে সাজিয়ে বসানো হয়। তারপর গায়ে হলুদ দেওয়া হয় এবং এ সময়ে মেয়েরা গায়ে হলুদের গান গাইতে থাকে। যেমন :

হলুদ বাটো হলুদ বাটো ওহে ভাবি
কাঁচা হলুদ আনো
ওই না হলুদ মাখাবো আমরা
চন্দন পাখির গায়ে ভাবি॥
আলতা আনো আলতা আনো ওহে ভাবি
রাঙা আলতা আনো
ওই না আলতা মাখাবো আমরা
চন্দন পাখির পায়ে ভাবি॥
মেন্দি আনো মেন্দি আনো ওহে ভাবি
রাঙা মেন্দি আনো
ওই না মেন্দি মাখাবো আমরা
চন্দন পাখির গায়ে ভাবি॥

বরপক্ষের 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠানে যে মেয়েলি গীত গাওয়া হয়, তার অংশবিশেষ এ রকম :

তেল হলুদ মেখে
চলে গেল রে দামাদ দিঘির ঘাট
চলে গেল রে দামাদ গঙ্গার ঘাট,
তেলের খুরি থুয়ে রে দামাদ
সালাম জানাল রে দামাদ
আপন শাশুড়ির পায়॥

কনেপক্ষের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় এমন গানের সংখ্যাই বেশি। 'গায়ে হলুদ' এর এই পর্বটি বরপক্ষ অপেক্ষা কনেপক্ষের কাছেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কনেপক্ষের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের আরো একটি মেয়েলি গানের উল্লেখ করা হলো :

এপার ওপার কুসুমের আড়া মধ্যে বেজপাড়া রে সখী
মধ্যে বেজপাড়া
এত রাতে মেন্দি বটে কারা রে সখী মেন্দি বাটে কারা॥
এত রাতে হলুদ কোটে কারা রে সখী, হলুদ কোটে কারা
সাতও ভাইয়ের বোনও রে যারা
হলুদ কোটে তারা রে সখী হলুদ কোটে তারা॥

www.pathagar.com

গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান সাধারণত পিতৃগৃহে এবং বাড়ির ভেতরেই হয়ে থাকে। আনুষ্ঠানিক এই হলুদ পর্বের বাইরেও নদীর ঘাটে সখীদের সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুকে মেতে গোসল করে বিয়ের কনে। সেখানেও থাকে মেয়েলি গীত। যেমন :

পঞ্চ সখী লইয়ারে চম্পারানি/যায় যমুনার জলে না হারে
ওই না জলে যায়রে চম্পারানি/গোসলও বানাইলো না হারে॥
হলুদ মাখাও মেন্দি মাখাও/যাইবো স্বামীর ঘরে না হারে॥
সাবান মাখাও তেল ওরে মাখাও/যাইবো শ্বশুরবাড়ি না হারে॥

বিয়ের পূর্বে বর-কনে উভয় পক্ষ পরস্পরের বাড়িতে নানাবিধ তত্ত্ব-উপাচার পাঠিয়ে থাকে। এই তত্ত্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ঘটক। তাই ঘটকের কাছেই যতো নালিশ, আবদার গানে গানে জানানো হয়। গানে বলা হয় :

উজিরের ধারে ধারে ছাঁচি পানের বরজা
কী কী এনেছ ঘটক, তাই আমারে বলো না॥
এনেছ সিঁথার সিঁদুর, নথ না হলে পরবো না
কী খ্যাপ ধরছে বিবি এবার দামাদ পারবে না॥
এনেছ নাকের নথ, দুল না হলে পরবো না
কী খ্যাপ ধরেছ বিবি, এবার দামাদ পারবে না॥
এনেছ কানের দুল, হার না হলে পরবো না
কী খ্যাপ ধরেছ বিবি, এবার দামাদ পারবে না॥
এনেছ গলায় হার, চুড়ি না হলে পরবো না
কী খ্যাপ ধরেছ বিবি, এবার দামাদ পারবে না॥
এনেছ হাতের চুড়ি, বিছা না হলে পরবো না
কী খ্যাপ ধরেছ বিবি, এবার দামাদ পারবে না॥
এনেছ মাজার বিছা, তোড়া না হলে পরবো না
কী খ্যাপ ধরেছ বিবি, এবার দামাদ পারবে না॥

কনে সাজানোর গান

বিয়ের পূর্বেই কনে সাজানোর পর্ব একটি অনিবার্য অধ্যায়। বাড়ির ভিতরে একটি পূর্ব নির্দিষ্ট ঘরে আসন পেতে কনে সাজানোর কাজ চলে। এ সময় কনের চারিপাশে আত্মীয়-অনাত্মীয় পাড়া-পড়শি মেয়েরা কনে সাজানোর গান গায়।

১. বাঁশলি বাঁশের বাঁশি বানালাম রে আমি
রেশমি সুতার ডুরা হায়রে রেশমি সুতার ডুরা।
কাল সকালে স্যাকরা বসাবো আমি
ঝালাইয়া নেব নথও রে॥
বার বাড়িতে স্যাকরা বসাব আমি
ঝালাইয়া নেব দুলও কি রঙিলা
ঝালাইয়া নেব দুল।
বার বাড়িতে স্যাকরা বসাব আমি
ঝালাইয়া নেব হারও কি রঙিলা

www.pathagar.com

ঝালাইয়া নেব হার ।
কাল সকালে স্যাকরা বসাব আমি
ঝালাইয়া নেব চুড়ি কি রঙিলা
ঝালাইয়া নেব চুড়ি ।
কাল সকালে স্যাকরা বসাব আমি
ঝালাইয়া নেব বিছারে রঙিলা
ঝালাইয়া নেব বিছা ।

২. নাকেও তো দিলাম নথ, নাকও তো মানালো
ওই নাক যে ফ্যাসুর ফুসুর করে কি হায়রে হায়॥
গলায় তো দিলাম হার, গলাও তো মানালো
ওই গলায় চিকন সুর ওঠে কি হায়রে হায়॥
হাতেও তো দিলাম চুড়ি, হাতও তো মানালো
ওই হাত যে বেলুন ঠ্যালা ঠ্যালে কি হায়রে হায়॥
মাজায় তো দিলাম বিছা, মাজাও তো মানালো
ওই মাজা হেলেদুলে পড়ে কি হায়রে হায়॥
পায়ে তো দিলাম নুপুর, পাও তো মানালো
ওই পা যে ঝুমুর ঝুমুর করে কি হায়রে হায়॥

এদিকে বরপক্ষেরও ব্যাকুলতার শেষ নেই । বরের গোসল, গায়ে হলুদ, সাজসজ্জা তো আছেই, তারও আগে নাপিতের কাছে চুল কাটানোর প্রসঙ্গ আছে। বরের মা-খালা-চাচির ইচ্ছে—নাপিত যেন তাদের ছেলেকে ভালো করে কামিয়ে দেয় । গানে গানে সেই কথা বলা হচ্ছে এইভাবে :

ভালো করে খেউরি কেটো নাপিত ওহে
ও নাপিত হে, ও নাপিত হে॥
ও নাপিত হে, ও নাপিত হে॥
তোমার হাতের বালা দান করিব ও নাপিত হে
ও নাপিত হে, ও নাপিত হে ।

বিয়ের পর শ্বশুরপক্ষের ঘরে ঘরে বরের কেমন সমাদর হতে পারে তার একটা সম্ভাব্যচিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মেয়েলি গীতে । কোন উপহার গ্রহণ করতে হবে, কোনটা গ্রহণে সতর্ক হতে হবে সে সব পরামর্শও গানে গানে দেওয়া হয়েছে । যেমন :

চাঁদ যাবে বিয়ে করতে কে কে যাবে সাথে চাঁদ,
সোনার চাঁদ মোর সকালে আইসো॥
তোমায় খেতে দেবে দুধ-কলা
চোখে দেখিয়া খাইও চাঁদ, নাকে শুকিয়া খাইও,
সোনার চাঁদ মোর সকালে আইসো॥

দাম্পত্য জীবনের গান

বিয়ের পর শুরু হয় দাম্পত্য জীবন ।

শ্বশুরবাড়ির নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নববধূর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা । এরই মাঝে অচেনা পরিবেশ ধীরে ধীরে চেনা হয়ে ওঠে । শাশুড়ি-ননদের গঞ্জনা শুরু

www.pathagar.com

হবার আগেই হয়তো দেবরের সঙ্গে গড়ে ওঠে সখ্যতা। দূর দেশের যাত্রী সাধের দেবরের সঙ্গে গানে গানে তার কথা হয় :

আমার জন্য আইনো দ্যাওরা এক জোড়া পাখি
ও দ্যাওরা তুমি কার লাগি।
থাকে যদি মনে আমি আনবো কিনে পাখি,
তোমাকে দেব না ফাঁকি।
ও দ্যাওরা তুমি কার লাগি॥
আমার বাপের বাড়ি যাবা কত মজা পাবা
বসতে দেবে চেয়ার ও বেঞ্চি।
ও দ্যাওরা তুমি কার লাগি॥
আমার বাপের বাড়ি যাবা কত কিছু খাবা
ঢেলে দেবে পান্তা ভাতে ঘি।
দেওরা তুমি কার লাগি॥
চাঁদেরও দাদি শাউড়ি সেও তো বড় ধ্যানী চাঁদ।
আপন শাউড়ি দেবে দান, হাত পেতে নিয়ো চাঁদ
সোনার চাঁদ মোর সকালে আইসো॥
চাচিশাউড়ি দেবে দান, দূরে ফেলে দিয়ো চাঁদ
সোনার চাঁদ মোর সকালে আইসো॥
মামি শাউড়ি দেবে গো দান, হ্যাঁচ্‌কা টানে নিয়ো চাঁদ
সোনার চাঁদ মোর সকালে আইসো॥

শ্বশুরবাড়ির নতুন পরিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে না উঠতেই নববধূকে ঠেলে পাঠাতে হয় সংসারের শতেক রকম কাজের মধ্যে। বাবার বাড়িতে যে সব কাজ করার অভ্যাস এবং অভিজ্ঞতা তার ছিল না, শ্বশুরবাড়িতে সেই সব কাজ করতে কষ্ট হয়, মা-বাবার কথা মনে পড়ে, কান্না পায়, মেয়েলি গীতে সেই বেদনাবিধুর ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন :

সোনায় বান্দা ঝাঁটা, না রুপোয় বান্দা ঝাঁটা, (বান্দা = বাঁধা)
ঝাড়ু দিতে মাজা ধরে রে দেওরা।
ও মায়ের দেশের মামা, না বাপের দেশের কাকা,
মাকে গিয়ে যেন বোলো নারে কাকা
ভাতও বাড়িতে মা কাঁদবে রে কাকা॥
বাপকে গিয়ে যেন বোলো নারে কাকা
লাঙল বহিতে বাপজান কাঁদবে রে কাকা॥
ও মায়ের দেশের মামা, না বাপের দেশের কাকা,
বোনকে গিয়ে যেন বোলো নারে কাকা
দরজায় হেলান দিয়ে বোন কাঁদবে রে কাকা॥
মায়ের দেশের কাকা, না বাপের দেশের কাকা

www.pathagar.com

ভাইকে গিয়ে যেন বোলো নারে কাকা
ভাই আমার বাজারে গিয়ে কাঁদবে রে কাকা॥

অথবা অন্য একটি মেয়েলি গানের শুরুতেই গোয়াল পরিষ্কার করার প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে :

কালো কালো কালোরে শ্যামলি লম্বা মাথার কেশ রে,
এক দিন যদি গোয়াল কাড়ে শ্যাম্‌লি
সাত দিন খায় না ভাত রে॥
গোয়াল কাড়তে যায়ি শ্যামলি
হাতও মাজোন করে॥

শ্বশুরবাড়ির বৈরী পরিবেশ থেকে মেয়েদের সাময়িক মুক্তি ঘটে বাপের বাড়ি বেড়াতে এলে। দিন ফুরিয়ে আসে, তবু সহসা আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু যেতে তো হয়ই শেষ পর্যন্ত। একা নয়, তখনো সে জিদ ধরে (বইছ্‌লি করে) মাকে বা ফুপুকে সঙ্গে নেয়ার জন্য। মেয়েলি গানে সেই ছবিই ফুটে উঠেছে। যেমন :

তেলও দিনু পোয়ারে পোয়া,
খুলুক দিনু সাথে রে
ভালো মানিকের ময়না রে
তাও তো মানিক বাইছ্‌লি করে
মাকে নেবে সঙ্গেরে॥
গাই দিনু জোড়া রে জোড়া
দুয়াল দিনু সাথে রে
ভালো মানিকের ময়না রে
তাও তো মানিক বইছ্‌লি করে
ফুপুকে নেবে সঙ্গে রে॥

[খুলু = ঘানিতে তেল প্রস্তুতকারী, বইছ্‌লি করা = জিদ ধরা, দুয়াল = গাভী দোহনকারী]

শ্বশুরবাড়ির আন্তরিকতাহীন পরিবেশে যে কোনো বাঙালি নারীই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আবিষ্কৃত হয় স্বামী লোকটিও অন্ধ, তখন তার বেদনার কোনো অবধি থাকে না। সে তখন আসমান-জমিন সর্বত্রই শুনতে পায় বেদনার বাদ্য। মেয়েলি গানে সেই বেদনা ফুটে উঠেছে :

বাদ্য বাজে আমার আসমানে,
বাদ্য বাজে আমার জমিনে
বাদ্য বাজে আমার নিশি কমলার দেশে না হারে॥
বিয়ে দিলি বাপজান কী কারণ
টাকা দিলি বাপজান নিদারুন
বিয়ে দিলি বাপজান ওই না কানার সাথে হারে॥
বিছিন পাড়তে আমার দেরি হয়
ধায়ে ধায়ে কানা মারতে যায়
তখন ঝরে আমার অরুণ চোখে জলও না হারে॥

www.pathagar.com

মনে বলে পঙ্খি হয়ে যাই
মনে বলে কাক হয়ে উড়ে যাই
দেখে আসি আমার বাবা মারও দেশে না হারে॥
দেখব দেখব আমার বাবা মারও মুখ না হারে॥

পুরুষশাসিত এই সমাজে নারীকে তবু পুরুষেরই মন যোগাতে হয়। প্রলুব্ধ করতে হয় নানা উপঢৌকনে উপাচারে। এ অঞ্চলের বেশ কিছু মেয়েলি গীতে সেই উপাচারেরই দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন :

আমি গেঁথেছি এ ফুলের মালা দুলাভাই, পরাব তার গলে॥
সিঁথার মানান মটক-জবার মালা গেঁথে পরাব তার গলে।
গায়ের মানান শার্টও দেব গায়ে পইরি যেয়ো
উড়কা ধানের মুড়কা দেব ফাকাতে ফাকাতে খেয়ো।
রাস্তার মানান হুণ্ডা গো দেব তাতে চইড়ি যেয়ো
জবা ফুলের মালা আমি পরাব তার গলে।
পায়ের মানান জুতা দেব পইরি তুমি যেয়ো
বিনা সুতার মালা গেঁথে পরাব তার গলে॥

স্বামীর বিরহ বাঙালি নারীকে চিরদিনই উন্মনা করেছে। মিলন প্রত্যাশায় আকুল হয়ে সে পথ চেয়ে থেকেছে। আর এরই মাঝে ব্যথাদীর্ণ হৃদয়ে নিজের ত্রুটিগুলো খুঁজতে চেষ্টা করে, স্বামীর ঘরে না আসার কারণ অনুসন্ধান করে। গানে গানে ফুটিয়ে তোলে ব্যথাতুর বক্ষে মর্মরিত হাহাকার। যেমন :

বাঁশি না বাজে সিকানা সিকানা
হায়রে আমার বাঁশি আর বাজে না।
বাজে না বাজে না বাজে না॥
তেলও না পরিলাম সিঁদুরও না পরিলাম
ঘরে কেন স্বামী আইলো না॥
নথের পয়সা কেন দিলা না
পাশা না পরিলাম, নথও না পরিলাম,
স্বামী যেন ব্যাজার হয় না॥
আমি হারও না পরিলাম, বিলাউজ না পরিলাম,
দেওরা যেন ব্যাজার হয় না।
শাড়ি না পরিলাম, শায়া না পরিলাম,
স্বামী যেন ব্যাজার হয় না॥
হিলও না পরিলাম, তোড়া না পরিলাম
স্বামী যেন ব্যাজার হয় না॥

পরকীয়া প্রেমের গান

দিনের পর দিন স্বামীর জন্য প্রতীক্ষার পর প্রতীক্ষা বিরহী নারীকে সন্দেহপরায়ণ করে তোলে। সে তখন অতি সহজেই পরকীয়া প্রেমের গন্ধ খুঁজে পায়। চন্দ্রাবতীর ঘরে রাত

www.pathagar.com

কাটিয়ে আসার কারণে কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার মনে যে অনুযোগ জমা হয়েছিল, তারই প্রতিফলন দেখা যায় অতি সাধারণ বিরহী নারীর ক্ষেত্রেও। সেই নারী কত সহজেই গানে গানে বলতে পারে—

তুমি কার মহলে রাত করেছ ভোর
ও শহুরে সওদাগর॥
চোখে আছে কাঁচা ঘুমের ঘোর
ও শহুরে সওদাগর॥
তোমার মুখে দেখি ছাচি পানের বোর
ও শহুরে সওদাগর॥
তোমার কোমরে দেখি চাবি আঁটা ডোর
তুমি কার মহলে রাত করেছ ভোর
ও শহুরে সওদাগর॥

কুলবধূকে নানান ছল করে ঘর সামলাতে হয়। শ্বশুর-শাশুড়িকে বুঝানো, দেবর-ননদকে বুঝিয়ে ওঠা, আর এই বুঝানোর জন্য তাকে নানা কিছু উপহার-উপঢৌকনও দিতে হয়। এভাবে সব দিক সামলানোর অভিনব কৌশল নিয়েও এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে মেয়েলি গীত। সে গানে বলা হয়েছে :

কাঁচেরও কলস বাপজান শান বাঁধানো ঘাটে রে
উছাড় লাগিয়া কলস ভাঙ্গিল রে।
বৌ মালারে কাঁচের কলস আমার ভাঙ্গলো ক্যামনে॥
শ্বশুরকে বুঝালাম হুঁকা, তামাক দিয়া রে
শাশুড়িকে বুঝাব আমি ক্যামনে॥
শাশুড়িকে বুঝালাম পানের বাটা দিয়া রে
ভাসুরকে আমি বুঝাবে ক্যামনে॥
ভাসুরকে বুঝালাম লাঙল গরু দিয়া রে
জাকে বুঝাব আমি ক্যামনে
জাকে বুঝাব আমি পাটানোড়া দিয়া রে
দেওরকে বুঝাব আমি ক্যামনে
বৌ মালারে কাঁচের কলস আমার ভাঙ্গলো ক্যামনে॥
দেওরকে বুঝাব আমি খাতা কলম দিয়ে
ননদকে বুঝাব আমি ক্যামনে।
ননদকে বুঝাব আমি কোচের ভুজু দিয়ে রে [ভুজু = মুড়ি]
স্বামীকে বুঝাব আমি ক্যামনে।
স্বামীকে বুঝাব আমি হাতের বাঁশি দিয়া রে॥

স্বামী যদি ব্যবসায়ী হয়, বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তাকে ঢাকা-পাবনা-কুষ্টিয়া নানা জায়গায় যেতে হতেই পারে। কিন্তু স্বামীর এই সাময়িক অনুপস্থিতির বিরহকাল গৃহবধূর জন্যে হয়ে ওঠে দুঃসহ। তাই গানে গানে সে দাবি জানায়—স্বামীকে আর বাইরে যেতে দেবে না।

www.pathagar.com

তুমি রাজা ঢাকাইলি ব্যাপারী, কতদিন আসোনি ঘরে
সিঁথাতে তেল দিয়ে নাগরও ভুলাবো
স্বামী যাইতে দেব না আর॥
তুমি রাজা পাবনার ব্যাপারী কতদিন আসোনি ঘরে
নাকের নথ দিয়ে নাগরও ভুলাবো
স্বামী যাইতে দেব না আর॥
তুমি রাজা কুষ্টিয়ার ব্যাপারী কতদিন আসোনি ঘরে
পরনের শাড়ি দিয়ে নাগরও ভুলাবো
স্বামী যাইতে দেব না আর॥[২৩]

তথ্যনির্দেশ

১. ড. আনোয়ারুল করিম, বাউল কবি লালন শাহ, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৩২-৩৩
২. ড. মালাধর বসু, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, কলিকাতা ১৩৫৭, পৃ. ৫২৯
৩. ড. আনোয়ারুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০
৪. ড. আনোয়ারুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৫. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গবীণা, কলিকাতা-১৩৬০, পৃ. ৪৫১
৬. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, হারামনি, ঢাকা ১৩৮৩ পৃ. ১
৭. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলকাতা, পৃ. ২৮৩
৮. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ১২৯-১৩০
৯. কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৩৫১
১০. আব্দুল মান্নান (৪২), পিতা : মজিব মীর, পেশা : কোর্ট মহুরি, মেহেরপুর সরকারি কলেজপাড়া, মেহেরপুর, তারিখ : ২০.১২.২০১১, সময় : বিকাল ৩টা
১১. আসকার আলী (৫৫), পিতা : নেঙ্গু শেখ, পেশা : কৃষিকাজ, বেলতলাপাড়া, মেহেরপুর, তারিখ : ২১.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০.০০টা
১২. মো. আনিস আলী খান (৪০), পিতা : মকবুল খান, পেশা : জেলে, শ্যামপুর,মেহেরপুর, তারিখ : ২৪.১১.২০১১, সময় : বিকাল ৪.০০টা
১৩. শৈলেন হালদার (৬২), পিতা : নিবারণ হালদার, পেশা : জেলে, মালোপাড়া, মেহেরপুর, তারিখ : ২৫.১১.২০১১, সময় : রাত ৯.০০টা
১৪. ছাদিমান দরগাই (৮৫), পিতা : খবির উদ্দীন দরগাই, পেশা : কৃষিকাজ, বাগোয়ান, মুজিবনগর, মেহেরপুর, তারিখ : ২৫.০৮.২০১১, সময় : সকাল ১০.০০টা
১৫. চণ্ডিচরণ হালদার (৬৫), পিতা : নিত্য গোপাল হালদার, পেশা : জেলে, চাঁদবিল, মেহেরপুর, তারিখ : ৩০.০৮.২০১১, সময় : রাত : ৮.০০টা
১৬. মিনহাজ উদ্দীন (৪০), পিতা : আলম হোসেন, পেশা : কৃষিকাজ, মায়ামারী, মেহেরপুর, তারিখ : ০৫.০৯.২০১১, সময় : রাত ৯.০০টা
১৭. মসলেম আলী শেখ (৬০), পিতা : আব্দুল কাদের শেখ, পেশা : কৃষিকাজ, সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর, তারিখ : ১১.১১.২০১১, সময় : সকাল ৯.০০টা

www.pathagar.com

১৮. মালেক ফকির (৪০), পিতা : মকবুল শেখ, পেশা : কৃষিকাজ, ঠিকানা : পৌর কলেজপাড়া, মেহেরপুর। তারিখ : ১৯.০৭.২০১১, সময় : সকাল ১০.০০টা
১৯. গোলাম হোসেন মাস্টার (৬০), পিতা : শহীদ এমলাক হোসেন, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : সাহারবাটি, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর। তারিখ : ১৭.০৮.২০১১, সময় : সকাল ১১.০০টা
২০. জামাল শাহ (৮৫), পিতা : রতন শেখ, গ্রাম : ক্যাশবপাড়া, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ২৮.০৭.২০১১, সময় : সকাল ৯.০০টা
২১. তৌহিদ সরকার (৪১), পিতা : খয়ের উদ্দীন শেখ, পেশা : গায়ক, গ্রাম : চাঁদবিল, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ১০.০৮.২০১১, সময় : রাত ৮.০০টা
২২. বান্টু বিশ্বাস (৫৮), পিতা : মাতু ফকির, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : আকুবপুর, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর। তারিখ : ০৫.০৮.২০১১, সময় : সকাল ১০.০০টা
২৩. মিনা পারভীন (৫০), পিতা : ডা. আব্দুল মান্নান, পেশা : চাকরি, ঠিকানা : টুঙ্গী, গোপালপুর, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ২৭.১১.২০১১, সময় : বিকাল ৪.০০টা

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

মানব জীবনে সংগীতের প্রভাব অপরিসীম। সংগীত মানুষকে বীররস, আনন্দরস, করুণরস, শৃঙ্গাররসে সিক্ত করে। চিত্তে এনে দেয় অপার্থিব সুখ। সংগীতের মূল উদ্দেশ্য হলো মানব মনে সৌন্দর্য বোধ জাগানো। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য যেহেতু গাণিতিক, তাই সংগীত পরিবেশনার ক্ষেত্রেও সুশৃংখল ও গাণিতিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়। আর তা করতে গিয়ে সংগীতে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বাদ্যযন্ত্রের তাল, লয় সংগীতের সুরে শৃংখলা এনে দেয়। কেবল সংগীতে নয় নাচেও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সংগীত ও নৃত্য ছাড়াও পূজা-পার্বণ, উৎসব, শোভাযাত্রা, যুদ্ধযাত্রা, সরকারি ঘোষণাজারি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগ করা হয়। হিন্দুর মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রপাঠের সময় ঢাক, ঘন্টাধ্বনি আবশ্যক। কোনো কোনো সময় শঙ্খও প্রয়োজন হয়। খোলো-করতাল-মন্দিরা ছাড়া কীর্তন কিংবা নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান জমে না। প্যাগোডা ও চার্চেও ঘন্টাধ্বনি দিয়ে প্রার্থনার সময় ঘোষণা করা হয়। বাউলের আখড়ায় গানের আসরে একতারা, দোতারা, জুড়ি, খমক, ডুগি আবশ্যক। মহরমের তাজিয়া মিছিলে ঢোল, কাঁসর বাজানো হয়। হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠানেও বাদ্যযন্ত্র আবশ্যক, কারণ তারা সংগীতকে পবিত্র বলে মনে করে। ঢাক, ঢোল, কাঁসর, সানাই ছাড়া হিন্দুর বিবাহ শুভ হয় না বলে তারা মনে করে। শোভাযাত্রার মতো শবযাত্রাতেও হিন্দুরা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। খোলো-করতাল বাজিয়ে নামকীর্তন করতে করতে তারা শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যায়। পৃথিবীর সব আধুনিক রাষ্ট্রেই যুদ্ধের ময়দানে যোদ্ধারা বাদ্যযন্ত্র বাজায়। বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে যোদ্ধাদের রক্তে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগানো হয়।

জীবন, জীবিকা ও পেশার সাথেও বাদ্যযন্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে। বাঁশি বাজিয়ে সাপখেলা, ডুগডুগি বাজিয়ে বানরখেলা দেখায় সাপুড়ে ও বানরওয়ালারা। ফেরিওয়ালারা ঘন্টি বাজিয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলমান ফকিররা একতারা বাজিয়ে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীরা জুড়ি বাজিয়ে ভিক্ষা মাঙে বাড়ি বাড়ি। মুসলমানদের মধ্যে চিশতিয়া তরিকার সাধকরা বাদ্যযন্ত্রের সাথে সংগীত অনুশীলনকে ইবাদতের অংশ মনে করে। বাংলাদেশে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে কিছু লোকজ এবং কিছু পাশ্চাত্য থেকে আনা হয়েছে। যে সকল বাদ্যযন্ত্রের গঠন প্রণালী সহজ এবং সাধারণ মানুষ তৈরি ও ব্যবহার করতে পারে সে গুলিই লোকবাদ্যযন্ত্র। বাংলার লোকবাদ্যযন্ত্র গুলির বস্তু উপকরণ হলো—লাউ, বাঁশ, কাঠ, নল, পাতা, শাঁখ, নারকেলের মালা প্রভৃতি। এছাড়াও গরু-ছাগলের চামড়া, মাটির ছোট হাঁড়ি প্রভৃতিও উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের লোকবাদ্যযন্ত্রের সাথে মেহেরপুরের লোকবাদ্যযন্ত্রের তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। সাধারণত গায়কেরাই এসব বাদ্যযন্ত্র তৈরি করে থাকে। বাউলগানে একতারা-দোতারা, কীর্তনে ষোলো-করতাল, জারিগানে ঢোল-খোল-করতাল, লাঠিখেলায় ঢোল-কাঁসর, বিবাহে সানাই ব্যবহৃত হয়। মেহেরপুর জেলায় যে সকল লোকবাদ্যযন্ত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবে পরিলক্ষিত হয় তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

একতারা

এক তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রকে একতারা বলা হয়। বাউল, বৈরাগী, মুসলমান ফকিররা একতারা বাজিয়ে গান গায়। আখড়া, আশ্রমে সাধকরা একতারা বাজিয়ে তন্ময় হয়ে সুরের সাথে গান করে। মেহেরপুর বাউল ভাবাপন্ন অঞ্চল হওয়ায় একতারার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আখড়া ছাড়া ভিক্ষা করার সময়ও বাউলরা একতারা বাজিয়ে গান করে। একতারার গঠন প্রণালী যেমন সহজ, তেমনি এর উপকরণও সাধারণ।

উপকরণ

নারকেলের মালা বা কাঠের খোল, বাঁশের বাতা বা ডাঁটি, তার ও চামড়া একতারা তৈরির মূল উপকরণ বস্তু। উপকরণ ও আকৃতি ভেদে একতারা চার প্রকার হয়ে থাকে। যথা—লাউ, গোপীযন্ত্র, থুনথুনে ও একতারা।

প্রযুক্তি প্রণালী

একতারার 'বস' বেল, লাউ বা নারকেলের মালা দিয়ে বানানো হয়। চামড়া দিয়ে মালার অর্ধেকের চেয়ে অধিক অংশ ছেয়ে দিতে হয়। একটি লাঠি মালার সাথে বেঁধে দিতে হয় যাতে ওড়ং এর মতো লাগে। এরপর লাঠির নীচ থেকে একটি তার চামড়ার মাঝ দিয়ে লাঠির মাথার 'কানের' সাথে বেঁধে দেওয়া হয়।

দোতারা

একতারার মতোই জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র দোতারা। বাউলগানের পেশাদার গায়করা প্রায় সবাই দোতারা বাজিয়ে গান পরিবেশন করেন। বাদ্যযন্ত্রটির নাম দোতারা হলেও চার অথবা ছয়টি তার-এর সমাহারে এটি তৈরি। মেহেরপুর অঞ্চলে বাউলগান, পালাগানে দোতারার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। দোতারাবাদক হিসেবে মেহেরপুরের বাউলসাধক ও সুগায়ক গোলাম ঝড়ু শাহর বিশেষ খ্যাতি ছিল।

ঢোল

গানের আসর, নাচের মঞ্চে, বিবাহ-উৎসব, শোভাযাত্রায়, পূজাপার্বণ, লাঠিখেলায়, কুস্তিতে ঢোলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। হিন্দুর পূজামণ্ডপ ও বিবাহ-উৎসব ঢোল ছাড়া কল্পনা করা যায় না। মেহেরপুর জেলার প্রায় সব গ্রামে লাঠিয়াল বাহিনী থাকায় এ অঞ্চল ঢোলের পরিচিতি ও ব্যবহার ব্যাপক। জারিগান, কবিগান, সরকারি ঘোষণা জারির ক্ষেত্রে ঢোল ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

কাঁসি

কাঁসার তৈরি এই বাদ্যযন্ত্রটি মুসলমানরা লাঠিখেলায় এবং হিন্দুরা পূজামণ্ডপে মাঙ্গলিক কাজে বাজায়। এটি দেখতে অনেকটা পানের বাটার মতো। কাঁসির গায়ে ফুটো করে দড়ি বাঁধা হয়। বাম হাতে দড়ি ধরে ডান হাতে কাঠি দিয়ে কাঁসি বাজানো হয়। মেহেরপুর জেলায় লাঠিখেলায় এ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়।

জুড়ি বা মন্দিরা

বাউলগানের পরিবেশনায় জুড়ির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কাঁসার তৈরি দুটি বাটি দু হাতে ধরে মৃদু টোকা বা আঘাত দিয়ে সুর সৃষ্টি করা হয়। জারিগানের তাল লয় ঠিক করতে ঢোলকের সাথে জুড়ি বাজানো হয়।

করতাল

কীর্তনগানে করতাল ব্যবহার করা হয়। এটি জুড়ির চেয়ে আকারে বড় কিন্তু বাজানোর পদ্ধতি এক রকম। করতাল পিতল দ্বারা তৈরি করা হয়।

ঢাক

ঢাক একটি বাদ্যযন্ত্র। হিন্দুর পূজামণ্ডপে ঢাক বাজানো হয়, সঙ্গে থাকে কাঁসি। ঢাক বেশ বড় বাদ্যযন্ত্র হওয়ার কারণে বাম কাঁধে নিয়ে দুহাতে দুটি কাঠি দিয়ে আঘাত করে বাজাতে হয়। এ অঞ্চলে কেবলমাত্র পূজামণ্ডপেই ঢাকের ব্যবহার দেখা যায়।

মৃদঙ্গ

মৃদঙ্গের বাজনা ছাড়া কীর্তনের আসর জমে না। মৃদঙ্গের সাথে করতাল ও মন্দিরাও বাজানো হয়। বাউলগানেও মৃদঙ্গের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মৃদঙ্গের খোল মাটির তৈরি যা পুড়িয়ে নিতে হয়। খোলের দুমুখে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। এর ডান অংশের মুখ ছোট আর বাম অংশের মুখ অপেক্ষাকৃত বড়। মৃদঙ্গের দুদিকে ফিতা দিয়ে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে খালি হতে বাজাতে হয়। এ অঞ্চলের বাউল ও কীর্তনীয়ারা আসরে মৃদঙ্গ ব্যবহার করে।

শঙ্খ

শঙ্খ কোনো সংগীতে ব্যবহার করা হয় না। হিন্দুরা তাদের সকল অনুষ্ঠানে শঙ্খ বাজায়। মন্দিরে আরতি দেওয়ার সময় শঙ্খ বাজানো হয়।

গাবগুবাগুব বা খমক

মেহেরপুর জেলার জনপ্রিয় লোকবাদ্যযন্ত্রের মধ্যে খমক অন্যতম। বাউলগানে খমক বাজানো হয়। সাধুসঙ্গের গানের পালায় খমক বাজানো হয়। মেহেরপুর জেলায় খমকের আঞ্চলিক প্রতিশব্দ 'গাবগুবি'। শূন্যপুরাণ, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে 'খমক' সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সারিন্দা

দোতারার মতো সারিন্দার ব্যবহার এ জেলার পালাগান, কবিগান, বিচারগানের আসরে পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদি-মারফতি গানেও গায়করা সারিন্দা ব্যবহার করে। চামড়া, তার, কান, ঘোড়া, ফেসি প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে সারিন্দা তৈরি করা হয়। সারিন্দার জন্য দোতারার মতো একটি কাঠের কাঠামো লাগে। সাধারণত ছড় দিয়ে ঘর্ষণ করে সারিন্দা বাজানো হয়। মাঝে মাঝে 'রজন' দিয়ে ছড় মেজে নিতে হয়। অন্যথা সারিন্দা বাজানো যায় না। সারিন্দায় তিনটি তার থাকে। এগুলো বলা হয়—ব্বাম, সুর ও জিল।

বাঁশি

বাংলাদেশের সব জেলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্র বাঁশি। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই বাঁশি বাজিয়ে আনন্দ পায়। রাখালেরা গরু চরায় বাঁশি বাজিয়ে। বাউল, কীর্তনসহ সকল লোকসংগীত পরিবেশনায় বাঁশি ব্যবহার করা হয়। যাত্রাপালা ও নাটকেও বাঁশি বাজানোর প্রয়োজন হয়। বাঁশির উপকরণ খুবই সহজলভ্য—তরলা বাঁশ। তবে বাঁশের বাঁশির লোকপ্রিয়তা অতুলনীয়। বাঁশি তৈরির সময় বাঁশের একদিকে গিঁট রেখে কাটতে হয় যাতে তা বন্ধ থাকে। অপর প্রান্ত উন্মুক্ত রাখতে হয়। বাঁশিতে ছয়টি ফুটো থাকে। বাম ও ডান হাতের তিনটি করে আঙুল ফুটোর ওপর রেখে বাজানো হয়। বাজানোর সময় আঙুলগুলি ওঠানামা করাতে হয়। আড়াআড়িভাবে ঠোঁট রেখে বাঁশিতে ফুঁ দিতে হয়। মেহেরপর জেলায় আড়বাঁশির প্রচলন বেশি। যাত্রাপালা, কবিগান, বাউলগান, কীর্তনের আসরে গায়ক ও শিল্পীরা আড়বাঁশি ব্যবহার করে। আঁড়বাশি ছাড়া পাতাবাঁশি, মুখবাঁশির ব্যবহার এ জেলায় রয়েছে।

ডুগডুগি

সাপুড়ে, বেদে, বাজিকরেরা সাধারণত সাপখেলা, বানরখেলায় ডুগডুগি ব্যবহার করে। কাঠের খোলের দুপাশে চামড়ার ছাউনি দিয়ে ডুগডুগি বানানো হয়। এর মাঝে সুতা বাঁধা হয় এবং সুতার মাথায় লোহার গুলি জড়ানো হয়। খোলের মাঝখানে ধরে নাড়ালে গুলি দুটি উভয় পাশের চামড়ার সাথে আঘাত খেয়ে ডুগডুগ ধ্বনি ওঠে। জেলার সাপখেলা ও বানরখেলায় ডুগডুগির ব্যবহার দেখা যায়।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

বারো মাসে তেরো পার্বণের বাংলাদেশে প্রত্যেক ঋতুতেই থাকে নানা সব উৎসব। এসব উৎসবের কোনোটা ঋতুভিত্তিক আবার কোনোটা ধর্মকেন্দ্রিক। নবান্ন, পৌষপার্বণ, বসন্ত উৎসব, পহেলা বৈশাখ মূলত অসাম্প্রদায়িক ও লৌকিক উৎসব। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, কাত্যায়নী পূজা, কালী পূজা, চৈত্র সংক্রান্তি, বৈশাখ সংক্রান্তি প্রভৃতি ধর্ম ভিত্তিক উৎসব হলেও এগুলো এক পর্যায়ে লৌকিক রূপ ধারণ করে লোকউৎসবে পরিণত হয়। রাজনৈতিক উত্থান-পতন, পালাবদল, মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণে অনেক উৎসব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে কিছু উৎসব টিকে আছে রূপান্তরিত হয়ে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের ফলে হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করায় এসব লোকউৎসবের সংখ্যা কমে গেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোকউৎসব রয়েছে। যেমন পির দরবেশের ওরস ও মহরম আশুরা। নিষ্ঠাবান মুসলমানরা এসব উৎসব পছন্দ করে না, তথাপি টিকে আছে। নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও উৎসাহে এসব উৎসব টিকে আছে কালের ঘাতকে সহ্য করে।

বাঙালির যাপিত জীবনের সাথে মেলার সম্পর্ক বহুকালের। এক সময় কোনো না কোনো উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সারা বছর ধরেই গ্রামে গ্রামে মেলা বসত। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, ধর্ম সম্পর্কিত মূল্যবোধের পরিবর্তন সত্ত্বেও বিভিন্ন মেলা তার নিজস্ব ঐতিহ্য এবং জৌলুস হারিয়েও টিকে আছে। নানা সংকট সত্ত্বেও বিসিকের জরিপ অনুসারে বাংলাদেশে ১০০৫টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ মেলাই গ্রামীণ মেলা। বিভিন্ন উপলক্ষ, ব্রত-পার্বণ, সাধু-দরবেশের জন্মমৃত্যু দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে সারা বছর ধরেই এসব মেলা হয়। কোনো মেলা একদিন স্থায়ী হয়, আবার কোনো মেলার স্থিতিকাল এক সপ্তাহ থেকে এক মাস পর্যন্ত। মেলার স্থান হিসেবে গুরুত্ব পায় নদীর তীর, গ্রামের বট-পুকুড়তলা, মন্দির প্রাঙ্গণ, সাধু-দরবেশদের সাধনপীঠ, দরগা, মাজার, তীর্থস্থান। খেলার মাঠ, স্কুল-কলেজপ্রাঙ্গণেও মেলা বসে থাকে। মেলা ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও পরবর্তীতে তা ধর্মনিরপেক্ষ রূপ লাভ করে। কারণ সব মেলার উৎসমূলে কাজ করে অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনা, উৎসব-আনন্দ আর ব্যবসায়িক মুনাফা ও সফলতা।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মেলা ধর্মীয় পালা-পার্বণ উপলক্ষে বসে। রথযাত্রা দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা, চৈত্র সংক্রান্তি, শিবপূজা, কালীপূজা, শারদীয় দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী এবং সাধু-দরবেশ-ফকিরদের আবির্ভাব ও তিরোধান দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন মেলা বসে। রথযাত্রা উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা বসে। এর মধ্যে ধামরাই,

www.pathagar.com

কাটিয়াদি ও কুষ্টিয়ার রথ উৎসব ঐতিহ্যবাহী। মেহেরপুর নায়েববাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে রথযাত্রা উপলক্ষে বসত বিশাল মেলা। এখন আর মেলাটির সেই জৌলুস নেই।

জগন্নাথ দেবের স্নান উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা হয়। নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গলবন্দের স্নানযাত্রা সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও জৌলুসপূর্ণ। অবিভক্ত নদীয়ায় মেহেরপুর মহকুমার মুরুটির গ্রামের স্নানযাত্রায় জগন্নাথের মেলা, কালীগঞ্জের মহরাপুরে স্নানযাত্রার মেলা বসে। দোলপূর্ণিমায় সাধু-বাউলদের মেলা ও সঙ্গ হয় সবচেয়ে বেশি। দোলপূর্ণিমার অপার্থিব জ্যোৎস্নায় সাধু, দরবেশ, ভাবুকদের চিত্ত এক অভূতপূর্ব আনন্দে জেগে ওঠে। দোলপূর্ণিমায় কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় বসে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় মেলা। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ার লালন-উৎসব, গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে হরি ঠাকুরের মেলা এই দোলপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাতে অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর শহরের মালোপাড়ায় বলরাম হাড়ির আখড়ায় বারুণীর মেলা হয় এই দোলের সময়। নদীয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২)। এ মেলা বসে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির চকের মাঠে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। মেহেরপুরের ইছাখালিতে দুবাংলার বাউলরা আয়োজন করে বাউলসাধক আরজান শাহের স্মরণে 'আরজান মেলা।'

ধর্মীয় মেলার পাশাপাশি সুফিসাধকদের ওরস এবং সাধু-ফকিরদের জন্ম তিরোধান দিবস উপলক্ষে মেলা বসে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার গোলাপনগরের মেলা, রাজশাহীর প্রেমতলির মেলা, মাইজভাণ্ডার শরিফের মেলা, মহাস্থানগড়ের শাহ সুলতান মেলা, নরসিংদীর বাউল ঠাকুরের শাহ সুলতান মেলা, নরসিংদীর বাউল ঠাকুরের মেলার নাম উল্লেখযোগ্য। মেহেরপুরে এ ধরনের মেলার মধ্যে তারানগরের মাদার পিরের মেলা, কালাচাঁদপুরের শাহ ভালাই-এর মেলা, যাদুখালীর লাফা সাধুর মেলা উল্লেখ করা যায়। এ জেলার বাউলমেলা হয় না, কিন্তু সাধুসঙ্গ উপলক্ষে আখড়াবাড়ি মেলার রূপ পায়। সদর উপজেলার ফতেহপুরের দৌলত শাহর মেলা, যাদবপুরের কালি শাহের মেলা, টেঙ্গারমাঠের আতাহার শাহের মেলা, গাংনী উপজেলা কাজীপুরের দবির উদ্দীন শাহের মেলা, সাহারাবাটী মানবআশ্রমের আজাদ শাহের মেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে হয় চড়ক পূজোর মেলা। এ উপলক্ষে মেহেরপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির প্রাঙ্গণে বসে চৈত্র সংক্রান্তির মেলা, গড়পুকুরের পাড়ে বাসন্তী মেলার ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু সে মেলা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মকেন্দ্রিক মেলা ও উৎসবের সংখ্যা অনেক হলেও মুসলমানদের ধর্ম ও উৎসব কেন্দ্রিক মেলার সংখ্যা নিতান্ত কম। দুই ঈদ, মহরম আর অলি-আউলিয়াদের ওরস উপলক্ষে মেলা বসে। ঢাকার আজিমপুরে নবাবি আমল থেকে মহরমের মেলা হয়। কুষ্টিয়ার চক দৌলতপুর, মেহেরপুরের কুতুবপুরে এ মহরমের মেলার ঐতিহ্য আছে।

ধর্মীয় উৎসব, পালা-পার্বণ, সাধু-দরবেশদের আবির্ভাব-তিরোধান দিবস, দোলপূর্ণিমা ছাড়াও পহেলা বৈশাখ, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন শহরে মেলা হয়। ১৯৬০-এর দশকে

www.pathagar.com

রমনার বটমূল থেকে গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বাংলা একাডেমীর অমর একুশে গ্রন্থমেলা এখন সংস্কৃতিবান বাঙালির প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। চট্টগ্রামের বিজয়মেলার লোকপ্রিয়তা দিনোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কবি-সাহিত্যিকের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। ছেঁউড়িয়া লালনমেলা, শিলাইদহ-শাজাদপুর-পতিসর-দক্ষিণডিহির রবীন্দ্রমেলা, দরিরামপুর-কুমিল্লা-কার্পাসডাঙ্গার নজরুলমেলা, সাগরদাঁড়ির মধুমেলা, অম্বিকাপুরের জসীমমেলা এ ধরনের মেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মেহেরপুর জেলার কুতুবপুরের সাধক নিগমানন্দের জন্মতিথির মেলাও বেশ পুরানো।

উপলক্ষ্য যাই হোক মেলা মানে মানুষে মানুষে মিলিত হওয়া। ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই এই মিলনক্ষেত্রে জড়ো হয় এবং আনন্দ করে। এখানে এসে পসরা সাজায় মৃৎশিল্পী, তাঁতি, দোকানদার, আরও অনেকেই। ৩২ প্রহরব্যাপী তারক ব্রহ্মা মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে মেহেরপুর হরিসভা প্রাঙ্গণে মেলা বসে, এ মেলাটি এখন মেহেরপুরের প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে।

১. নবান্ন উৎসব

অগ্রহায়ণ মানেই 'আমন' ধান কাটার মাস। বর্ষায় রোপণ করা 'আমন' ধান অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হয়। আর ধান কাটা উপলক্ষে গ্রামীণ জনজীবনের আনন্দ বয়ে আনে 'নবান্ন উৎসব'। মেহেরপুর অঞ্চল অগ্রহায়ণের শুরু থেকে পৌষ মাসের প্রারম্ভ পর্যন্ত চলে নবান্নের আনুষ্ঠানিকতা। কলকাতা থেকে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের 'বাংলার কৃষক' (১৮৭৪) গ্রন্থে বলা হয়েছে, আমন ধান ভরা বর্ষায় রোপণ করা হয় নিচু জমিতে। ধান কাটা হয় বাংলা বর্ষের শেষের দিকে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে। নবান্ন উৎসবকে 'আমন পার্বণ' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমন কাটা শেষে আনন্দ-উল্লাসের সাথে অনেক পরিবার জড়ো হয় এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান হলো ডিসেম্বরের শীতের মতো উষ্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ ভোজন এবং বিভিন্ন উপায়ে তৈরি উষ্ণ ও সুস্বাদু পিঠা বিতরণ।"

নবান্ন উৎসব মূলত কৃষিভিত্তিক লোকউৎসব। ঘরে ঘরে উপাদেয় খানাপিনার আয়োজন করা হয়। কলকাতা থেকে প্রকাশিত লেখক দীনেন্দ্র কুমার রায় তাঁর 'পল্লি বৈচিত্র্য" (২০০৪) বইয়ে লিখেছেন, "বঙ্গের অধিকাংশ পল্লিতেই নবান্ন অগ্রহায়ণ মাসের একটি আনন্দপূর্ণ প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য উৎসব। পল্লিবাসীগণের মধ্যে হিন্দু মাত্রেই পিতৃপুরুষ ও দেবগণের উদ্দেশ্যে নূতন চাউল উৎসব না করিয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করেন না।"

মেহেরপুর নিবাসী লেখক দীনেন্দ্র কুমার রায়ের কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গৌরী সাহার কথার মধ্যে। তিনি জানান, মেহেরপুর অঞ্চলে আমন ধানের চিকন চাল হয়। আগের রাতে জলে ভিজিয়ে রাখা আতপ চাল পরদিন ভোরে স্নান সেরে গৃহবধুরা পাটা-নোড়ায় বেটে গুঁড়ো তৈরি করে। সেই গুঁড়োর সাথে নতুন গুড়, আদা, মসলা, দুধ মিশিয়ে নবান্ন প্রস্তুত করা হয়। নয় রকম ফলও এতে দেওয়া হয়। সেই সাথে নতুন চালের পায়েস এবং মুড়ি-মুড়কিও তো রয়েছে। এসব খাবার গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় এবং পরে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের খাওয়ার জন্য এসব খাবার বিতরণ করা হয়।

www.pathagar.com

শুধু খাওয়া-দাওয়াই নয়, এ উৎসবের অনুষঙ্গ হিসেবে যাত্রাপালা, জারিগান, কীর্তনগান, বাউলগানের আয়োজন করা হয়। ধান কাটা শেষ হয়ে গেলে চরগোয়ালগ্রাম, দিঘিরপাড়া, আমঝুপিতে লাঠিখেলা হয়। গ্রামের পথে পথে মানিক পিরের গান গেয়ে বেড়ায় গ্রামের ক্ষেত-মজুর, জোয়ান-বুড়োরা। এক সময় পিরোজপুর, সাহারবাটি, দারিয়াপুর, আমদহ গ্রামে আমন কাটার পর পরই যাত্রার আসর বসতো। সাহারবাটি ও পিরোজপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত এসব আসরের স্থিতিকাল ছিল পাঁচ থেকে সাত রাত পর্যন্ত। যাত্রার আসর আর তেমন বসে না। তবে গ্রামের আখড়াগুলিতে বাউলগানের আসর বসে। আর সারা রাত জেগে আসরের গান উপভোগ করেন গৃহস্থ, কিষাণ-কিষাণী, রাখাল থেকে ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত।

সরেজমিনে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, খেতজুড়ে পাকা ধান। কারো কারো ধান ইতোমধ্যেই গোলায় উঠে গেছে। মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের কৃষক মোস্তফা কামাল জানান, "এবার আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। ফলন ভাল হওয়ায় আমাদের আনন্দ বেড়ে গেছে।" তাই গ্রামে গ্রামে চলছে নবান্ন উৎসব। মুসলমান বাড়িতে চলছে ক্ষীর-পিঠা-পুলি আর হিন্দু বাড়িতে পায়েস-এর ধুম। সব বাড়িতেই প্রতিদিনই চলছে নবান্নের প্রচুর আয়োজন। যে সব বাড়িতে নবান্নের আয়োজন হয়নি, তারাও হয়তো অন্য বাড়ি থেকে নবান্নের উপাদেয় খাবার এনে সপরিবারে তা মুখে দিচ্ছে।

দীনেন্দ্র কুমার রায় 'নবান্ন' সম্পর্কে 'পল্লি বৈচিত্র্য' গ্রন্থে লিখেছেন, "মধুর হেমন্তের অবসানকালে নবান্ন দিনে" গ্রামবাংলা এক সময় হর্ষকলরবে মুখরিত হতো। নদী তীরবর্তী সুবৃহৎ ষষ্ঠী গাছের ছায়ায় গ্রামের রাখাল-কৃষাণ-মজুরেরা সমবেত হয়ে বিশ্রাম নিত। 'পল্লি রমণীগণ নদী জলে গা ধুইয়ে কলসি ভরিয়া জল লইয়া গৃহে ফিরতো।' ছেলেরা সমস্ত দুপুর বাড়ির বারান্দায়, চিলেকোঠার ছাতে, অন্দরের বাগানে, গোয়াল ঘরের অন্ত রালে লুকোচুরি খেলতো। সকল বাড়িতেই আয়োজন করা হতো ডাল, ভালো মাছ, গুড়-অম্বল, দৈ, পায়েস প্রভৃতি উপকরণের আহার। শিবমন্দিরের বারান্দায় বসে নেশাখোর বাউলের দল ডুগডুগি বাজিয়ে গাইত,

> বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে
> শ্মশানঘাটে যাচ্ছে চলে॥

দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩)-এর সেই দিন আর বাংলাদেশ এবং মেহেরপুরে নেই। তবু নবান্ন উপলক্ষে বাজার ভরে যায় শসা, শাক, আলু, 'সাকারকুণ্ড' আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংসহ নানা রকম শাক-সবজিতে। এসব দিয়েই এ অঞ্চলে আয়োজন করা হয় নবান্নের উৎসব।

২. ভবানীপুরের ওরস

বিখ্যাত সুফিসাধক ও ধর্ম প্রচারক মুনশী শাহ নায়েবউদ্দীন আল-কাদেরির প্রয়াণদিবস ২২ আশ্বিনে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে প্রতি বছর ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চুয়াডাঙ্গাসহ জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অসংখ্য মুরিদান নায়েবউদ্দীনের ভবানীপুর

www.pathagar.com

মাজারপ্রাঙ্গণে ছুটে আসেন। হযরত আব্দুল কাদির জ্বিলানি প্রবর্তিত কাদেরিয়া তরিকার এই সাধক ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া জেলার চাপড়া থানার হাটরা গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হুজুর আলি শেখ ছিলেন ইসলামি সুফিবাদের প্রগাঢ় অনুরাগী।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পির নায়েবউদ্দীন সপরিবারে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় চলে আসেন এবং পরবর্তীতে ভবানীপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনি সারা জীবন ইসলাম প্রচারে অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। ভবানীপুর গ্রামে যখন প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন তিনি একাই মুয়াজ্জিন ও ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সব সময় আল্লাহর ধ্যানে ও জিকিরে মশগুল থাকতেন। তবে এই ধ্যানী পুরুষ নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেছেন। মুরিদানদের নজরানা বা সেলামির উপর নির্ভরশীল না হয়ে কাপড়ের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। পরিণত বয়সে তিনি নদীয়া জেলার ভাগচাঁদপুরের সুফিসাধক শাহ সুফি ওবায়দুল্লাহর কাছে বায়াত হন। কলকাতা মেটিয়া বুরুজের সুফি মেহেরুল্লাহ শাহ ছিলেন ওবায়দুল্লাহর পির। অন্যান্য সুফিদের মতো হযরত নায়েবউদ্দীনও অজানাকে জানার চেষ্টা করেছেন আমৃত্যু।

তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতেন, "তোমরা তোমাদের আত্মাকে সব সময় পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করো। অপরিশুদ্ধ আত্মায় আল্লাহর ইবাদত হয় না।" পরমাত্মার সন্ধান লাভে অভিলাষী উচ্চমার্গের এই সাধক রাষ্ট্র-সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করতেও কখনও চাননি। প্রথম যৌবনে তিনি চাপড়ার হাটরার গ্রামপ্রধান ছিলেন এবং পরবর্তীকালে জুরির হাকিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালের ৯ অক্টোবর (২২ আশ্বিন ১৩৮৩) নিজ গ্রামে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে তার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। ২২ আশ্বিন তাঁর প্রয়াণদিবসে মুরিদানরা ওরসের আয়োজন করে। ওরস উপলক্ষে মাজারপ্রাঙ্গণে হলকায়ে জিকির, দোয়া মাহফিল, তবারক বিতরণ করা হয়। আশেকান-মুরিদান এবং ভবানীপুর গ্রামবাসীর সহযোগিতায় এ ওরসের ব্যয়ভার বহন করা হয়। ফাতেমা-ই-দোয়াজাদাহাম উপলক্ষেও ভবানীপুর গ্রামে আরেকটি ওরস হয়। এই দুই ওরসকে কেন্দ্র করে ভবনীপুর গ্রাম উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। হযরত নায়েবউদ্দীনকে ঘিরে কিছু কিংবদন্তিও এ অঞ্চলে চালু আছে। জনশ্রুতি আছে, তিনি একবার মুজিবনগর অঞ্চল থেকে এক জলসা শেষে দলবলসহ গভীর রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর বাড়ি ফিরতে হলে তখন নৌকা করে ভৈরব পাড়ি দিতে হতো। ভৈরবের ঘাটে এসে তিনি ও তাঁর মুরিদানরা দেখলেন যে, পার হবার কোনো নৌকা ঘাটে নেই। তখন মুরিদানরা তাঁকে বললেন, হুজুর আমরা পার হবো কী করে এত রাতে? তিনি বললেন, তোমরা কদম জোরে করে ফেল। তারা পা তুলতে না তুলতেই সবাই নিমিষেই নদী পার হয়ে গেল। এসব কিংবদন্তি সবাই বিশ্বাস করুক না করুক, ২২ আশ্বিনকে এ অঞ্চলের মানুষ একটি পবিত্র দিন বলে মানে এবং ওরস উপলক্ষে মাজারপ্রাঙ্গণে হাজির হয়।

www.pathagar.com

৩. সাহারবাটি এবাদতখানার ওরস

সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, শোষণ-নিপীড়ন বিরোধী সংগ্রামের সামনের কাতারের যোদ্ধা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনন্য পুরুষ। তাঁর মাধ্যমেই পাকিস্তানি জামানায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূচনা হয়। মওলানা ভাসানী তাঁর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে আঘাত করেন। একজন ধর্মনিষ্ঠ কামেল হিসেবে ধর্মকে তিনি জনগণের কল্যাণে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, "আমার ধর্ম বিপ্লবের ধর্ম এবং আমি নিজে ধর্মানুসারী। সুতরাং ধার্মিক হিসেবে আমার কর্তব্য হচ্ছে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো জিহাদ করা" (টাইম ১৮ এপ্রিল ১৯৬৯)। ধর্মকে তিনি সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তথাপি বাংলাদেশের অসংখ্য কৃষক মওলানা ভাসানীকে অধ্যাত্মসাধক ও পির হিসেবে মান্য করে। পির মওলানা ভাসানীর ভাবাদর্শে ১৯৮৪ সালে মেহেরপুর জেলার সাহারবাটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় 'এবাদতখানা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতি বছর ১৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর প্রয়াণদিবস উপলক্ষে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এবাদতখানার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মোসলেম উদ্দীন সরকার স্বপন (৭৫) একজন একনিষ্ঠ ভাসানী অনুসারী। তাঁর জন্ম মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানাধীন মজিদপুর দুহাটা গ্রামে। তাঁর পিতা মিছিল সরকার ছিলেন সাধারণ কৃষক। সাধক মোসলেম উদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। হরগঙ্গা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। এক পর্যায়ে তিনি ভাসানীর সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে মওলানা ভাসানীর নিকট বায়াত হন। ১৯৭৬ সালে মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক ও ধর্মীয় কাজে সফর করেন। ১৯৮৪ সালে মেহেরপুর জেলার সাহারবাটি গ্রামে চলে আসেন এবং মওলানার ভাবাদর্শে এবাদতখানা গড়ে তোলেন। এবাদতখানাকে কেন্দ্র করে সাধক মোসলেম সরকারের এক বিশাল ভক্তমণ্ডলী গড়ে উঠেছে। ভক্তরা নিজেদেরকে কাদেরিয়া সিলসিলার অনুসারী দাবি করেন। ১৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর প্রয়াণদিবস উপলক্ষে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে শিরনি বা তবারক বিতরণ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত হয়। নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সাহারবাটি উৎসবের গ্রামে পরিণত হয়। এবাদতখানার ওরস কমিটির আয়োজক এবং সাহারবাটি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল গণি (৭২) জানান, "২৫ বছর ধরে এবাদতখানায় মওলানা ভাসানীর ওফাত দিবস উপলক্ষে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের গণমুখী রাজনীতির প্রাণপুরুষ মওলানা ভাসানী ছিলেন চার তরিকার পির।" এবাদতখানা পরিরচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য মোফাজ্জেল হোসেন (৫৪) বলেন, "মওলানা ভাসানীর ওফাত দিবসের ওরসে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।" এছাড়া ফাতেহা-ইয়াজদাম, ৬ রজব খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.)-এর ওফাত দিবস, ২ মাঘ ঢাকার বিক্রমপুরে আধ্যাত্মসাধক, লালচাঁদ শাহ আল চিশতির ওফাত

www.pathagar.com

দিবস উপলক্ষেও ওরস হয়। মহরম আশুরা, মুন্সিগঞ্জ সিংপাড়া বাজারের সাধক হযরত চাঁদ মাস্তানের প্রয়াণদিবসেও অনুষ্ঠান হয়।[১]

৪. বাদিয়াপাড়ার ওরস

প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ তিন দিনব্যাপী মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন বাদিয়াপাড়া গ্রামের হযরত মহসীন আলী পির সাহেব (১৯৩২-২০০৭)-এর দরবারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ২০ হাজার লোক জড়ো হয়। ফুরফুরা শরিফ থেকে ফুরফুরা হুজুরের প্রতিনিধি এবং দেশের খ্যাতিমান আলেম-ওলামারা এ ওরসের মাহফিলে যোগদান করেন। ওরসে আগত আশেকান ও মুরিদানদের প্রথম দিন বিরিয়ানি, দ্বিতীয় দিন ভাত-মাংস এবং শেষ দিন খেজুর গুড়ের ক্ষীর প্রদান করা হয়।

বাদিয়াপাড়া দরবার শরিফের প্রতিষ্ঠাতা মহসীন আলীর জন্ম ১৯৩২ সালে গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামে। পিতা মফেল উদ্দীন মণ্ডল এবং মাতা রমনা খাতুন ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ৬ পুত্র, ৬ কন্যার জনক মহসীন আলী ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। ব্যক্তিগত অনাগ্রহ এবং পারিবারিক সমস্যার কারণে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডিতেই শেষ হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদীক্ষায় বেশিদূর এগোতে না পারলেও ইসলাম ধর্মের তত্ত্ব, দর্শন, ফিকাহ শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। ২৫/২৬ বছর বয়সে তিনি ফুরফুরা শরিফের আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)-এর নিকট চিশতিয়া তরিকায় বায়াত হন। তিনি নিজ উদ্যোগে একটি মাদ্রাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। দরবার এবং এর সংশ্লিষ্ট বিষয় তদারকি করছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাম মোস্তফা।

মহসীন আলী সম্পর্কে কাজীপুর কলেজের প্রভাষক হাসান আলী জানান, "মহসীন হুজুর সম্পর্কে নানা কাহিনি কিংবদন্তি চালু অছে। অনেকেই বলেন, জ্বিন বশ করে তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। কোনো ঔষধপত্র ছাড়াই হুজুরের দোয়া-তাবিজ ব্যবহার করে অনেক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভ করেছেন।" অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক পরিশুদ্ধ আত্মার কামেল হিসেবে মহসীন আলীকে গাংনী উপজেলার মানুষ জানে ও মানে।

তাই তার ওরসে যোগদান করে গোত্র, মাযহাব, সিলসিলা নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের সমাগমে বাদিয়াপাড়া দরবারপ্রাঙ্গণ পরিণত হয় মিলন ও সম্প্রীতির উৎসবে।

৫. পৌষ সংক্রান্তি

মেহেরপুর অঞ্চলে পৌষ সংক্রান্তি পালনের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। পৌষ মাসকে হিন্দুরা লক্ষ্মীর মাস বলে মনে করে। কারণ এ সময়ে গ্রামে খাদ্যদ্রব্যের অভাব থাকে না। পৌষের রোদমাখা দিন, নির্মল আকাশ বড়ই প্রীতিকর। হিন্দু রমণীরা "পৌষ মাসে স্বামীগৃহ হইতে

www.pathagar.com

পিতৃগৃহে বা পিতৃগৃহ হতে স্বামীগৃহে গমন করে না। এমনকি কোনো দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া যদি সে সময়ে গৃহে থাকেন, তাহাকেও পৌষ মাসে বিদায় দিতে নাই।"[২]

এক সময় পৌষ সংক্রান্তিতে অর্থাৎ ৩০ পৌষ ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, ধোপা, নাপিতসহ সবাই আনকোরা ধুতি পরে দলে দলে ভিক্ষায় বের হতো। এ ভিক্ষা ছিল শখের ভিক্ষা। প্রত্যেক দলে একজনের হাতে ধামা বা বস্তা থাকতো আর পিছনে গানের দল। তারা গাইতো:

হরিবোল হরিবোল,
সোনারায়ের ভার এলো বাড়ির ভিতর
বল ভাই শিবো,
এক কাঠা চাল নটা বড়ি নিবো॥

পৌষ পার্বণে শামসুজ্জোহা পার্কে গানের আসর

গ্রামের মেয়েরা হেসে মুঠো মুঠো চাল দিয়ে তাদের বিদায় করত। ১৯৪৭ সালে অধিকাংশ হিন্দু মেহেরপুর ছেড়ে চলে যাওয়ায় পৌষ সংক্রান্তি তেমন জমে না। তবে মুসলমান মানিক পিরের দল মাগনে বের হয়। পিরোজপুর, বুড়িপোতা, চিৎলা, সাহারবাটি, বেলতলাপাড়া গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় পৌষ মাসে মানিক পিরের গান শোনা যায়। ঢোল, কাঁসি বাজিয়ে চিৎলা-বাহাগুন্দা গ্রামের রমা নাপিত ও তার দল আজও গায় :

ওরে ও বেণী ঘোষ, চিনলে নারে মানিক পির,
খড়ম পায়ে নড়ি হাতে ল্যাংড়া ফকির
গোয়ালার বাথানে এসে প্রথম হাজির।
দৈ দুগ্ধ ক্ষীর ছানা যত আছে ঘরে,
আনিয়া হাজির করো মানিকের দরবারে।
বেণী ঘোষ দৈ দুধ নাহি আনি দিলো
হাজার হাজার ধেনু তার বাথানে মরিল।

গান শেষ হবার আগেই গ্রামের বধূরা কুলায় করে চাল এনে তাদের ধামায় ঢেলে দেয়। সাহারবাটির রাস্তায় আইজুদ্দী কামার, রতন শেখ, কছের সেখরা মানিক পিরের গান গেয়ে এক সময় ভিক্ষা করতো। এরা চালের সাথে ডাল, তরকারি, বড়ি, ডিমও আদায় করতো। কোনো কোনো গৃহস্থ তাদেরকে টাকা-পয়সাও দিত। পৌষের শেষ দিন

www.pathagar.com

ভিক্ষালব্ধ চাল-ডাল একসাথে রেঁধে তারা পোষলা করতো। আগের মতো পৌষ সংক্রান্তির উৎসব আর জমে না। তবু এখনও কোনো কোনো বাড়িতে রমণীরা সারা রাত জেগে থাকে পৌষ আগলাইতে। তারা ভক্তির সাথে উচ্চারণ করে :

এসো পৌষ, যেও না,
ভাতের হাঁড়ি থাক পৌষ, যেও না,
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ, যেও না,
পৌষ মাস, লক্ষ্মী মাস, যেও না।

৬. মহরম আশুরা

আরবি চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাস মহরম মাস। মহরম শব্দের অর্থ 'অলঙ্ঘনীয় পবিত্র'। মুসলমানদের কাছে এ মাসটি অত্যন্ত মর্যাদাবান ও ফজিলতময়। বিভিন্ন কারণে এ মাসটি মর্যাদাপূণ ও তাৎপর্যবহ। প্রাক ইসলামি যুগেও মহরম মাসের তাৎপর্য ছিল। বরকতময় ও তাৎপর্যমণ্ডিত এ মাসের ১০ তারিখে ঐতিহাসিক কারবালার প্রান্তরে মর্মস্পর্শী ঘটনা সংঘটিত হয়। এই মর্মস্পর্শী ঘটনার স্মরণে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে মহরম আশুরা উদ্‌যাপিত হয়। এ সময় মেয়েরা নফল রোজা পালন করে। রাস্তায় রাস্তায় শোনা যায় হায় হাসান! হায় হোসেন! তারা মনে করে, এই আশুরার দিনে হযরত আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.)-এর দুপুত্র শহীদ হন। যদিও ইমাম হাসান ৬৭০ সালে মদিনায় বিষপানে নিহত হন এবং ৬৮০ সালে ইমাম হোসেন কারবালার প্রান্তরে শহিদ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, মহরম শিয়াদের উৎসব হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এতে অংশগ্রহণ করে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, মেহেরপুর-কালাচাঁদপুরের শাহ ভালাই-এর দরগা, পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মা বরকতের দরগা, বাগোয়ানের বিবির দরগা, কুতুবপুর, সুবিদপুরে শাহ দরগা এলাকায় সবচেয়ে বড় আয়োজন থাকে আশুরা উপলক্ষে। কুতুবপুরে প্রায় সত্তর বছর ধরে মহরম উপলক্ষে মেলা বসে। তাজিয়া মিছিল বের হয় এবং তা ভৈরব তীরবর্তী একটি নিমগাছের তলায় শেষ হয়। তাজিয়া দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা নিমগাছতলায় ভিড় জমায়। মহরমের আত্মত্যাগের চেতনায় বলীয়ান হওয়ার জন্য লাঠিখেলার আয়োজন করা হয়। উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মেহেরপুর শহরেও মহরম উদ্‌যাপিত হয়। মহরমের রাত থেকেই পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা শুরু হয়ে যায়। নজরুল স্কুলপাড়ার আব্দুল মান্নান, আশরাফ আলী, মোফাজ্জেল শেখের দল জারিগানের আয়োজন করে। মহরমের ১ তারিখ থেকে জারিগানের আয়োজন করে তারা। মা বরকতের দরগা অথবা কুতুবপুরের দরগাতলায় এ গানের সমাপ্তি ঘটে।

মেহেরপুরের প্রাচীন গ্রাম বাগোয়ানে রয়েছে মহরম আশুরা উদ্‌যাপনের সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য। এ উপলক্ষে বাগোয়ানের পাড়ায় পাড়ায় মর্সিয়াগানের আসর বসে। গানের কথা বাংলা ও ফারসির মিশ্রণে রচিত। শেখ ফরিদের দরগার খাদেম ছাদিমান দরগাই-এর নিকট থেকে সংগৃহীত একটি মর্সিয়াগানের নমুনা নিম্নরূপ:

www.pathagar.com

ফাতেমা ক্যাতে হ্যায় রো রো,
আয় মেরি বাবা হোসেন॥
কোন জঙ্গলমে ছোড়া হাতম
আয় মেরি বাবা হোসেন॥
কাতরা পানি কেউ না দিয়ো
আয় মেরি বাবা হোসেন॥
ফরসা ফজর হোগা আতম,
ঘর চলো বাবা হোসেন॥
ফজর হোয়া নামাজ পড়,
আয় মেরি বাবা হোসেন॥'

মেহেরপুর ও বাগোয়ানে বিখ্যাত বয়াতি ও পদকর্তা গোফুর মুন্সীর সকিনার জারিগান শোনা যায় পাড়ায় পাড়ায় এবং রাস্তায় রাস্তায়।

কাঁদিছে সকিনা আজ কেনে স্বামী নাই,
বাসরেতে হলাম আঁড়ি কিসেরই গোনায়॥
পানি ঐ পানি করে ঐ কারবালার মাঝার,
তীরেতে মরে পতি দারুণ যন্ত্রণায়॥
সিঁথেরই সিঁদুর আমার কাছে সিঁধেময়
হাতের কাংনা রইল হাতে ওগো রব খোদায়॥
মিলন তো নাহি হলো কাসেম চলে গেল,
বাসরে মলো পতি কিসেরই গোনায়॥

মহরম উপলক্ষে বাগোয়ানের বিবির দরগায় মানত করা হয়। গ্রামের লাঠিয়ালরা লাঠিখেলার আয়োজন করে। মহরম বা পবিত্র আশুরার তাৎপর্য সম্পর্কে বাগোয়ানের সাদিমান দরগাই (৮৫) বলেন, "এ দিনটি যেমন শোকের, তেমনি অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠবার দিন। আমাদের সকলের মনে রাখা দরকার ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। অন্যায়-ষড়যন্ত্র করে বেশিদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না।"

মহরম মাসের ১০ তারিখকে দরগার মাজার কেন্দ্রিক লোকধর্মের সাথে যুক্ত নিম্নবর্গীয় মানুষ গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপন করে। এরা মনে করেন, হযরত আদম (আ.)-এর দুনিয়াতে আগমন, মুসা নবী ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তিলাভ করে ১০ মহরমে। আসমান-জমিন সৃষ্টি হয় এদিনেই। নুহ (আ.)-এর কিস্‌তি মহাপ্লাবনের কবল থেকে রক্ষা পায় এই দিনে। এছাড়াও হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে মুক্তি পান, হযরত আইউব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সেরে ওঠেন এই দিনেই। আশুরা দিবসেই কিয়ামত হবে বলেও মনে করেন তারা। ইসলামের ইতিহাসে মহরম আশুরা বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কারণে স্মরণীয় হলেও কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেন (রা.) সহ ৭২ জন সংগীর শাহাদত বরণই এদিনের শোকাবহ ও বিষাদময় ঘটনা। এ কারণে আশুরা উপলক্ষে কারবালা প্রান্তরের হৃদয়বিদারক ঘটনা বর্ণনা করে জারিগান গেয়ে বেড়ায় এ অঞ্চলের বয়াতিরা। এদের কণ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে

www.pathagar.com

পুত্রশোকে কাতর ফাতেমার বিলাপ কিংবা পতিহারা সখিনার বেদনামথিত হাহাকার। সখিনার পতিহারা বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে মহরমের দিন এক বয়াতি গাইছে :

সকিনা বলে আমার দিন গেল বিফলে
কেন মা দিছ বিয়ে আমার শিশুকালে
এল বসন্তকাল, উদয় হলো শতকমল
ও যেদিন কালো ভ্রমর বসবে ডালে মধু খাচ্ছে কেমনে।
ও বনের পাখি তোরে আমি জোড়ায় জোড়ায় দেখি
আহারে দারুণ বিধি, আমায় দিলো ফাঁকি।
আমি কার সাথে দাঁড়াইব, কার সঙ্গে কথা কব
এই সারা রাত জেগে থাকি ঘুম আসে না চোখে।

৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ৬১ হিজরি সনে মহরমের ১০ তারিখে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালার প্রান্তরে মহানবী (সা.) দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসেন (রা.) শাহাদত বরণ করেন। তাই এ দিনটি শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক দিন। কিন্তু দিবসটি উদ্‌যাপনে হিন্দু ধর্ম ও লোকধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মহরম আশুরা যতটা না ধর্মীয় উৎসব তার চেয়ে বেশি লোকউৎসব হিসেবেই এ অঞ্চলে উদ্‌যাপিত হয়।

সাহারবাটির বৈশাখী মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রফিকুর রশীদ

৭. সাহারবাটি বৈশাখী মেলা

নতুন বছরকে বরণ করে নিতে ১৯৭০-এর দশক থেকে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে বসে বৈশাখী মেলা। মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় ধুয়া-জারি, কবিগান, পালাগান, যাত্রাপালা, পুতুল নাচ, লাঠিখেলা ইত্যাদি। রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আদলে ৭০-এর দশকে সাহারবাটিতে বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে এ উৎসব গ্রামীণ মেলায় পরিণত হয়। এ মেলার স্থিতিকাল হয় তিন দিন। এই তিন দিন ধরেই চলে যাত্রাপালা, কবিগান, তরজা,

www.pathagar.com

বাউলগান, পাশপাশি হয় দেশি পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনীও। এ মেলায় যাত্রার দল, কীর্তনগায়ক, ভাল কথকদের পুরস্কার ও সম্মাননা এবং অনাথ-অসহায়কে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে। কামার-কুমার, জোলা, ফেরিওয়ালাদের ডাকা হয় পসরা সাজানোর জন্য। লাঠিয়াল বাহিনীকে ডাকা হয় লাঠিখেলার কসরৎ দেখাতে। এবারের মেলা কমিটির সভাপতি লিয়াকত আলী বলেন, "আবহমান বাংলার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার প্রয়াসে এ মেলার আয়োজন করা হয়।" মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক জামাল উদ্দীন বলেন, "সাহারবাটির বৈশাখী মেলা আসলে সংস্কৃতিবান মানুষের প্রাণের মেলা। এ গ্রামের মানুষের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নেয়ার আছে।"[৩]

৮. হরিসভার মেলা

জগতের সকল জীবের মঙ্গল ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা কামনায় প্রতিবছরের মতো এবারও ২৪ জুলাই ২০১১ থেকে মেহেরপুর শহরের সরকারি মহিলা কলেজ সড়কে অবস্থিত হরিসভা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় ৩২ প্রহরব্যাপী অখণ্ড তারকব্রহ্ম মহানামা যজ্ঞানুষ্ঠান। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাপ্রশাসক বেনজামিন হেমব্রম। চার দিনের এই মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানে নাম সংকীর্তন করতে এসেছিল বাগেরহাটের পাগলাবিজয় সম্প্রদায়, মাগুরার মা দুর্গা সম্প্রদায়, রাজবাড়ির শ্রী অদ্বৈত সম্প্রদায়, বাগেরহাটের অষ্টসখী সম্প্রদায়, সিরাজগঞ্জের অষ্টসখী সম্প্রদায় এবং খুলনার মা যশোদা সম্প্রদায়। হরিসভায় চলে নাম সংকীর্তন আর মন্দিরের সামনের পূর্ব-পশ্চিমের সড়কের দুপাশে বসে বিশাল মেলা। হরিসভা মন্দিরের ইতিহাস পুরোনো হলেও এ মেলার বয়স বেশি দিনের নয়, জানালেন হরিসভার সাবেক সভাপতি শাশ্বত নিপ্পন। তিনি বলেন, "মেহেরপুরের বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মল্লিক জমিদাররা হরিসভা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় এ মন্দিরে চলতো নিত্যপূজা এবং অনুষ্ঠিত হতো বারোয়ারি পূজা। কিন্তু ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর মন্দিরের জায়গা বেদখল হয়ে গেলে সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। ২০০০ সালে হরিসভার জায়গা পুনরুদ্ধার হওয়ার পর শুরু হয় মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান। আর এ যজ্ঞানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বসে লোকমেলা।"

হিন্দু সম্প্রদায়ের যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে এ মেলা বসে, কিন্তু এখানে সকল ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতিতে মেলাপ্রাঙ্গণ সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হয়। চারদিন চলে ভোগ-প্রসাদ রন্ধন। কোথাও মাটিতে বসে, সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা সংঘবদ্ধভাবে চলে পঙ্ক্তি ভোজন। বাংলাদেশের মেলা যে এককালে সম্প্রীতির মিলনতীর্থ ছিল, তার নমুনা মেহেরপুরের হরিসভার মেলা। এখানে নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সকলেই আসে, তবে নারীদের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো।

কৃষ্ণভক্ত নারীরা শুনতে আসে কৃষ্ণমন্ত্রের মহিমা আর অন্যরা আসে কেনাকাটা করতে। ঘর-গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় কত কিছুই না মেলায় আসে। বগুড়া থেকে আসে খাট-পালঙ্ক, সোফাসেট, ড্রেসিং টেবিল; খুলনা থেকে মাটির পুতুল, কাঠের ঘোড়া, খেলনা, টিনের জাহাজ। আসে সত্যনারায়ণের পাঁচালি, ব্রতকথা, লক্ষ্মীর সরা, মাটির হাঁড়ি, রুদ্রাক্ষের মালা, আলতা-সিঁদুর, স্নো-পাউডার, আয়না-চিরুনি, খই-মুড়ি-মুড়কি,

www.pathagar.com

জিলাপি আরও কত কী! বৈষ্ণব, সহজিয়া, কর্তাভজা, নাথযোগীদের মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠানটি এখন মেহেরপুরের প্রাণের মেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।[৪]

৯. বারুণীর মেলা

দোলপূর্ণিমার সাথে বাংলার মরমি ভাবুকতা ও লোকসাধনার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মেহেরপুরের মালোপাড়ায় দোলপূর্ণিমা তথা আমবারুণীতে বলরামী সম্প্রদায়ের উৎসব হয়। এ উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হয় তা বারুণীর মেলা নামে পরিচিত। তিন দিনের এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তরা আখড়ায় জমায়েত হন। বলরামীরা এ উৎসবকে পাঁচ ভাইয়ের মিলন উৎসব হিসেবে গণ্য করে। তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি ও কার্তিক মাসের একাদশীতেও এ আখড়ায় উৎসব হতো। বলরামীদের বারুণী উৎসবকে ঘিরে মালোপাড়ায় মেলা বসে। এক সময় এ মেলার জৌলুস ছিল। ক্রমশ মেলার জৌলুস হারিয়ে যাচ্ছে এবং লোকসমাগম কমে গেছে। অথচ এ মেলা সম্পর্কে লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৬৯-১৯৪৩) উদ্ধৃতি দিয়ে সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন :

"বৎসরান্তে বারুণীর যোগের সময় বলরামের আখড়ায় যে মহোৎসব হয়, সেই উৎসব উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ কয়েকদিন ধরিয়া মৃদঙ্গ যন্ত্র সহযোগে বলরামের নাম সংকীর্তন করে। এ উপলক্ষে আখড়ায় তিনদিন মচ্ছব হইয়া থাকে, প্রথম দিন অন্ন মচ্ছব, দ্বিতীয় দিন চিঁড়ে মচ্ছব, শেষদিন লুচি মচ্ছবে মধুরেণ সমাপয়েত হয়। এ আখড়ায় বহুকালের পুরাতন আমানি সঞ্চিত আছে, এই আমানি বলরামের প্রসাদ হিসেবে খ্যাত; নিম্নশ্রেণির অনেক লোক দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া এই আমানি পানে নিরাময় হইয়াছে।"[৫]

এ মেলার আয়োজকরা অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু। মেলায় হাড়ি, ডোম, বাগদি, মুচি, বেদে, নমশূদ্র, মুসলমান এবং মাহিষ্য সম্প্রদায়ের উপস্থিতি লক্ষ করার মতো। এবারের মেলার আয়োজক কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে অনন্ত দাস ও রোহিত হালদার। অনন্ত নিজে বলরামি সম্প্রদায়ভুক্ত আর রোহিত হালদার স্থানীয় হিসেবে বলরামী মতের বিশেষ অনুগামী। মালোপাড়ার মেলায় বলরামীরা ছাড়াও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, বাউলরাও আসে। দিনরাত চলে গান আর গান। মেলায় গিয়ে এক মুসলমান ভক্তকে বললাম, "আপনি বলরামকে মানেন, তবে কি ইসলাম ত্যাগ করেছেন?" তিনি গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন : "জাহেরে বিসমিল্লা। বাতুনে হাড়িআল্লা।" অর্থাৎ তারা সামাজিক ভাবে মুসলমান হলেও মনের গভীরে ভজেন হাড়িআল্লার নাম। তাঁর ভক্তরা হাড়িরামকে স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা বলে মনে করেন। মেলায় এক ভক্তের কণ্ঠে শুনতে পেলাম :

রামদীন তুমি নিত্য পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি
তোমা ভিন্ন জীবের নাইকো অন্য গতি
সৃষ্টি করো স্থিতি ওহে পিতা-পতি।

www.pathagar.com

পাশে তাকিয়ে দেখি মেথরপল্লির একদল ছেলে তাস খেলছে আর আড্ডা দিচ্ছে। আড্ডায় চলছে হইচই, কলরোল, চিৎকার। এসব চিৎকার, হইচই ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গের এক বাউলের কণ্ঠে ভেসে উঠল :

ভবে এসেছ তাস খেলিতে
একই ব্রহ্মা তারি কর্ম
বোঝ না আপন মনেতে॥
পাপ, পুণ্য দরিয়াখানা
ত্রিগুণে হয়ে তিরিখানা
চার ধামেতে চৌকাখানা রাট এসেছে।
পঞ্চ ভূতের পাঁচাখানা, ছয় ঋতুতে ছক্কা
সপ্ত পাতাল সাতখানা
খুঁজলে মিলবে নিজ দেহেতে।

আগে বারুণী মেলায় কেবল বলরামী সম্প্রদায়ের গান শোনা যেত। এখন মেলায় বলরামীদের চেয়ে জাত-বাউল, সহজিয়া, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের আনাগোনা বেশি লক্ষ করা যায়। আসরে কুষ্টিয়ার এক বাউলগানে আছে :

ভাবশূন্য থাকলে হৃদয়
বেদ পড়লে কি ফল হয়?
ভাবের ভাবিক থাকলে সদায়
গুপ্ত ব্যক্ত সব জানা যাবে।
লালন বলে ভাবুক যারা
রূপের বাতি দিয়া তার চরণ পাবে॥

বলরামীরা গঙ্গাজলের পবিত্রতা কিংবা সংস্কৃত মন্ত্রের মহিমা মানে না। গানে গানেই তারা হাড়িরাম তত্ত্ব নিগূঢ় অর্থ খোঁজ করে, বারুণী মেলায় এসে এই সব 'ব্রাত্য-মন্ত্রহীন'রা খুঁজে পায় হাড়িরামকে যাকে তারা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা বলে মানে।

১০. নিগমানন্দের জন্মতিথির মেলা

মেহেরপুরের সদর উপজেলার ভৈরব তীরবর্তী কুতুবপুর গ্রামে শ্রাবণী ঝুলন তিথিতে বসে নিগমানন্দের জন্মতিথির মেলা। সারা দেশের নিগমানন্দের অনুসারীরা এই তিথিতে গুরুধাম কুতুবপুরে আসেন। এ উপলক্ষে গুরুধামের চারপাশে একটি মেলা বসে। সাধক নিগমানন্দ সরস্বতী (১৮৮০-১৯৩৭) ছিলেন একাধারে অধ্যাত্মসাধক, ধর্মসংস্কারক, লোকহিতৈষী এবং শিক্ষানুরাগী। তিনি বাংলা ১২৮৭ সালের (১৮৮০ খ্রি.) শ্রাবণী ঝুলন পূর্ণিমায় মেহেরপুরের রাধাকান্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং মাতা মানিক সুন্দরী দেবী ধর্মনিষ্ঠ মমতাময়ী নারী। নিগমানন্দের পিতৃদত্ত নাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং পিতৃনিবাস কুতুবপুর। উনিশ শতকের এক রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার ও প্রতিবেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন সৃজনশীল, যুক্তিবাদী ও মননশীল। বর্ণশাসিত সমাজের উত্তরাধিকার বহন করতে হয়েছে জন্মসূত্রে বাধ্য হয়ে, কিন্তু তাঁর মননের গভীরে ছিল

www.pathagar.com

মানবিকতা, মনুষ্যত্ব ও উদার অসাম্প্রদায়িকতা। যুববয়সে আর্তের সেবায় ছুটে গেছেন, অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শব-সৎকারে অংশগ্রহণ করেছেন। ঢাকা ওভারসিয়ারী পাস করে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন। শৈশবেই সাক্ষাৎলাভ করেন অধ্যাত্মসাধক ভাস্করানন্দ, রামকৃষ্ণদেবের। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "এই বালক সংসারী হলে ঐশ্বর্যবান হবে। আর সন্ন্যাসী হলে জগদ্বরেণ্য সন্ন্যাসী হবে। তবে এই বালকের সন্ন্যাস যোগের বিশেষ সম্ভাবনা আছে।"

কৈশোরে মায়ের মৃত্যুতে শোকার্ত নিগমানন্দের মধ্যে এক ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং তিনি ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনায় অনুরাগী হয়ে ওঠেন। এ সময় তাঁর পিতা তাকে সংসারী করে তোলার জন্য বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগনার হালিশহর নিবাসী বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সুধাংশুবালার সাথে নিগমানন্দের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি দিনাজপুরে চলে যান, প্রথমে দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়ার পদে এবং পরে রাসমনি এস্টেটের নারায়ণপুর কাছারির সুপারভাইজার পদে নিযুক্ত হন। জনশ্রুতি আছে—ধর্ম, ঈশ্বর, পরকালে প্রগাঢ়ভাবে অবিশ্বাসী নিগমানন্দ নারায়ণপুরে চাকুরিকালীন অবস্থায় স্ত্রী সুধাংশুবালার অশরীরী ছায়ামূর্তি দেখে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। টেলিগ্রাম বার্তা পেয়ে বাড়ি গিয়ে জানতে পারেন স্ত্রী মারা গেছেন। স্ত্রীর অপরূপ স্মৃতি ও প্রেমে মুগ্ধ নিগমানন্দ এরপর অবিশ্বাসী থেকে বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হলেন এবং স্ত্রীর সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় পরকাল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি ঈশ্বর, পরকালতত্ত্ব, দর্শন সম্পর্কে জানার অভিপ্রায়ে মাদ্রাজ, কলকাতা, কাশীসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধনপীঠ ও তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। অবশেষে বামাক্ষ্যাপার কৃপায় বীরভূম জেলার দ্বারকানদী তীরবর্তী মহাশ্মশান তারাপীঠে সিদ্ধিলাভ করেন।

কথিত আছে, এক রাত্রে তিনি স্ত্রী সুধাংশুবালাকে মহামায়ারূপে দেখতে পান এবং সেই সাথে বিশ্বরূপ দর্শন করেন। মেহেরপুরের এই সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিকসাধক শঙ্করাচার্য কর্তৃক 'পরমহংস' অভিধায় ভূষিত হন। নিগমান্দ ছিলেন কৌতূহলী ও সত্যানুসন্ধানী। তাই সত্য সন্ধান এবং জগৎ রহস্যের স্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে ছুটে গেছেন এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে, মাদ্রাজ থেকে কলকাতা, কাশী, তারাপীঠ, হিমালয়ের পাদদেশে। আসমুদ্র-হিমাচল পরিভ্রমণ করে নিজে হয়ে ওঠেন পরিব্রাজকাচার্য। জ্ঞান, যোগ, তন্ত্র, প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভকারী এই অধ্যাত্মপুরুষের বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য ভক্ত ও অনুরাগী। নিগমানন্দের ভক্ত ও অনুরাগীরা কুতুবপুরকে তীর্থস্থান মনে করেন। শ্রাবণী ঝুলন যাত্রায় নিগমানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে দুবাংলার ভক্তরা কুতুবপুরে জড়ো হয়। এ উপলক্ষে কুতুবপুর গুরুধামের আশেপাশের এলাকা মেলায় রূপ নেয়। "শ্রাবণী ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে উৎসব ও মেলার প্রবর্তন ঠাকুর নিজেই করেছিলেন। ১৯৪৭-এর আগে এখানে প্রচুর লোকসমাগম হত। এখন আর তেমন হয় না।" বললেন আশ্রমের প্রধান অখণ্ডানন্দ মহারাজ। গতবারের উৎসবে স্থানীয় সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এসেছিলেন অধিবাস ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। এবার আসেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল আলম, ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা মমতাজ কাকলী, কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কাবুল হোসেন। তাঁরা বললেন, "নিগমানন্দ সরস্বতী কেবল অধ্যাত্মসাধক নন, তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মহান পুরুষ। তাঁকে কেবল মঠ, আশ্রম আর সাধনপীঠের গণ্ডিতে বন্দী রাখলে চলবে না, তাঁকে বের করে আনতে হবে মানবজীবনের বিশাল ক্ষেত্রে।" শ্রাবণী ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত এই কুতুবপুরের মেলা মেহেরপুর জেলার লোকসংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। এই মেলায় যারা আসেন তারা অধিকাংশই নিম্নবর্ণের মানুষ। কারণ নিগমানন্দ একদিন শঙ্করের যোগ, তন্ত্র, দর্শনের পাশাপাশি চৈতন্যদেবের নবপ্রেমবাদের বাণী শুনিয়েছিলেন। তাই তো মেলায় আসা ব্যাধ সম্প্রদায়ভুক্ত যাত্রাশিল্পী কমলারাণী বললেন, "এখানে এসে আমি জানলাম, আমি অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য নই, আমি মানুষ। লালনের মতো তিনিও মানুষ ও মানবতার কথাই বলেছেন।"[৬]

১১. বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে বাংলাদেশে চড়ক পূজার মেলার ঐতিহ্য থাকলেও বৈশাখ সংক্রান্তির মেলার ঐতিহ্য তেমন নেই। মেহেরপুরে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সামনে কয়েকশ বছর ধরে বৈশাখ সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা বসে। ঐতিহ্যবাহী এ মেলাটি বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা বা কালীবাড়ির মেলা নামে পরিচিত। মেলা কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা বলেন, "কবে থেকে এই মেলার সূচনা হয় তা কেউ বলতে পারে না, তবে যুগ যুগ ধরে এ মেলা হয়ে আসছে বলে অনেকে মনে করেন।" কালীমন্দিরের কাছাকাছি ক্যাশ্বপাড়া নিবাসী বাউল জামাল সাঁই (৮০) বলেন, "ছোটবেলা থেকেই বেতাই লালবাজার ও মেহেরপুরের বৈশাখ সংক্রান্তির মেলার কথা শুনেছি। আমাদের নিশ্চিন্তপুর থেকে আমি এ মেলায় মামার সাথে এসেছি।' সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম জানালেন 'বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষ এক সময় এ মেলায় আসতো। ১৯৪৭ এ দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকেই আর আসতে পারে না।" এখানে যারা আসেন তারা মূলত মন্দিরে মানত করতে আসেন। এক সময় এ মেলা কালীমন্দির প্রাঙ্গণ থেকে টি অ্যান্ড টি অফিস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে ক্রমশ এর পরিধি ছোট হয়ে আসছে। মেলা কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ সাহা বললেন, "মন্দিরের জমি বেদখল হয়ে যাওয়ায় মেলার পরিধি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে এর জৌলুস হারিয়ে যাচ্ছে।" এ মন্দিরকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের লোকবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। অনেকে বিশ্বাস করে, সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে মানত করলে মনোবাসনা পূর্ণ হয়, দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেল, বৈশাখ সংক্রান্তি উপলক্ষে ভক্ত-অনুরাগীদের দেওয়া মানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০/১২ মণ দুধ, বাতাসা ৪/৫ মণ, ৫/৬ মণ ফলমূল। এছাড়াও পাঁঠা, মুরগি, পায়রা, টাকা-পয়সা প্রভৃতিও মানত হিসেবে আসে। রোগমুক্তির আশায় কেবল হিন্দুরা নয়, মুসলমানরাও এখানে মানত করে।

সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী এ মেলার সেই জৌলুস না থাকলেও এক সপ্তাহ ধরে এ মেলা চলে। ৩১ বৈশাখ আসলে কালীবাড়ির সামনের সড়কের দুধারে দোকানিরা অস্থায়ী চালাঘর তুলে দোকান সাজায়। কোথাও বসে মিষ্টি-জিলাপি-বাতাসার দোকান, কোথাও বসে পুতুল-খেলনাপাতি আবার কোথাও মনোহারী দ্রব্যের দোকান। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ

www.pathagar.com

থেকে দোকানিরা না আসলেও খুলনা, বগুড়া, কুমারখালি থেকে ব্যবসায়ীরা আসে। মেলাটি হিন্দু সম্প্রদায়ের পর্ব উপলক্ষে বসে, তবে এটি এখন একটি সার্বজনীন মেলায় পরিণত হয়েছে। কারণ মেলায় হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আসে। সকলের উপস্থিতিতে মেলাপ্রাঙ্গণ সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হয়। মেহেরপুরের লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ বৈশাখ সংক্রান্তির মেলাটি টিকে থাকুক এ প্রত্যাশা সকলের।

১২. গোয়ালগ্রামের স্নানযাত্রার মেলা

চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মাথাভাঙ্গা তীরবর্তী গোয়ালগ্রামের স্নানযাত্রার মেলার খ্যাতি ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে মাথাভাঙ্গা তীরবর্তী গোয়ালগ্রামে এসে জমায়েত হতো। আর এ উপলক্ষে বসতো বিশাল মেলা। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা গঙ্গা নদীকে দেবী হিসেবে পূজা করে। সেই সাথে গঙ্গার শাখা বা উপনদীর স্রোত যেখানে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বাঁক পরিবর্তন করে সে স্থানটিকে পুণ্যস্থান হিসেবে গণ্য করে। গোয়ালগ্রামের নিকটবর্তী স্থানে মাথাভাঙ্গার স্রোত উত্তরের দিক থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। গোয়ালগ্রাম নিবাসী অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম বলেন, "এক সময় গোয়ালগ্রামের মেলার জৌলুস ছিল। কলকাতা, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর থেকে গরুগাড়ি করে দোকানিরা আসতো। যাত্রা, তরজা, পালাগানের আসর বসত, রঙ্গ-রসিকতা হতো। এমনকি বাইজিদের নাচ-গানের আসর হতো।" ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর মেলাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর অনিয়মিতভাবে মেলাটি কয়েকবার হয়েছে।

১৩. বাসন্তী মেলা

সারাবছর ধরেই বাংলাদেশে কোনো না কোনো উপলক্ষে মেলা বসে। নানা উত্থান-পতনের কারণে অনেক মেলাই কালের অতল গর্ভে হারিয়ে গেছে। এমনই হারিয়ে যাওয়া এক মেলার নাম মেহেরপুরের বাসন্তী মেলা। ফাগুন মাস অর্থাৎ বসন্তকালে এ মেলা বসতো বলে এ মেলার নাম বাসন্তী মেলা। মেহেরপুরের প্রভাবশালী মল্লিক ও মুখার্জি জমিদারদের উদ্যোগ ও সহায়তায় এ মেলা হতো। ১৮৮০ সালে শ্রী কৃষ্ণ মল্লিক ও নরেন্দ্র নারায়ণ রায় ঐতিহ্যবাহী মেলার প্রবর্তন করেন বলে জানা যায়। উনিশ শতকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিদ্যমান থাকায় মল্লিক-মুখার্জি জমিদারদের দ্বারা প্রবর্তিত এ মেলার পিছনে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা থাকতো। গড়ের পুকুর ও শামসুজ্জোহা নগরউদ্যান থেকে মেলার বিস্তৃতি ছিল মল্লিকপাড়া পর্যন্ত। মেলা উপলক্ষে শহরের প্রধান প্রধান সরণিতে তোরণ নির্মাণ করা হতো, মেলাপ্রাঙ্গণে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও গভীর রাতে নহবত বাজানো হতো। কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ছাড়াও নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিস্তর দোকানিরা আসতো পসরা নিয়ে। এ অঞ্চলের মেলা সম্পর্কে মেহেরপুর নিবাসী লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় বলেছেন—"দোকান পসারীও কম আসে নাই, ...বিস্তর দোকান আসিয়াছে। দোকানদারেরা সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী চালা ঘর তুলিয়া তাহার মধ্যে দোকান ঘর খুলিয়া বসিয়াছে। দুদিকে দোকানের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ। এক এক

www.pathagar.com

রকমের এক এক দিকে। কোথাও কাপড়ের দোকান, কোথাও বাসনের, কোথাও নানাবিধ মনোহারী দ্রব্যের দোকান।"[৭]

এছাড়াও মেলায় কৃষ্ণনগরের সরভারা, বহরমপুরের ছানাবড়া, খাগড়ার মুড়কি, সীতাভোগ, মিহিদানা, বিভিন্ন এলাকার লোকখাদ্যের দোকান বসতো। কাঠের আসবাবপত্র, গাড়ির চাকা, চেয়ার-টেবিল, খাট-পালঙ্ক সবই মেলায় পাওয়া যেত। জুয়েলারি দোকানও বসতো মেলায়। কুমোরের হাঁড়ি-কলসি, মুচি-ডোমদের বাঁশ-বেতের ধামা, ডালি, কুলো, মুরগির খাঁচা, ঝাঁকা মেলায় বিক্রি করা হতো। মেলায় পুতুলনাচ, নাগরদোলা, যাত্রাপালা, তরজা, কবিগানের আয়োজন করা হতো। দীনেন্দ্রকুমার 'বসুমতি' পত্রিকার ১৩৪৫ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'সেকালের বাসন্তী মেলা' শিরোনামে একটি মেলার উল্লেখ করেছেন : "মেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়েছিল। কোলকাতার বেঙ্গল থিয়েটারকে দিয়ে ওই দুর্গেশনন্দিনী মঞ্চস্থ করা হয়।"

"মেহেরপুরের আশেপাশের পঁচিশ গ্রামের মানুষ মেলায় যাত্রা দেখার জন্য ছুটে আসতেন। এই বাসন্তী মেলায় নবদ্বীপ হতে ষাটটি গরুর গাড়ি ভরে মতি রায়ের যাত্রাদল এসে 'ভীষ্মের শরশয্যা'সহ বেশ কয়েকটি যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করে। তৎকালীন মহকুমার কনস্টেবল ও চৌকিদাররা শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে। সে মেলায় জুয়া খেলায় অনেক মানুষ ফতুর হয়ে গামছায় চোখ মুছতে মুছতে ফিরেছেন বলে জানা যায়।"[৮]

মেলার মাঠে 'বারবিলাসীগণের দোকান' বসতো। "ইহারাই মেলার প্রধান কলঙ্ক। ইহাদের প্রবেশাধিকার না থাকিলে, শুনিয়াছি মেলা জমে না। এক একটি রূপজীবিনী তিন চারি হাত লম্বা টোঙ্গে রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। মেলার এক প্রান্তে এইরূপ শত শত টোঙ্গ। অর্থোপার্জনের আশায় তিন শতাধিক রূপজীবিনীর সমাগম হইয়াছে। শিকারের সন্ধানে অনেক চারিগাছা মলের ঝনঝনিতে গ্রাম্য চাষি ও পাইক-পেয়াদা নগদীগণের তৃষিত চিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া মেলার মধ্যে বিচরণ করিতেছে।"[৯] এই বারবিলাসীগণ নাকি কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, বহরমপুর, চুয়াডাঙ্গা থেকে আসতো। এদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন জমিদারদের মোসাহেব মথুরা বাবু। মথুরা বাবুর কাজ ছিল জমিদার ও বারবিলাসী উভয় পক্ষকে দোহন করা। এজন্য মেহেরপুরে প্রবাদ আছে, "মেহেরপুরের ইল্লৎ যায়, মথুরা চাটুয্যে মলে।"

কালের যাত্রায় মেলাটি হারিয়ে গেছে, পরবর্তীকালে বৈশাখ সংক্রান্তির মেলা, হরিসভার মেলা প্রবর্তিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আত্মা ও উত্তরাধিকারকে চেনা, সমাজ ও স্বদেশ অন্বেষার জন্য মেলাটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

১৪. চিৎলার অমর একুশে লোকমেলা

ফেব্রুয়ারি মাস কেবল শোকের মাস নয়; শোককে শক্তিতে পরিণত করে বলীয়ান হয়ে জেগে ওঠার মাস। এই মাসেই বাঙালি খুঁজে পায় আত্মপরিচয়ের ঠিকানা। তাই ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে চলে নানা রকম উৎসব আর মেলা। বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ফেব্রুয়ারি জুড়ে চলে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। এ মেলা এখন বাঙালির প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক উৎসব

www.pathagar.com

এবং গ্রন্থমেলা। কিন্তু মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামে হয় এক ব্যতিক্রমধর্মী মেলা। অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে চিৎলা ফার্ম আম্রকাননে আয়োজন করা হয় সাত দিনব্যাপী 'অমর একুশে লোকমেলা।' চিৎলা গ্রামটি মেহেরপুর শহর থেকে ১৫ কিমি. পূর্বে এবং গাংনী শহর থেকে ৫ কিমি. দক্ষিণে অবস্থিত। 'ছায়াসুনিবিড়, শান্তির নীড়' এ গ্রামটির যাত্রাপালা, তরজা, কবিগান, কীর্তনগানের সুখ্যাতি ছিল, আজ প্রায় শ্রীহীন। ফেব্রুয়ারি এলেই গ্রামটি মুখর হয়ে ওঠে। একুশের মেলাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে। কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে আউল-বাউল, সাঁই-দরবেশরা মেলাপ্রাঙ্গণে হাজির হয়। একতারা-দোতারা-খঞ্জনির বাজনা আর বাউলের সুরে মেলাপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে আরম্ভ হয়ে সাত থেকে দশ দিন পর্যন্ত মেলাটি স্থায়ী হয়। গত শতকের ৯০ দশকে মেলাটি প্রবর্তন করেন সাংস্কৃতিক সংগঠক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন-এর নেতৃত্বে জেলার সাংস্কৃতিক কর্মীরা। মেলার প্রবর্তক ও উদ্যোক্তা ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন মেলা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি ও আমার বন্ধুরা নব্বই-এর দশকে ফেব্রুয়ারি মাসে একটি মেলা করার উদ্‌যোগ গ্রহণ করি। মেলাটি লোকমেলা হলেও নিছক লোকমেলা নয়। বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন, আমাদের আনন্দময় জীবনকে ফিরিয়ে আনা এবং দেশীয় কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের উৎকর্ষের জন্য মেলা করার আয়োজন করা হয়।" ফেব্রুয়ারির শোকের মাসে মেলাটি বসলেও শোকের ছায়া কখনও মেলার উৎসবময়তাকে ম্লান করতে পারেনি। উদ্বোধনের পর পরই গীত-বাদ্য-নৃত্যে মেলাপ্রাঙ্গণ ভরে ওঠে। কোলাহলের মধ্যেই শোনা যায় বাউলের একতারার শব্দঝঙ্কার। সন্ধ্যার পরে তারা যেন জেগে ওঠে তাদের অন্তর স্পর্শে। যাত্রাপালা, সার্কাস, কেনাবেচার মধ্যেও চলে তাদের গীতবাদ্য। গত বছরের মেলায় এসেছিলেন লোকগবেষক ড. আনোয়ারুল করীম, জয়নাল আবেদীন এমপি, মকবুল হোসেন সাবেক এমপি, কথাসাহিত্যিক রফিকুর রশীদ প্রমুখ। মেলায় একটি গান শুনেছিলাম :

মন যাবিরে ভ্রমণে, কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে।
প্রাণ জুড়াবে মন্দ মন্দ সমীরণে।
সেই বাগানে আছে মালি
তাদের মধ্যে একজন উড়ে, একজন বাঙালি
তারা বাগান ছিঁড়ে, কুড়ে, নাড়ে-চাড়ে
বাগান ঝাড়ে তারা যতনে।

গায়কের নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায়—গায়কের নাম নান্টু সরকার, বাড়ি পার্শ্ববর্তী নিত্যানন্দপুর, ধর্মে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টান। গ্রামের ছেলে ক্ষুদে গানরাজ উদয় ও তার দল গাইল আরেকটি গান :

চলো যায় চিৎলা গাঁয়েতে
বাঙালির মিলনমেলাতে,
আনন্দ করি সবাই প্রাণ ভরে
পাগল হবো দেখবো পাগল সেই মেলাতে
হরেক রকম পাগল আসে এই মেলাতে॥

www.pathagar.com

আউল-বাউল, জারি-সারি
শুনলে জুড়াইত প্রাণ,
কোথায় গেল আব্বাস উদ্দীন, হাসন রাজার সেই গান
সাধের সুর হারিয়ে গেল সোনার এই বাংলাতে॥
শীতকালে খাইতাম পিঠা
সকালে খেজুররস
আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, কোথায় গেল পান্তাভাত
সাধের খাবার হারিয়ে গেল সোনার এই বাংলাতে
কোরমা, পোলাও, চাইনিজ খাবার খাইলো বাংলাকে॥
মা আমার কলসি কাঁখে
পরতো সেই তাঁতের শাড়ি,
বিদেশি আর মডেলিং-এ দিলো তো সেই তো ছাড়ি... ।

চিৎলার 'অমর একুশে লোকমেলা' এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের মেলায় পরিণত হয়েছে। মেলায় এসে পসরা সাজায় কামার-কুমার, তাঁতি, ময়রা, কাঁসারু, ফেরিওয়ালা, চুড়িওয়ালা, হালামালাওয়ালা। বিচিত্র পণ্যের সম্ভারে ভরে ওঠে মেলাপ্রাঙ্গণ। বগুড়া, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া থেকে দোকানিরা আসে। টমটম গাড়ি, নাগরদোলা আনা হয় বিনোদনের জন্য। লাঠিখেলা, সার্কাসেরও আয়োজন হয় কোনো কোনোবারের মেলায়। এ কারণে ফেব্রুয়ারি এলে চিৎলা নিত্যানন্দপুরের পথে-ঘাটে লিখনের লেখা একটি গান শোনা যায় :

আইছে মেলা যাইছে বেলা
দেরি কইরো না
দাওয়াত দিছি আইসো বন্ধু ভুল কইরো না-বন্ধু ।
চিৎলা গাঁয়ের একুশে মেলা
দেখতে কী সুন্দর
দেখে দেখে সাধ মেটে না
কেটে যায় রাত ভোর-বন্ধু
মন-মাতানো মেলা দেখে প্রাণ তো ভরে না॥
একতারার জারি-সারি
কবি, যাত্রাপালা,
একতারার সুর পাগল করে
আরো কত খেলার বন্ধু
মন-মাতানো মেলা দেখে প্রাণতা ভরে না॥[১০]

১৫. বল্লভপুরের বড়দিনের মেলা

মেহেরপুর শহর থেকে ১৫ কিমি. দক্ষিণে কেদারগঞ্জ বাজার। আর সেখান থেকে কিছু দূরে অবস্থিত খ্রিষ্টান অধ্যুষিত বল্লভপুর গ্রাম। এ গ্রামে বসে শতাব্দী প্রাচীন বড়দিনের

www.pathagar.com

মেলা। ১৮৪০ সালে নদীয়ার চাপড়ায় প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টমণ্ডলী গড়ে উঠলে পার্শ্ববর্তী মেহেরপুরের বল্লভপুর, ভবরপাড়া, রতনপুর এবং গাংনীর নিত্যানন্দপুর, পাকুড়িয়া, জুগিন্দা গ্রামে খ্রিষ্টধর্মের প্রসার ঘটে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন এবং ইহজাগতিক লাভের আশায় এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। খ্রিষ্টান হওয়ার আগে এ অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসীরা মূলত কর্তাভজা ও সাহেবধনীসহ বিভিন্ন লোকধর্মের অনুসারী ছিল। মেহেরপুর অঞ্চলে সাহেবধনী কর্তভজা ধর্মমতের ভক্ত ও অনুরাগী বিলুপ্ত হওয়ার মূল কারণ ধর্মান্তরকরণ। এই ধর্মান্তরকরণ যখন হয়েছে তখন গ্রামকে গ্রাম ধর্মত্যাগ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উচ্চবর্ণ বা শ্রেণির হিন্দু বা মুসলমান খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি। কর্তাভজা ও সাহেবধনী সম্প্রদায় থেকে আগত প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানরাই বল্লভপুরে বড়দিনের মেলা আয়োজন করে। বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বল্লভপুর নিবাসী রমেন মল্লিক বলেন, "শত বছর ধরে বল্লভপুরে বড়দিনের মেলা হয়। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর মেলাটি পূর্ণতা লাভ করে।" চার্চ অব বাংলাদেশের বিশাল প্রাঙ্গণে এ মেলা বসে। মেলা উপলক্ষে দূর-দূরান্তরের ব্যবসায়ীরা এসে পসরা সাজায়। আসে যাত্রাগান, প্রদর্শনী। দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্য নাগরদোলা, পুতুলনাচ, সার্কাস, গরুর গাড়ি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। আমোদ-আহলাদ সং-এর কৌতুকে মেলাপ্রাঙ্গণ মেতে ওঠে। মিশন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক লুক হরেন্দ্র বিশ্বাস রিঠু বল্লভপুর চার্চের বৈথানিয়া বাড়িতে আমাদের চায়ের আপ্যায়ন করতে করতে জানালেন, ডিসেম্বর শুরু হলেই বল্লভপুর গ্রাম আনন্দে মেতে ওঠে। পাড়ায় পাড়ায় যিশু ও মা মেরির গো-শালা সাজানো হয়, আয়োজন করা হয় যিশুর নাম সংকীর্তন। আবালবৃদ্ধবণিতা পথে পথে কীর্তনের ঢং ও সুরে গেয়ে বেড়ান :

আসবেন যীশু মেঘরথে
আবার ফিরে ধরাতলে।
জেগে থাকো বলেন প্রভু
করো সবে প্রার্থনা।
হবে তার আগমন
আমরা রয়েছি প্রতীক্ষায় অনুক্ষণ।

খোল, করতাল, হারমোনিয়াম সহকারে এ নাম সংকীর্তন পরিবেশন করা হয়। বল্লভপুরের নিকটবর্তী চাপড়ার বিভিন্ন গ্রামে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টমণ্ডলী গড়ে উঠলে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গীতিকার কুবির গোঁসাই খ্রিষ্টধর্মের ভাবাদর্শ প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ কুবির গোসাঁই-এর সাধনপীঠ বৃত্তিহুদা গ্রাম চাপড়া খ্রিষ্টমণ্ডলীর খুব কাছেই ছিল। তিনি গেয়েছেন :

যিশু আজ্ঞা পালন করো।
প্রভুর নামের গুণে দিব্যজ্ঞানে ডঙ্কা মারো॥
পরহিংসা করো নারে ভাই
ওরে আপনি যেমন পরকে তেমন ভাবো সদাই।
ভাবেতে ভাব উপজীবে বাড়িবে প্রেম অঙ্কুর॥
নিয়ত করো গা প্রভুর নাম

www.pathagar.com

বসে সাধুর সনে চন্দ্রদিনে করো হে বিশ্রাম
প্রার্থনায় করিবেন কৃপা আপনি পরমেশ্বর॥
অতি সুভাবেতে স্বধর্মেতে কর মগন।
জ্ঞান হবে উজ্জ্বল বাতি নামের মালা গলায় পরে।

সময়ের পরিবর্তনে বল্লভপুরের শতাব্দী প্রাচীন এই মেলার জৌলুস ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। মৌলবাদী শক্তির উত্থান, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজনিত কারণে মেলাটি ক্রমশ 'খ্রিষ্টানদের বড়দিনের উৎসবে' পরিণত হতে চলেছে।[১১]

১৬. নিত্যানন্দপুরের বড়দিনের মেলা

এক সময় এ গ্রামে নিত্যই আনন্দ লেগে থাকতো, তাই গ্রামটির নাম নিত্যানন্দপুর— কথাগুলো বললেন লোকগায়ক নান্টু সরকার। তিনি আরও বললেন, "গাংনী উপজেলার একমাত্র খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাম নিত্যানন্দপুর। খ্রিষ্টধর্মে পাল-পার্বণ, উৎসবের সংখ্যা বেশি না হলেও সারা বছর ধরে এ গ্রামে চলে নানা উৎসব। তবে বড়দিন উপলক্ষে এ গ্রামে বসে বিশাল মেলা।" নিত্যানন্দপুর পার্শ্ববর্তী চিৎলা নিবাসী গোলাম সরওয়ার বলেন, "নানা চড়াই-উতরাই, রাজনৈতিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও মেলাটি শত বছরের বেশি সময় ধরে টিকে আছে। বল্লভপুরের বড়দিনের মেলাটির জৌলুস হারালেও নিত্যানন্দপুরের বড়দিনের মেলার জৌলুস বাড়ছে।"

নিত্যানন্দপুরের শতকরা ৯৫ ভাগ লোক খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী এবং পার্শ্ববর্তী চিৎলা গ্রামের সবাই মুসলমান। কিন্তু মুসলমান-খ্রিষ্টান সম্পর্কে কখনও চিড় ধরেছে বলে শোনা যায়নি। এ অঞ্চলের মানুষের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রই মেলাটিকে টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা রেখেছে। অনুমান করা যায়, মেলাটির বয়স ১৬০ বছরের মতো হবে। কারণ ১৮৪০ সালে নদীয়ার চাপড়ায় প্রোটেস্ট্যান্টমণ্ডলী গড়ে উঠলে মেহেরপুর অঞ্চলে ব্যাপক হারে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের ঘটনা ঘটতে থাকে। সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য বিমোচন এবং ইহজাগতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দলে দলে খ্রিষ্টধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় বল্লভপুর ও নিত্যানন্দপুরে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টমণ্ডলী গড়ে ওঠে। ধারণা করা হয়, নবদীক্ষিত খ্রিষ্টানরা উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে মেলাটির প্রবর্তন করেন। মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন খ্রিষ্টান অধ্যুষিত গ্রামটিতে চার্চ অব বাংলাদেশ, ইউনাইটেড চার্চ অব বাংলাদেশ, এসেম্বলিস অব গড নামে তিনটি প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ আছে। এসব চার্চের উদ্যোগে মেলাটি আয়োজন করা হয়। মেলাকে কেন্দ্র করে আশেপাশের চিৎলা, পাকুড়িয়া, জুগিন্দা, আযান প্রভৃতি গ্রামেও উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। দূর-দূরান্ত এবং আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে পুরো নিত্যানন্দপুর গ্রামটি জনারণ্যে পরিণত হয়। মেলা উপলক্ষে আয়োজন হয় নানা ধরনের খেলাধুলার। এছাড়াও পুতুলনাচ, বায়োস্কোপ, নাগরদোলার ব্যবস্থা করা হয়। বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত এ মেলাটি ইতোমধ্যে সাম্প্রদায়িক চরিত্র ত্যাগ করে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে।

www.pathagar.com

১৭. ভবরপাড়ার বড়দিনের মেলা

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর সংলগ্ন ভবরপাড়া রোমান ক্যাথলিক চার্চের সামনের রাস্তায় বসে এক দিনের মেলা। সীমান্তবর্তী এ গ্রামটি বড়দিনের মেলা উপলক্ষে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। ভবরপাড়া ধর্মপল্লির বড়দিনের মেলার ইতিহাসও শত বছরের পুরোনো। ১৮৮৪ সালে ফাদার তাভেঞ্জিয়ার উদ্‌যোগে কৃষ্ণনগর ধর্ম প্রদেশের অধীনে ভবরপাড়ায় ধর্মপল্লি স্থাপিত হলে তখন থেকে বড়দিনের মেলাটি প্রবর্তিত হয়। নানা রকমের পণ্যদ্রব্য সম্ভারে মেলাস্থল ভরে ওঠে। এ মেলার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে, স্থানীয় হস্তশিল্পীদের তৈরি পাটজাত বিভিন্ন রকম শিল্পসামগ্রীর বেচাকেনা। ভবরপাড়ার হস্তশিল্পীরা নিজ হাতে তৈরি ম্যাট, পুতুল, পাখি, নানাবিধ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি মেলায় নিয়ে আসে।

১৮. পাকুড়িয়ার বড়দিনের মেলা

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন পাকুড়িয়া ক্যাথলিক চার্চপ্রাঙ্গণে এক দিনব্যাপী বড়দিনের মেলা হয়। ১৮৮৩ সালে ফাদার উবেত্তী পাকুড়িয়ায় খ্রিষ্টবাণী প্রচার করলে শত শত মানুষ খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে এবং চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। চার্চ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বড়দিন উপলক্ষে এখানে এক দিনের মেলা বসে।

১৯. মেহেরপুরের রথের মেলা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব রথযাত্রা মেহেরপুরের রথ উৎসবের ইতিহাস বেশ পুরানো। মেহেরপুরের বিখ্যাত জমিদার গজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তার বাড়ির সামনে একটি মন্দির স্থাপন করেন এবং তাতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে জমিদার মুখার্জীবাবু নব স্থাপিত মন্দিরপ্রাঙ্গণে এ উৎসবের সূচনা করেন। জমিদার গজেন্দ্রনাথ বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ছয় পুত্র এই উৎসবের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। পরবর্তীকালে নায়েববাড়ি মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে রথযাত্রা শুরু হয়ে নিয়ে যাওয়া হতো সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের তেমাথা পর্যন্ত।

এক সময় রথযাত্রা উপলক্ষে নায়েব বাড়ি মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসতো বারোয়ারি মেলা। এ মেলা নায়েববাড়িপ্রাঙ্গণ থেকে কালীবাড়ি ছাপিয়ে টি অ্যান্ড টি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন মেলায় গ্রামগঞ্জ থেকে আসতো কৃষক, কামার, কুমারসহ কুটিরশিল্পীদের তৈরি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। এছাড়াও আসতো বাঁশের তৈরি তৈজসপত্র, হাতপাখা, মাটির তৈরি হরেক রকমের জিনিসপত্র। মেলার প্রত্যক্ষদর্শী মেহেরপুরের শিক্ষক ননী গোপাল ভট্টাচার্য (৭৫) বলেন, "কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার ভোগ বেতাল গ্রামের গোপীনাথ জিউর মন্দিরের রথযাত্রার মতো মেহেরপুরের রথযাত্রার ইতিহাস ততো পুরানো নয়। তবে এটি এ জনপদের ঐতিহ্যের অংশ। রথযাত্রা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসব হলেও তখনকার দিনে রথ উৎসবে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই আসতো। রথযাত্রা উপলক্ষে গীতাপাঠ, পদাবলি কীর্তন, রামায়ণ পাঠসহ যাত্রাপালার আয়োজন করা হতো। আজকের দিনে মেহেরপুরের রথযাত্রার অনুষ্ঠানকে একেবারেই শুষ্ক ও আনন্দহীন মনে হয়।"

www.pathagar.com

একাত্তরে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বিভিন্ন মন্দির ও উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ করে এবং বিগ্রহ ভাঙচুরসহ নানা রকম ক্ষতিসাধন করে। এ থেকে নায়েববাড়িতে রাখা রথটিও রেহাই পায়নি। ফলে মেহেরপুরে রথযাত্রা ও মেলা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সাথে বন্ধ হয়ে যায় দোলপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, বাসন্তী পূজাসহ নিত্য দিনের পূজা-পার্বণ। মন্দির পুনঃসংস্কার করে ২০০৫ সাল থেকে পুনরায় রথযাত্রা শুরু হয়েছে। কিন্তু রথযাত্রা উপলক্ষে আর কোনো মেলা বসে না। এককালে তিন দিন ধরে মেলা হতো। এ উপলক্ষে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে, কেউ নৌকায় করে নায়েববাড়ি প্রাঙ্গণে জড়ো হতো। কাঠ নির্মিত বিশাল রথ ভক্তরা টেনে নায়েববাড়ি প্রাঙ্গণ থেকে শহরের বড় রাস্তা হয়ে কালীবাড়ির সামনে নিয়ে আসতো। আবার আট দিন পর ফিরে যেত নায়েববাড়িতে। মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যের অংশ রথের মেলাটি আর হয় না, তাই দূর-দূরান্তের ভক্ত ও দর্শনার্থীরা রথ দেখতে কিংবা কলা বেচতে আসে না। তবুও অনেকেই স্মৃতিকাতর হয়ে উচ্চারণ করে :

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা,
সকাল থেকে বাদল হলো
ফুরিয়ে এল বেলা।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সুখ দুঃখ,' ক্ষণিকা)

মেলা না হলেও রথযাত্রা উপলক্ষে মেহেরপুর শহরে উৎসবের আমেজ লক্ষ করা যায়। নায়েববাড়ি থেকে হরিসভা পর্যন্ত রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে হাজার হাজার ভক্ত, অনুরাগী ও দর্শনার্থী। রথের অগ্রভাগে ভক্ত ও কীর্তনীয়া দল আর পশ্চাতে অসংখ্য দর্শনার্থী। প্রধান সড়কের দুধারে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মানুষ রথযাত্রাকে স্বাগত জানায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রথযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা, ধামরাই, কটিয়াদি, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে রথযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, ধামরাইয়ের রথযাত্রা ও কটিয়াদির গোপীনাথের রথযাত্রার ঐতিহ্য বেশ পুরানো। মেহেরপুরের রথযাত্রার ইতিহাসও প্রায় দুশ বছরের। রথযাত্রা উপলক্ষে সারা দেশের মতো মেহেরপুরের হিন্দুরা বিশ্বাস করে, এ দিন কলাগাছ লাগালে বেশি কলা হয়। আরও একটি সংস্কার প্রচলিত আছে, তা হলো দিনের প্রথম ভাগে মেঘ ডাকলে অগ্রিম বর্ষা হয় আর পর ভাগে ডাকলে বর্ষার আগমন বিলম্বিত হয়।

রথের মেলা

www.pathagar.com

২০. তারানগরের মাদার পিরের মেলা

মেহেরপুর জেলা সদরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বৈদ্যনাথতলা খ্যাত মুজিবনগর, স্বাধীনতার সূতিকাগার। মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া, বল্লভপুর, আনন্দবাসসহ আরো কয়েকটি গ্রাম জুড়ে বসবাস করেন খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা। এখানে বড়দিনের উৎসবে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যেমন বয়ে যায় উৎসবের আনন্দ, তেমনি দুর্গাপুজা, ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আয়হাতেও উৎসবের আনন্দ বয়ে যায়। সকল ধর্মের অংশগ্রহণে 'মুজিবনগর' হয়ে ওঠে এক অসাম্প্রদায়িক জনপদে। এই উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের শেষে সীমান্তবর্তী গ্রাম তারানগর। এই গ্রামটিকে ঘিরে আছে এক সুপ্রাচীন জলাশয়। এক সময় এখানে প্রচুর পদ্মফুল ফুটত, তাই এই জলাশয়ের নাম পদ্মবিল। আর এই তারানগর গ্রামেই মাদার পিরের দরগা, যার সাথে দীর্ঘদিন ধরে জড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের মানুষের গভীর ভালবাসা, বিশ্বাস ও আস্থা। এই পিরকে স্থানীয়ভাবে দমের পির বলেও সম্বোধন করেন অনেকেই। তবে কবে, কখন এবং কোথা থেকে এই পির এ গ্রামে আসেন, তার সঠিক হিসাব এখন এ অঞ্চলের কেউ দিতে পারেন না। শ্রাবণ মাসের ১৩ তারিখে এই মাদার পিরের দরগাকে ঘিরে প্রতি বছর বসে বিশাল এক গ্রামীণ মেলা। ১৩ তারিখে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় বলে মেলার নাম তেইরির মেলা। মেলায় পিরের ওরস উপলক্ষে তবারকের পাশাপাশি নানা রকমের মিষ্টি ও গ্রামীণ খেলনার পসরা সাজিয়ে বসেন দোকানিরা। মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গাসহ পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা থেকে বিখ্যাত লোকগায়কেরা এই মেলায় গান গাইতে আসেন। মাদার পিরের ভক্ত এবং এই উৎসব কমিটির অন্যতম সদস্য জিরাত ফকির (৫৪) বলেন, "এ অঞ্চলের প্রখ্যাত জমিদার নফর পাল চৌধুরী, মাদার পিরের নামে ২৭ বিঘা সম্পত্তি দান করেছেন (১৯২২ সালের আর.এস. রেকর্ড অনুযায়ী)।" মাদার পিরের নামকরণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে জিরাত ফকির বলেন, "মাদার পির পরীর সন্তান, বাঘের দুধ খেয়ে বড় হন। পথের পাশে জঙ্গল থেকে হযরত আলী (রা.) কুড়িয়ে মা ফাতেমা (রা.)-এর কোলে দেন।"

পাশের গ্রামের অধিবাসী হাফিজ উদ্দিন জানালেন, এই মেলার ব্যয়ভার বহন করেন এ অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষ। আট থেকে দশ মণ চালের তবারক বিতরণ করা হয় ভক্তদের মাঝে। সব ধর্মের মানুষই এই মেলায় আসেন ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে। এই অঞ্চলের মোজাম শাহ পির-এর খাদেম (যার জন্মতারিখ নেই কিন্তু মৃত্যু ১৪ অক্টোবর ১৯৯৬) হিসেবে এই দরগার দেখাশোনা করতেন। তিনি ছিলেন চিশতিয়াপন্থি অধিক। তাঁর গুরু ঈমান আলী শাহ-র আদি নিবাস পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায়। এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, মাদার পিরের অনুসারীগণ দুই বাংলাতেই ছড়িয়ে আছেন। মোজাম শাহ-এর মৃত্যুর পর তাঁকে এই দরগাপ্রাঙ্গণেই সমাহিত করা হয়।

মাদার পিরকে ঘিরে এখনো প্রচলিত আছে নানা কিংবদন্তি। এক সময় জনৈক এক সীমান্তরক্ষী সৈনিক (হাবিলদার) প্রচলিত বিশ্বাস আর ভক্তিকে অবজ্ঞা করে, দরগায় মানত করা পুতুল ভেঙ্গে ফেলেন। পর মুহূর্তে তার রক্তবমি শুরু হয়েছিল বলে এলাকাবাসী জানালেন। স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি পিরের নামে উৎসর্গকৃত জমি জোর করে দখল নিয়ে চাষ করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আলাপ

www.pathagar.com

হলো তারানগর গ্রামের পাশের গ্রাম হুদাপাড়ার মৃত মসলেম সর্দারের ছেলে নজরুল ইসলাম (৪০)-এর সাথে। তিনি জানালেন, ছেলেবেলায় তার দুপায়ে হয়েছিল দুরারোগ্য ঘা। মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গার চিকিৎসকগণ জবাব দিলে, শুরু হয় কবিরাজের চিকিৎসা। তাও শেষ হলে নজরুলের বাবা মা হতাশ হয়ে মাদার পিরের দোহাই দিয়ে ছেলেকে পিরের দরগাহে ফেলে যান। তখন পিরের এখানে মাজার আর আশপাশে ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পরবর্তীতে নজরুল তার পায়ের ঘায়ে পিরের মাটি মেখে আরোগ্য লাভ করেন। এই পিরের দরগা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছে একটি কমিটি। সেই কমিটির প্রধান গ্রাম্য ডাক্তার। স্থানীয় হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকলেই কমিটির সদস্য। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদার পিরের সমাধিস্থলে গড়ে উঠেছে সূচক দরগা। এখনো দরগায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই মানত করেন। ফল-ফুল, মাটির পুতুলসহ পশু প্রভৃতি। মাদার পির সম্পর্কিত তথ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। তবে যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায়, যে মাদার পিরের জন্ম ও মৃত্যু নেই। এই লৌকিক পির এ অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় ও প্রান্তিক মানুষের কাছে পরম শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। এই পিরের দরগাকেই ঘিরে গড়ে উঠেছে সর্বধর্মের মহামিলন।

তথ্যনির্দেশ

১. মো. আব্দুল গনি (৭২), পিতা : জাহান আলী বিশ্বাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : সাহারবাটি, জেলা : গাংনী, মেহেরপুর, তারিখ: ১৭.১১.২০১১, সময় : সকাল ১১.০০টা
২. দীনেন্দ্র কুমার রায়, 'পৌষসংক্রান্তি', পল্লি বৈচিত্র্য, রচনাসমগ্র, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৪, পৃ. ১৫১
৩. তোজাম্মেল হক (৫৫), পিতা : আমির আলী মণ্ডল, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর, তারিখ : ১ বৈশাখ ১৪১৮, সময় : বিকাল ৪.০০টা
৪. শাশ্বত নিপ্পন (৪১), পিতা : শিবনারায়ণ চক্রবর্তী, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : ক্যাশ্বপাড়া, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ২৪.০৭.২০১১, সময় : সকাল ১০.০০টা
৫. সুধীর চক্রবর্তী, 'বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের গান', রচনা সংগ্রহ, কলকাতা, বইমেলা ২০১০. পৃ. ১৮২
৬. স্বামী অখণ্ডানন্দ (৬৫), মহারাজ, নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম, গ্রাম : কুতুবপুর, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : শ্রাবণী ঝুলন তিথি, ১৪১৮, সময় : সকাল ৯.০০টা
৭. দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'পল্লিচিত্র', দ্বি-মু, কলকাতা, আশ্বিন, ১৩৯০, পৃ. ৫২-৫৩
৮. তোজাম্মেল আযম, 'মেহেরপুর জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য', ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ১৩১
৯. দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১০. ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন (৪১), পিতা : গোলাম সরোয়ার, পেশা : ব্যবসা, গ্রাম : চিৎলা, গাংনী, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ২০.১১.২০১১, সময় : বিকাল : ৪.০০টা
১১. রমেন মল্লিক (৬০), প্রাক্তন শিক্ষক, বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুজিবনগর, মেহেরপুর, তারিখ : ০৫.০৭.২০১১, সময় : বিকাল ১১.০০টা

www.pathagar.com

আচার-অনুষ্ঠান

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে জীবন-জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত অথচ সংস্কৃতিধর্মী কিছু কিছু রীতিনীতি চালু হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্থান-পতনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। প্রজনন, খাদ্য ও অন্যান্য জৈব চাহিদা পূরণ, পরিবার ও সমাজ গঠন এবং এরই পরিপূরক অনেক আচার-আচরণ চালু হয়েছে। মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীন আবর্তনের মধ্যে একটু নতুনত্বের স্বাদ পেতে নানা আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জাতিভেদে, অঞ্চলভেদে, সম্প্রদায়ভেদে এগুলিতে বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক। তবে কিছু কিছু রূপভেদ ঘটলেও পৃথিবীর সর্বত্র লোকাচারে কিছু কিছু মিল দেখা যায়। সব আচার-অনুষ্ঠান দেশের সর্বত্র অভিন্নরূপে চালু নেই। অঞ্চলভেদে মূল কাঠামো ঠিক রেখেও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, জাতি ও সম্প্রদায়ভেদে, একই গ্রামের পরিবারভেদেও অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠানের সম্পর্ক নিবিড়।

বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলায় এমন মাস খুব কমই আছে যে মাসে একটা না একটা কোনো অনুষ্ঠান নেই। বাঙালির প্রাণশক্তি যেন এই উৎসব অনুষ্ঠানেই নিহিত।

দেব-দেবী, প্রকৃতি এবং অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন থেকে যেসব ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের প্রবর্তন হয়েছে, তাদেরকেই আচার বলে।

১. লোকধর্ম কেন্দ্রিক আচার

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে নদীয়া জেলার নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে কয়েকটি লোকধর্মের উদ্ভব ঘটে। হিন্দু, মুসলমান ধর্মের পাশাপাশি এই লোকধর্মগুলির বিস্তৃতি ঘটে। সমাজের পশ্চাদপদ, দারিদ্র্যপীড়িত, নিরক্ষর যারা 'লোক' নামে নাগরিক সমাজে পরিচিত, তারা এসব লোকধর্ম বা সাধন সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিল। ৩৪.১৪ বর্গমাইল বিস্তৃত অবিভক্ত নদীয়ায় যে সব লোকধর্মের উদ্ভব হয় তাদের মধ্যে বাউল, কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামভজা, খুশি বিশ্বাসী, সখীভাবুক, বৈষ্ণব অন্যতম। এছাড়াও অসংখ্য অজ্ঞাত লোকধর্মের আবির্ভাব হয় নদীয়া অঞ্চলে। এই লোকধর্মের সংখ্যা তেরো থেকে এক সময় ঊনচল্লিশে উপনীত হয়।

সমাজের নিম্নবর্ণ আশ্রিত এসব সাধন সম্প্রদায় সম্পর্কে বেশি কিছু জানা না গেলেও এরা সকলেই ছিল গুহ্য সাধনতত্ত্ব ও রহস্যময় আচার-আচরণে আগ্রহী। কালের আবর্তে এসব বিচিত্র লৌকিক ধর্মগুলি শীর্ণ অথবা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে একথা সত্য যে, উচ্চ বর্ণ এবং বড় ধর্মগুলির অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতার কারণে লৌকিক ধর্মগুলির উদ্ভব ঘটে। বৃহত্তর নদীয়ার অংশ হিসেবে মেহেরপুরেও কর্তাভজা,

www.pathagar.com

সাহেবধনী, বলরামভজা, বাউল সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে খ্রিষ্টধর্মের আবির্ভাব এবং কর্তাভজা ও সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মান্তকরণের ফলে লোকধর্ম দুটি বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর বলরামী সম্প্রদায়টির সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। তবু বলরামী সম্প্রদায় ও বাউলরা টিকে আছে মাথা উঁচু করে। উচ্চ ধর্ম ও উচ্চ বর্ণ যাদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়নি তারাই এসব লোকধর্মের অনুসারী।

বলরামী সম্প্রদায়

অষ্টাদশ শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং উচ্চ ধর্ম ও বর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে নদীয়া জেলায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই প্রতিবাদে অংশ নেয় নিম্নবর্গীয় মানুষ যারা অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তসীমায় বাস করতো, এরা সম্প্রদায়গত ভাবে হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্মের অন্তর্ভূক্ত হলেও পেশার কারণে ছিল অস্পৃশ্য। শুঁড়ি, ধোপা, যুগী, কলু, বারুই, ডোম, বাগদি, হাড়ি, মুচি, ভুঁইমালি, কৈবর্ত, বুনো, বেদে প্রভৃতি পেশার মানুষ ছিল উচ্চবর্ণের কাছে অস্পৃশ্য। এরাই মূলত প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নেয় এবং গড়ে তোলে বিভিন্ন লোকধর্ম। সংস্কৃত মন্ত্রের মহিমা ও গঙ্গাজলের পবিত্রতা না মেনে যে সকল লোকধর্মের উদ্ভব হয় সেগুলোর মধ্যে সাহেবধনী সম্প্রদায়, কর্তাভজা, বলরামী, খুশি বিশ্বাসী, বাউল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আঠারো শতকে নদীয়ায় তেরোটি লোকধর্মের আবির্ভাব হয়। এসব লোকধর্মকে বৈষ্ণব পণ্ডিত তোতারাম 'অপসম্প্রদায়' হিসেবে শনাক্ত করেন এবং এসব লোকধর্মের ক্রমবর্ধমান লোকপ্রিয়তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ঘোষণা করেন :

আউল বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখীভাবক স্মার্ত জাত গোঁসাই॥
অতি বড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে, এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি॥

তোতারামের মতে সে সময় তেরোটি লোকধর্ম বা অপসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এসব লোকধর্ম গজিয়ে উঠার পেছনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, ছুঁতমার্গ, আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি বেশ দায়ী। চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণবদের অনুদারতার কারণে শূদ্র শ্রেণিভুক্ত নিম্নশ্রেণির মানুষ অনেকেই উদার বৈষ্ণব মত ত্যাগ করে। একদিন যারা ব্রাহ্মণ্যবাদের নিগ্রহের শিকার হয়ে গৌরাঙ্গের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছিল, তারাই আবার বৈষ্ণব আশ্রিত ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা নিগৃহীত হয়। এই নিগৃহীত ব্রাত্যজনেরা নিজেদের মানবিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে স্বতন্ত্র সমাজ গড়ে তোলে। এমনই এক স্বতন্ত্র সমাজ বা লোকধর্ম সম্প্রদায়ের নাম বলরামী, বলরামভজা বা হাড়ি সম্প্রদায়। এই ধর্মের প্রবর্তকের নাম বলরাম হাড়ি। তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে মেহেরপুরের মালোপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্প্রদায়ের অনুসারীরা হাড়ি, ডোম, বাগদি, মুচি, বেদে, নমশূদ্র, হালদার এবং মাহিষ্য। অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গীয় মুসলমানরাও এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। বলরামী সম্প্রদায়ের উদ্ভব আঠারো শতকের শেষ দিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এ সম্প্রদায়ের ভক্ত ও অনুসারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় বিশ হাজার। নদীয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া,

www.pathagar.com

বর্ধমান, রাজশাহী, কলকাতা জেলার বিভিন্ন গ্রামে বলরামীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বলরাম হাড়ির মৃত্যু হয় বাংলা ১২৫০ সালের ৩০ অগ্রহায়ণ ৬৫ বছর বয়সে। মৃত্যুর পর তার দেহ দাহ বা সমাহিত করা হয়নি। ভৈরব তীরবর্তী মালোপাড়ার যে স্থানে বলরামের শব রাখা হয়েছিল, সেখানে পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীরা আখড়া ও মন্দির গড়ে তোলে। এটি বলরাম হাড়ির আখড়া নামে পরিচিত।

বলরামীরা বৈষ্ণবদের মতো পরকীয়াবাদ বা গুরুবাদে বিশ্বাস করে না। 'সদাচারী জীবনযাপন, পরকীয়া বর্জন' ও গুরুবাদহীনতা এ ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। তারা বলরাম হাড়িকেই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় গুরু বলে মানে ও জানে। তাই আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশদের তারা পছন্দ করে না। গুরু বা মুর্শিদে তাদের আস্থা নেই একেবারে। তারা সংস্কৃত মেশানো মন্ত্র উচ্চারণ না করে বাংলায় মন্ত্র বলে। প্রাত্যহিক জীবনে তারা যে রক্ষামন্ত্র পাঠ করে তা নিপাট বাংলায়। বেলতলায় সেবাপূজার জন্য তারা যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তা একেবারে সহজ বাংলায়। অন্য কোনো লোকধর্মের ক্ষেত্রে এ উদাহরণ পাওয়া যাবে না। তারা বাইরে যাওয়ার সময় যে মন্ত্রপাঠ করে তা হলো :

বলরাম চন্দ্র হাড়ি গোসাঁই
হাড় হাড্ডি মনি মগজ
তারক ব্রহ্ম রামনারায়ণ
জগৎ পতি জগৎ পিতা
হায়াত-মউতের কর্তা
তুমি আমার রক্ষাকর্তা।

এসব মন্ত্র আমাদের জানালেন মালোপাড়ার শৈলেন হালদার (৬৫)। তিনি বললেন, চার চিজে দেহ গঠন। এই চার চিজ হলো—হাড়, হাড্ডি, মনি (শুক্র) এবং মগজ। অবশ্য বাউলরা মনে করে, পঞ্চভূতে দেহ গঠন। এরপর দীনুর একটি দেহাত্মবাদী পদ গেয়ে শোনালেন যেখানে হাড়িরাম তত্ত্বের সারাৎসার নিহিত আছে :

কারিগরের কী খোদাগিরি
গড়াচ্ছেন ঘর বরাবরি
ঘরের গড়নদারের বলিহারি
কিবা কারিকুরি চারিধার॥
ঘরের ফেলে জোবাকাঠি
চার চিজের চার খুঁটি।
গড়লেন পরিপাটি
কী চমৎকার॥
ভেবে দীনু বলে, আমি
না চিনিলাম ঘরামি
ত্রিজগতের স্বামী রাম গড়নদার॥

বৃন্দাবন হালদারের মৃত্যুর (১৯৮৫) পর বিশুদ্ধ বলরামীর খোঁজ বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। কুষ্টিয়ার বারোখাদায় ৭০ ঘর বলরামী অছে, যারা বংশপরম্পরায় এ লোকধর্মটিকে ধরে রেখেছে। চুয়াডাঙ্গার মুন্সীগঞ্জের রামসেবক বিশ্বাস, কুষ্টিয়ার জুগিয়ার রঞ্জিতকুমার

www.pathagar.com

দাস, বারোখাদার অনন্ত দাস, বলাই দাসের কাছে পাওয়া বলরামীদের কয়েকটি বীজমন্ত্র এখানে উল্লেখ করা হলো :

হাড়িরাম হাড়িরাম
স্বয়ং রামচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন।
সীতাপতি হনুমানকে যেমন করে করিলেন উৎপত্তি
তেমনি নিজ গুণে কৃপাদানে
এ অধমের প্রতি করো গতি।
তুমি আমার মাতা-পিতা তুমি আমার পতি
শ্রীচরণে এ মিনতি॥
জয় হাড়িরামের জয়॥

বলরামীদের বীজমন্ত্রের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই এবং দুর্বোধ্যতাও নেই। এজন্য এ মন্ত্রের অর্থ জানতে গুরুর কাছে যেতে হয় না। এটা খুব সহজ ব্যাপার এবং তাদের দীক্ষাও দরকার হয় না। তারা হাড়িরামকে মাতা-পিতা এবং জগতপতি বলে মান্য করে। তারা বিশ্বাস করে যে, মাতার চার চিজ, বাপের চার এবং হাড়িরামের দশ চিজ নিয়ে মানবদেহ গঠন। মানবদেহের মাতৃবস্তু হলো—ত্বক, মাংস, রক্ত, কেশ এবং পিতৃবস্তু হলো—অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও স্নায়ু। আর জগৎপতির দশটি উপাদান হলো—দু চক্ষু, দু কর্ণ, দু নাসিকা রন্ধ্র, নাভি, মুখবিবর, পায়ু ও উপস্থ। মাতৃবস্তু, পিতৃবস্তু আরজগৎপতির দেওয়া দশ উপাদান মিলে হয় আঠারো মোকাম। আর এই আঠারো মোকাম জুড়ে যার অধিষ্ঠান তিনি হলেন হাড়িরাম। তাইতো বলরামীরা হাড়িরামকে দেবতা জ্ঞান করে পূজা করে। আর সে পূজায় যে মন্ত্রপাঠ করে তা হলো :

১. হাড়িরাম চন্দ্রের শ্রীচরণে ফুল জল দিলাম
ধরাতলে ধন্য হলাম।
রূপযৌবন নয়ন মন অর্পণ করিলাম।
আমি দুর্বল, দুর্বলেরই বল তুমি
সকল জানে অন্তর্যামী।
শুধু তোমারই গুণ গাই
গুণ অন্য কাহারো না জানি॥

২. হক হাড়িরামের চরণ ধোয়াইব
চরণামৃত পান করিব।
যৎ কিঞ্চিত গায়ে মাখিব
অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সেই পাত্রে রাখিব তুলে।

এসব মন্ত্র মেহেরপুরের মালোপাড়া ও কুষ্টিয়ার বারোখাদায় শোনা যায় বলরামীদের মুখে।

প্রথাগত ধর্মের অনানুষ্ঠানিক তারা একেবারেই আস্থা রাখেনি। তারা প্রতিদিন বলরামের উদ্দেশ্যে যে নৈবেদ্য দেয় তা সন্দেশ কিংবা কোনো মিষ্টান্ন নয়। তারা হাড়িরামকে নিবেদন করে চাল, ডাল, গুড় এবং নাড়ু।

বলরামীরা দীপ, ধূপ, নৈবেদ্য, গঙ্গাজলের মহিমা, সংস্কৃত মন্ত্র মানে না। এ ধর্মে নেই গুরুবাদ মহান্তগিরি, নেই সেলামি বা প্রণামির আকর্ষণ। এদের আস্থা নেই কায়া

www.pathagar.com

সাধনা কিংবা পরকীয়াবাদে। ব্রত-পার্বণ, উপবাস, জন্মাষ্টমী, রাস-ঝুলন, মনসাপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি পালন করে না। রামায়ণী গান, মহাভারতের অমৃতকথা, লক্ষ্মীর পাঁচালিতেও আকৃষ্ট হয় না। এদের উপাস্যের সমাধিমন্দিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে, আগরবাতি পোড়ায়, তেলজল দিয়ে হাড়িরামের পূজা করে।

বলরামীরা বছরে তিনটি উৎসব পালন করে। চৈত্র মাসের একাদশী, জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, কার্তিক মাসের একাদশী উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উদ্‌যাপন করে। তবে সবচেয়ে বড় উৎসব হয় চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে যাকে বারুণী তিথির মহোৎসব বলে। বারুণী উৎসবে তিন দিন মচ্ছব হয় মেহেরপুর মালোপাড়ার আখড়ায়। প্রথম দিন অন্ন মচ্ছব, দ্বিতীয় দিন চিড়ি মচ্ছব এবং তৃতীয় দিন লুচি মচ্ছব হয়। সেই সাথে চলে হাড়িরামের নাম সংকীর্তন। এ ধর্মে 'সখার সখী নেই, সখীর সখা নেই'—তাই এরা পরস্পর ভাই-ভাই অথবা ভাই-বোন। এ কারণে বলরাম হাড়ির আখড়াবাড়ির শেষ সেবাইত বৃন্দাবন হালদার এবং নিত্য সেবিকা রাধারাণী ছিলেন পরস্পর ভাই-বোন।

বলরামীদের সব আখড়া বা আশ্রম বেলতলাতে হয়ে থাকে। বেলকে তারা শ্রীফল বলে থাকে। এ ফল হলো আদ্যশক্তির স্তনের প্রতীক আর বেলতলায় থাকা মানে আদ্যশক্তির স্নেহছায়ায় থাকা। পহেলা মাঘ বেলতলায় এক ধরনের উৎসব হয় বলরামীদের। এ উপলক্ষে তারা নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে বেলতলায় চাল-ডাল দিয়ে খিচুড়ি রেঁধে খায়। এদিন মেয়েরা বেলতলায় লক্ষ্মীর পূজার মতন চালন দেয়। চালনে থাকে মুড়ি, মুড়কি, গুড় ও নাড়ু। বেলগাছে একটি ধুতি ও শাড়ি জড়িয়ে ধুতিকে পুরুষ এবং শাড়িকে প্রকৃতির প্রতীক বলে মনে করে তারা। এভাবেই তারা উচ্চ ধর্ম বা বর্ণের রিচুয়ালস ত্যাগ করে নিজেরা এক ধরনের রিচুয়ালস তৈরি করে নিয়েছে। এভাবেই তারা কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলে। যদিও তারা গঙ্গাস্নান করে না, দীক্ষা মন্ত্র নেয় না, মালা জপে না, আহ্নিক করে না এবং কাউকে প্রণাম করে না। তারা দেব-দেবতা, রাধাকৃষ্ণ ভজে না, তারা ভজে একজন মানুষকে। আর সে মানুষ হলো বলরাম হাড়ি।[১]

দরগা ও মাজার কেন্দ্রিক 'লৌকিক ইসলাম'

ইসলাম অপরিবর্তনীয় ও ধ্রুপদী ধর্ম হলেও এর অনুশীলন সকল সমাজ ও রাষ্ট্রে এক রকম নয়। বিশুদ্ধ ও ধ্রুপদী ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির সাথে মিলে তার বিশুদ্ধতা হারিয়ে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলাদেশে ইসলাম আসার পর এই ধর্মের আদল বদলে গিয়ে যে নতুন রূপ ধারণ করে তাই 'লৌকিক ইসলাম'। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে এই লৌকিক ইসলাম-এর উদ্ভব হয়। যে সকল কারণে লৌকিক ইসলামের উদ্ভব হয়েছে, তার মধ্যে হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ, পূজা-পার্বণ, ধর্মান্তরকরণ, অসাম্প্রদায়িক মানবিক চেতনার উন্মেষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এদেশে ইসলাম ধর্মের বিস্তারে মুসলিম শাসকদের চেয়ে পির-দরবেশরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। পির-দরবেশদের মানবিক আচরণ, চরিত্র-মাহাত্ম্য, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, মানবসেবায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তখন যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে

www.pathagar.com

তারা যতটা না ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছে তার চেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছে পির-দরবেশদের ব্যক্তিগত মাহাত্ম্য, মঙ্গলচিন্তা ও কেরামতির প্রতি। এর ফলে সে সব নবদীক্ষিত মুসলমানরা ইসলাম ধর্মের মূল দর্শনের কাছে যেতে পারেনি। তাছাড়া তারা নিম্নবর্গীয় মানুষ হওয়ায় তাদের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, ব্যবহার প্রাত্যহিক জীবন চর্যায় রয়েই যায়। ইসলাম ধর্মের বিষয় নয় অথচ ইসলামে আত্মীকৃত হয়েছে সেই সব ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কারণে। এভাবেই সৃষ্টি নতুন ধরনের ইসলাম যার নাম লৌকিক ইসলাম। লৌকিক ইসলামের বিকাশ ও প্রসারে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতিও একটা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তবে শাস্ত্রবহির্ভূত ইসলাম লৌকিক ইসলামে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের প্রায় সব মুসলমানই কোনো না কোনো পিরের অনুসারী। রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাও পির মানে এবং দরগা ও মাজারে যায়। বড়পির আব্দুল কাদির জিলানী, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, শাহজালাল, শাহ পরান, শাহ মখদুম, বায়েজিদ বোস্তামি, খান জাহান আলী প্রমুখ পির-দরবেশকে বাংলাদেশের মানুষ গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। তাঁদের মাজার ও দরগাকে পবিত্র স্থান বলে মনে করে। মেহেরপুরের কালাচাঁদপুরের শাহ ভালাই-এর দরগা, সুবিদপুরের শাহ দরগা, গোভীপুরের বাগু দেওয়ানের মাজার ও দরগা, বাগোয়ানের শেখ ফরিদের দরগা, মুজিবনগর তারানগরের মাদারপিরের দরগাকে কেন্দ্র করে মেহেরপুর অঞ্চলে লৌকিক ইসলামের ধারা গড়ে উঠেছে। সুদীর্ঘকালের ঐতিহাসিক পরম্পরায় গড়ে ওঠা সাধু-ফকির-পির-দরবেশদের মাজার ও দরগাগুলিকে লৌকিক ইসলামের সাথে যুক্ত সাধারণ জনগণ পবিত্র স্থান বলে মনে করে। লোকায়ত সাধনার সঙ্গে যুক্ত মানুষ বিশ্বাস করে, এসব পির-দরবেশ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তারা আরও বিশ্বাস করে, সাধকদের মৃত্যু হয় না, এরা 'জেন্দা পির'। ১৩ শ্রাবণ তারানগরের মাদার পিরের দরগা, ১৩ ফাল্গুন শাহ ভালাই-এর দরগা এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে বাগোয়ানের শেখ ফরিদের দরগায় ওরস পালন করা হয়। এছাড়াও সুবিদপুরের শাহ দরগা, শেখ ফরিদের দরগায় প্রতিদিনই শত শত রোগশোক পীড়িত মানুষ আরোগ্য লাভের আশায় শিরনি ও মানত নিয়ে আসে। ওরস উপলক্ষে এসব দরগায় ধর্ম-দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা ও গানের আসর বসে। বাগু দেওয়ানের মাজারপ্রাঙ্গণে প্রতিদিনই আউল-বাউলরা গানের আসর বসায়। লোকায়ত সাধনার সাথে যুক্ত সাধু-ভক্তরা পির-দরবেশদের 'আদর্শ মানুষ' মনে করে জীবন পরিচালনা করে। ফলে ওরস, আচার-অনুষ্ঠান, শিরনি-মানত, গানের বাহাসের মধ্য দিয়ে এসব পির-দরবেশ-মহাজনেরা স্মরণীয় হয়ে আছেন। এক একটি মাজার এক একটি গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হয়। সাদিমান দরগাই ও তার অনুসারীদের দ্বারা বাগোয়ানের শেখ ফরিদের দরগা, চিশতিয়াপন্থি সালেহা পাঠানের মাধ্যমে শাহভালাই-এর দরগা, বাউল সাধকদের দ্বারা বাগু দেওয়ানের দরগা পরিচালিত হয়। স্ব-স্ব পির দরবেশকে তারা শ্রেষ্ঠ মানব বলে মনে করে।

সারা দেশের মতো মেহেরপুরেও ইসলামের উন্মেষ ও বিকাশে পির-দরবেশদের ভূমিকা ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দরবেশ মেহেরুল্লাহ ওরফে শাহভালাই, শেখ

www.pathagar.com

ফরিদ, মেহমান শাহ, মালেকুল গাউস প্রমুখের মাধ্যমে মেহেরপুরে ইসলাম ধর্মের পরিধি প্রসারিত হয়েছে বলে স্থানীয় ইতিহাস চর্চার সাথে যুক্ত পণ্ডিতরা মনে করেন। গবেষক, পণ্ডিত ড. এনামুল হক-এর 'বঙ্গে সূফী প্রভাব' গ্রন্থের সূত্র ধরে বলা যায় পির-দরবেশরাই সারা দেশের মতো মেহেরপুরে লৌকিক ইসলামের ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

লৌকিক ইসলামের সাথে যুক্ত সাধক ভক্ত ও অনুসারীরা মূলত শাস্ত্রীয় ইসলামের বিরোধী। তাদের কাছে কৃষ্ণ ও মুহাম্মদ (সা.) একাসনে স্থান পায়, মা ফাতিমা ও মা কালীকে একই সাথে জগজ্জননী রূপে কল্পনা করে। যাদবপুরের গোলাম ঝড়ু শাহ মা ফাতিমাকে জগজ্জননী রূপে কল্পনা করে এক আসরে গেয়েছিলেন :

ফাতেমা যদি হয় আল্লার জননী।
তবে আলি আল্লার সুবাদে কি হয়
তাই আজ বলো শুনি।
একদিন সাঁই সোবহানে
মা বলে সে ডাকলে কেনে।
আল্লার পিতা হয় কোন জনে
নির্ণয় করি বলো শুনি।
ডিম্বরূপে গোলাকারে
ভাসলেন যখন নৈরেকারে।
বটপত্র স্থান পরে, আসন দিলো ফাতেমা যিনি।
পাঁচজন যখন ডিম্বে রইল
আল্লা কিভাবে কোন অঙ্গে ছিল।
তখন নৈরেকারে কী সাকার বলো
আহাদ কয় তাই না জানি।

হিতিমপাড়ার কবিয়াল রমজান আলীর একটি গানে লৌকিক ইসলামের মর্মবাণীই প্রকাশিত হয় :

মাগো তুমি জগত মাতা
তুমি সৃষ্টির জন্য হও মজুদা।
আউলেতে তিনি হয় ছেতারা
তাইতে তোমার নাম জহুরা।
খোদে ভেঙ্গে হও জাহেরা
তাইতে তোমায় বলে খোদা॥
আলেফের আহাম্মদ শুনি
মিম রূপে তুমি হও রূপিনী।
লাম হয় তোমার কাদের গনি
তুমি মাতা-তুমি পিতা॥
নীরেতে নূর হয় গো সৃজন
তাইতে তোমার নাম নিরঞ্জন।
এক অঙ্গে রয় পঞ্চ জন

www.pathagar.com

সৃষ্টি করলে পঞ্চআত্মা॥
কে বোঝে তোমার খেলা
যুগলরূপে করছে লীলা।
আদমকে গঠনে নিরালা
পেলো না কেউ অন্ত কোথা॥
রমজান বলে, দুজন হতে এসেছিলাম এই জগতে।
আবার কি যে হবে যেতে
পথের সম্বল তুমি খোদা॥

এসব গান লোকসাধকেরা কেবল আনন্দরসে অবগাহন করার জন্যই গায় না, তারা এসব গানকে কালাম হিসেবে বিশ্বাসও করে। মেহেরপুরের লৌকিক ইসলামের ধারাটিকে প্রসারিত করতে বেশি ভূমিকা পালন করেছেন মরমি সাধকরা। এক্ষেত্রে ফকির লালন সাঁই নাম উচ্চারিত হয় সবার আগে। পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ, আরজান শাহ, আজাদ শাহ, গোফুর মুন্সি, মসলেম আলী, দায়েম বিশ্বাস, মাহতাব চিশতী ওরফে মাতু ফকিরের নামও লৌকিক ধর্মের পরিসরে উচ্চারিত হয়। মেহেরপুরের দরগা-মাজার-আখড়ায় অনুষ্ঠিত ওরস ও সাধুসেবায় মরমি সাধকদের গানই গীত হয়। ঢোল-করতাল-একতারা-দোতারা-জুড়ির তালে সেসব দরগা ও মাজারপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। সারারাত ধরে চলে শরিয়ত-মারফতির পালা কিংবা বিচ্ছেদ গান। পির দরবেশদের সমাধিপ্রাঙ্গণে মৃত্যু দিবসেও থাকে না শোকের ছায়া, বরং থাকে উৎসবের আমেজ। মৃত্যুদিবস উপলক্ষেই মাজারপ্রাঙ্গণগুলিতে সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হয়।

বিভিন্ন সময়ে শাহ ভালাই-এর দরগা, বাগু দেওয়ানের মাজার, মাজার পিরের দরগা, লাফা সাধুর মাজারপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ওরস ও সাধুসেবায় পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি কেবল গানের আসর। এ গানে যেমন আল্লাহ ও রসুলের প্রসঙ্গ আছে তেমনি রয়েছে মানুষ ও মানবতার কথা। লোকধর্মের সাথে যুক্ত সাধকরা মূলত গুরুবাদী। গুরু তাদের কাছে পতিতপাবন, পরমেশ্বরের মতো। তৌহিদ সরকার ভৈরব তীরবর্তী বাগু দেওয়ানের মাজার অনুষ্ঠিত এক আসরে কুবির গোসাঁই-এর একটি গান গেয়েছিলেন :

আমি কি জানি ভাব জানাও প্রভু নিজ গুণে
তোমার ভাব একি অসম্ভব শিব জেনেছে কিঞ্চিৎ ধ্যানে॥
আপনি রোগী, আপনি বৈদ্য, আপনি যোগী, আপনি সিদ্ধ
আপনি হলেন মহা আরোগ্য, প্রেম ধারা বয় নয়নে
আপনি কাঁদ, আপনি হাস, আপনি কাঙাল আপনি ধনে॥
আপনি মন্ত্র, আপনি মন্ত্রী
আপনি তন্ত্র, আপনি তন্ত্রী
আপনি যন্ত্র, আপনি যন্ত্রী
না বাজালে বাজবে কেনে।
আপনি গাও, আপনি শোন,
আপনি বোঝ তার মানে॥
আপনি তরঙ্গ, আপনি তরী,

www.pathagar.com

আপনি মাঝি, আপনি দাঁড়ি
আপনি বেয়ে তরাও তরী,
পার করো ঘোর তুফানে।
সকল মিলে তোমার উপায়
কুবিরকে রেখ চরণে॥

শুধু মেহেরপুরের দরগা ও মাজারগুলিতে গানের আসর বসে না, ভেড়ামারার গোলাপনগরের সোলেমান শাহর মাজারপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ওরসেও বাউল তথা মরমি গানের আসর বসে। আর এ গানের মধ্য দিয়ে লৌকিক ইসলাম ও সংস্কৃতির মূল ভাবটি মূর্ত হয়ে ওঠে। শরিয়তপন্থি বা শাস্ত্রীয় ইসলামের সাথে লৌকিক ইসলামের সংঘর্ষ চলছে কয়েক শতাব্দী ধরে। তথাপি লৌকিক ইসলামের ধারাটিকে বন্ধ করা যায়নি। আর এ কারণে সমাজের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন ও চেতনা থেকে মাজার ও দরগা কেন্দ্রিক লৌকিক ইসলামকে পৃথক করা যায়নি।[২]

বাউল ধর্ম

১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে ফকির মন্টু শাহ্ নামে এক সাধক বাউল সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে কুষ্টিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এক মুসলমান অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে তিনি বলেন :

আমরা বাউল
আমাদের ধর্ম আলাদা
আমরা না মুসলমান না হিন্দু
আমাদের নবী সাঁইজি লালন শাহ
তাঁর গান আমাদের ধর্মীয় শ্লোক।
সাঁইজির মাজার আমাদের তীর্থভূমি।
আমরা যারা তাঁর ভক্ত আমরা সকলেই এক বিশেষ নিয়মে ভেক গ্রহণ করি।
আমাদের সৃষ্টি নেই মানে বিবাহ নেই, সন্তান জন্ম নেই
আমাদের গুরুই রসুল।

ডক্টর সাহেব (মুসলমান অধ্যাপক) আমাদের এই তীর্থভূমিতে ঢুকে আমাদের ধর্মের কাজে বাধা দেন। কোরআন তেলাওয়াত করেন, মিলাদ মাহ্ফিল করে থাকেন, এসবই আমাদের তীর্থভূমিতে আপত্তিকর। আমরা আলাদা একটা জাতি, আমাদের কালেমাও আলাদা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লালন রসুলুল্লাহ্।

জীবদ্দশায় লালন সাঁই নিজেকে কখনও নবী বলে দাবী করেননি। এমনকি ভোলাই শাহ্, শীতল শাহ্, দুদ্দু শাহ্, মনিরুদ্দীন শাহ প্রমুখ লালন-শিষ্যরাও লালনকে নবী বলে দাবী করেন নি। কিন্তু তাঁর প্রয়াণের শতবর্ষ পরে গড়ে ওঠা শিষ্যমণ্ডলীর অনেকেই তাঁকে নবী, রসুল এবং ধর্ম প্রবর্তকের পদে উন্নীত করেছেন। মেহেরপুরের কাজীপুর গ্রামের ফকির দবির উদ্দীন শাহ লালনকে নবী না মানলেও আল্লাহর ওলি হিসেবে মানতেন। তিনি মনে করতেন, লালন ছিলেন দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন পরিশুদ্ধ আত্মার কামেল পুরুষ। সিংহাটির আফসার ফকির মনে করেন তিনি উঁচু স্তরের সাধক এবং

www.pathagar.com

আল্লার ওলি। লালনকে নবী, রসুল কিংবা ধর্ম প্রবর্তকের পদে উন্নীত করার প্রশ্নে খোদ বাউলদের মধ্যেই মতদ্বৈধতা রয়েছে। ফকির মন্টু শাহের দাবিকে ক্ষমতা নির্দেশক বলেও অনেকে মনে করন। তিনি মূলত বাউলসমাজে তাঁর অবস্থানকে সুসংহত করার জন্যই এ ধরনের কথা জাহির করেছেন।

বাউলরা লালনকে নবী না মানলেও তাঁর গান, বাণী, দর্শন ও সাধনতত্ত্ব জীবন চর্যার অপরিহার্য অনুষঙ্গ বলে মনে করে। বাউলদের মধ্যে পাঁচটি ঘরানা থাকলেও লালনকেই বাউল দর্শন ও ধর্মের শিরোমণি হিসেবে মান্য করা হয়। লালনপন্থিসহ সব বাউলরা লালনের গানকে জীবনের একমাত্র প্রতিপাদ্য বলে বিশ্বাস করে। লালন নির্দেশিত পথে তারা জীবন পরিচালনা করে। মেহেরপুরের গোলাম ঝড়ু শাহ তো লালন মত ও পথকে ধ্রুবসখা মেনে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করেছেন। ঝড়ু শাহ হিন্দু ব্যাধ সম্প্রদায়ভূক্ত হলেও বিয়ে করেন মুসলমান মলিজানের সাথে ফকিরি মতে। বিয়ে করেও তাঁরা কোনো সন্তান উৎপাদন করেননি। তিনি মনে করতেন, আত্মরতি খণ্ড করেই পুত্র-কন্যার জন্ম দিতে হয়। আর পুত্র-কন্যার জন্ম দেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে পুনর্জন্মের ফেরে পড়তে হয়। লালনে নিমগ্ন এই সাধক বাউল দুদ্দুশাহর ভাষায় বলতেন :

আত্মরতি খণ্ড করে শরিক হয়
পুত্রকন্যা রূপে পুনর্জন্ম তারে কয়॥
পুত্রকন্যার মধ্যে সেথা
থাকে বেঁচে পিতামাতা
এই রূপে সৃষ্টির প্রথা বলিয়া যায়॥
'জন্মিয়ে যাতনা প্রাপ্তি' ছাড়া আর কিছুই নাই।

গোলাম ঝড়ু শাহ, আরজান শাহ, আতাহার শাহ, আমীর চাঁদ, কলিমুদ্দীন শাহ, মাতু ফকির, আজাদ শাহ, দবিরউদ্দী শাহ, মোফাজ্জেল শাহ, জামাল শাহ, কাতব শাহর মতো অসংখ্য বাউল মেহেরপুরে ছিল এবং আছে। এরা সমাজ জীবনে পিতৃদত্ত মুসলমান কিংবা হিন্দুয়ানি নাম বহন করলেও মন-মননে, চর্চায় ছিলেন আলাদা মানুষ। এরা যে ধর্ম বিশ্বাস লালন করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র বহির্ভূত অবৈদিক ধর্মই। এ ধর্মে ও গানে আল্লাহ, রসুল ও ইসলাম প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি রাধা-কৃষ্ণ, গৌর-নিতাই-এর কথাও শোনা যায়। শাস্ত্র, বিশ্বাস আর লোকাচারকে বড় করে না দেখে, মানুষকে বড় করে দেখে তারা। ফতেহপুরের দৌলত শাহের আখড়ায় শৈলেন হালদার নামে এক বাউল গায়ক এমন ধরনের সমন্বয়বাদী গান গেয়েছিলেন।

মক্কায় এলেন মোহাম্মদ
মথুরাতে গেলেন শ্যাম
ইমাম খেলা খেলেন রসুল
লীলা খেলেন ঘনশ্যাম
মা আয়েশা পাগল হলেন
নবীর প্রেমে মদিনায়
বাঁশির সুরে পাগল হয়ে
রাধা চলে যমুনায়

www.pathagar.com

একই মায়ের দুটি সন্তান
হিন্দু আর মুসলমান।

তাঁরা মানুষকে বড় করে দেখে বলে, শাস্ত্র-মূর্তি, মন্দির-মসজিদ, নামাজ-রোজা, আহ্নিক, তীর্থ-ব্রত বিষয়ে আস্থাশীল নয়। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, পরকাল বিষয়ে আস্থাশীল নয়। তবে গুরুর প্রতি প্রবলভাবে বিশ্বাসী। লালনের গানের মাধ্যমে তারা ঘোষণা দেয় :

যেহি মুরশিদ সেহি রসুল,
ইহাতে নয় কোনো ভুল,
খোদাও সে হয়
এ কথা লালনে না কয়,
এ কথা দলিলে কয়।

দিঘিরপাড়ার সালাউদ্দীন ফকির জানান, গুরুর প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় না। গুরু ধ্যানের মাধ্যমে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়। আবার গুরু রয়েছে কয়েক প্রকারের। যেমন—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরু শিক্ষা দান করেন আর দীক্ষাগুরু সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বীজমন্ত্র দান করেন। সাধন ভজনের প্রথম পর্ব হলো চালপানি আর সিদ্ধির পর্যায়ের দীক্ষা হলো ভেক খেলাফত গ্রহণ। দৌলত শাহ খেলাফত নেন পিরোজপুরের আইনুদ্দীন শাহর কাছে, ঝড়ু শাহ নেন জোনাব আলী শার কাছে, জামাল শাহ নেন দিঘিরপাড়ার আরাফাত শাহর কাছে, সাহারবাটির মজিদ ফকির ও আলেয়া ফকিরানি নেন সাহারবাটির হারেজান ফকিরানির কাছে। মালোপাড়ার শৈলেন হালদার চালপানি নেন নাসির শাহর কাছে আর আঁচলা নেন জামাল শাহর কাছে। বাউলরা প্রাতিষ্ঠানিক রিচুয়ালস মানেন না। তথাপি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারাও রিচুয়ালস তৈরি করেছেন। যেমন—দিঘিরপাড়ার বরকত ফকির বললেন, চালপানি নেয়ার সময় গুরু তাঁর ভক্তের ডান হাতের তালুতে পাঁচটা চাল দেন এবং বাম হাতে এক গ্লাস পানি ধরিয়ে দেন। ভক্ত বিসমিল্লাহ্ বলে গুরুর নামে চাল ও পানি খেয়ে নেন। এরপর গুরু ভক্তকে পাঁচ কালেমা ও ওজিফা দেন। ওজিফা হলো :

বিসমিল্লাহ
মুরশিদ আল্লাহ
লাইলাহা ইল্লালাহু।

বাউলরা তাদের সাধনতত্ত্ব কিংবা গুরুমন্ত্র সম্পর্কে মুখ খুলতে চায় না। কারণ তারা বলে :

আপন ভজন কথা,
না কহিবেক যথা তথা
আপনি হইতে আপনি হইবেক সাবধান।

মেহেরপুর ক্যাশ্ববপাড়ার জামাল শাহ জানালেন আর একটি চালপানি নেওয়ার মন্ত্র :

চাল জল কাঁচা তুমি
কাঁচা আমি
কাঁচা আদিমূল

www.pathagar.com

কাঁচা সূর্য কাঁচা চন্দ্র
ভোগে ভাত
পিপাসায় পানি
আমার শরীর ঠাণ্ডা রাখবেন
মা বরকতের জননী।

গুরুমন্ত্র বা কালেমার মধ্যে স্থান ও গুরুভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে গুরু শিষ্যকে ধর্মের নিগূঢ় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন। বাউলদের ভাষায় একে চক্ষুদান করা বলা হয়। চালপানি গ্রহণের পর গুরুর নির্দেশিত রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী শিষ্য গুরুকে সেজদা করে। গাংনীর সাহারবাটির মজিদ ফকির ও তাঁর স্ত্রী আলেয়া ফকিরানী দুজনেই খিলকাধারী সাধু। তাঁরা গত বছরের ৫ ভাদ্র খিলকা গ্রহণ করেছেন। আলেয়া গুরুভক্তির মন্ত্রটা আমাকে শোনালেন :

মুরশিদ রতি,
মুরশিদ পতি,
মুরশিদ নয়ন গুরু,
আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর,
বাঞ্ছা কল্পতরু।
মুর্শিদ সত্য।

তিনি বলেন, "সেজদা দেওয়ার সময় আমরা সবসময় গুরুর রূপ মনে মনে কল্পনা করি। কারণ বরজখ ছাড়া সেজদা হারাম। সাধু হওয়া এক জনমের কাজ নয়। গুরুরূপে নয়ন না থাকলে সাধক হওয়া যায় না।" তাইতো তাঁরা বলে :

গুরু রূপে নয়ন দেরে মন
গুরু বিনে কেউ নাই তোর আপন॥

গুরুবাদ মরমি সাধনার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কেন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাহারবাটির গোলাম মাস্টার তাঁর গুরু আজাদ সাঁই-এর একটি পদ শোনালেন :

মুরশিদ বিনে আর কেই নাই জগতে॥
সাধলে চরণ করবে চেতন, নিয়ে যাবে অচিনপথে
যার আছে মনের বাসনা, মুরশিদ ধরে নিবা পথের বীণা
সে ছাড়া আর কেউ পারবে না আঁধার নাশিতে॥

বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে একজন বাউল সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারে। খেলাফত বা ভেক গ্রহণের পর বাউলের উচ্চতর স্তরে উপনীত হওয়ার দীক্ষানুষ্ঠান। খিলকা বা ভেক গ্রহণের আগে দীক্ষার্থী শিষ্যকে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দেন। এজন্য গুরু, দীক্ষার্থী এবং দীক্ষার্থীর সেবাদাসী একত্রে মিলিত হন। এ সময় অন্য কারো থাকার নিয়ম নেই। এ পর্যায়ে গুরু দীক্ষার্থীকে বীজমন্ত্র দেন এবং গুহ্য সাধনতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। দীক্ষাগুরু কিংবা তাঁর অবর্তমানে গুরুমা শিষ্যকে বীজমন্ত্র ও খিলকা দিতে পারেন। গুরু শিষ্যকে কানে কানে শোনায় :

অর্ধ উর্দ্ধ ষোলোতলা
রতির ঘরে বসে কালা

www.pathagar.com

রতি যেন যায় না মারা
দোহাই কালা, দোহাই কালা।

মন্ত্র গ্রহণের পর শিষ্য গুরু প্রদত্ত মন্ত্রকে সার করে পথ চলে সারা জীবন। পর দিন দীক্ষার্থীকে নদীতে অথবা বাড়িতে ভালো করে স্নান করানো হয় এবং শামিয়ানার নিচে আনা হয়। অতঃপর দীক্ষার্থীর শরীর থেকে খুলে নেয়া হয় শরিয়তি পোশাক, তাকে পরানো হয় খিলকা নামের সেলাই বিহীন এক খণ্ড সাদা কাপড় ও তহবন। পরানো হয় ডোর কোপানি, লেঙ্গটি, পাগড়ি। ডোর কোপানি পরানোর অর্থ হলো কামের ঘরে কপাট মারা। গুরুমা পরান জপমালা বা তসবিহ। এসবই প্রতীকী অর্থে পরানো হয়। সবশেষে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় ছবি ও পানির পাত্র। দীক্ষার্থীর সেবাদাসী বা সাধনসংগীকেও পাড়বিহীন খিলকা পরিয়ে দেওয়া হয়। খিলকা নেওয়ার অর্থ হলো 'জেন্দা দেহে মরার বসন'। খিলকা পরিহিত সাধক যুগলকে দীক্ষাগুরু নিম্নস্বরে গুরুমন্ত্র ও কালেমা শোনান। খিলকা গ্রহণের পর জগত সংসারের কাছে তাদের চাওয়ার কিছু থাকে না। এরপর সাধনার্থী যুগলকে চোখ সাদা রুমাল দিয়ে বেঁধে লালন সাঁইজি অথবা অন্য কোনো সাধুর মাজার সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। এ ধরনের দৃশ্য দেখেছিলাম সাধক আজাদ শাহের আখড়াবাড়িতে যখন তাঁর পুত্র আব্দুল মজিদ এবং পুত্রবধূ আলেয়া খিলকা গ্রহণ করছিলেন। তাঁদের ভেক নেয়ার পর পর বড়শীবাড়িয়ার ছুরাত ফকির গান ধরলেন :

কে তোমারে এ বেশ ভূষণে সাজাইল বলো শুনি
জিন্দা দেহে মরার বসন খিলকাতাজ আর ডোর কোপিনী।
জিন্দা-মরার পোশাক পরা
আপন ছুরত আপনি সারা
ভবলোককে ধ্বংস করা
দেখি অসম্ভব করনি॥

এ এক বেদনা বিধুর দৃশ্য। দুজন অসহায় নর-নারী-ভব সংসারের দাহ থেকে মুক্তির আশায় অন্তিম যাত্রায় সেজেছে। এ দৃশ্য দেখে বাউল-বৈদিক নির্বিশেষে উপস্থিত সকলেই অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। আবেগ মণ্ডিত কণ্ঠে ছুরাত ফকির আবার গাইল :

সেজেছ সাজ ভালোই তরো
মরে যদি বাঁচতে পারো
লালন বলে যদি ফের
দুকূল হবে অপমানি॥

গানের রেশ শেষ হতে না হতে শুরু হয় গ্রাম পরিক্রমা এবং ভিক্ষা সংগ্রহ। পেছনে থেকে সাধু, ভক্ত, অনুরাগীর দল। ভেক-ভিক্ষার সময়ও লালনের একটি গান গাওয়া হয় :

আজ আমায় কৌপীন দে গো ভারতী গোসাঁই।
কাঙাল হবো মেঙে খাব রাজরাজ্যের আর কার্য নাই॥
এমনি যদি নাহি পারি
ভিক্ষার ছলে বলব হরি

www.pathagar.com

এই বাসনা মনে করি
বলিব না ঠাঁই অঠাঁই।

ভিক্ষার শেষে আখড়াবাড়ি ফিরে আসতে হয়। ভিক্ষালব্ধ চাল-ডাল রেঁধে সাধু-গুরুদের খাওয়াতে হয়। লালনপন্থি সাধক ও গায়ক শৈলেন হালদারকে ভেক-খিলাফত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানালেন,

"ভেক খিলাফতের দুটি ধারা আছে। একটি লালন শাহী ধারা আর অপরটি সতীমার ধারা। লালন শাহী ধারার খিলাফতে আঁচলা আর সতীমার ধারায় ভেকে আঁচলা ঝোলা।"

প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে শাস্ত্র বহির্ভূত সম্প্রদায় হিসেবে বাউল সম্প্রদায়ের আবির্ভাব বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। বাউলরা মসজিদ-মন্দিরে যায় না আবার নামাজ-রোজা পূজা-আহ্নিকও করে না। এরা প্রতিষ্ঠান ও লোকাচার বিরোধী হলেও কিছু কিছু লোকাচার নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছে। মেহেরপুর জেলাকে বাউল অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে শনাক্ত করা হয়। কারণ এ জেলার প্রায় সব গ্রামেই বাউল ফকির ও আখড়া রয়েছে। মেহেরপুরের ফতেহপুর, যাদবপুর, ইছাখালি, রাজাপুর, গোভীপুর, বাড়িবাঁকা, পিরোজপুর, সিংহাটি, টেঙ্গার মাঠ, যাদুখালি এবং শ্যামপুর, গাংনীর আকুবপুর, সাহারবাটি, কসবা, ভাটপাড়া চিৎলা গ্রামে বাউলের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো।[৩]

ফতেহপুরের দৌলত শাহর আখড়া, টেঙ্গারমাঠের আতাহার শাহর আখড়া, যাদুখালির লাফা সাধুর আখড়া, সাহারবাটির গোলাম মাস্টারের আখড়া, আকুবপুরে মাতু ফকিরের আখড়া, গৌরীনগরের কাতব শাহর আখড়া, ভাটপাড়ার সাজদার ফকিরের আখড়া, কসবার শামসুল ফকিরের আখড়া, দিঘিরপাড়ার সালাউদ্দীন ফকিরের আখড়ায় প্রতি বছরে কয়েকটি সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। যাদবপুরের কলিমুদ্দীন শাহ-র আখড়ার নাম সারা দেশের মরমি সাধকরাই জানেন।[৪]

২. মাজার, আখড়া, আশ্রমকেন্দ্রিক বাউলদের আচার

মেহেরপুর বাউল ভাবাপন্ন জেলা। কর্তাভজা, সাহেবধনী, খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বাউলরা বহাল তবিয়তে টিকে আছে। জেলার বিভিন্ন গ্রামে রয়েছে অর্ধ শতাধিক আখড়া, আশ্রম ও সাধনপীঠ।

বছর জুড়ে জেলার বিভিন্ন আখড়ায় অনুষ্ঠিত হয় সাধুসেবা। প্রতিরাতে এসব আখড়ায় শোনা যায় বাউল তথা মরমি গান। বাউলভক্ত ও সাধকরা আখড়া-আশ্রমকে তাদের তীর্থস্থান বলে মনে করে। বাউলদের যে সকল সাধনপীঠ এ জেলায় রয়েছে সেগুলো বিবরণ দেওয়া হলো :

দৌলত শাহর আখড়া

মেহেরপুর জেলার ভৈরব তীরবর্তী ফতেহপুর গ্রামে মরমি ভাবুকতার অগ্রগণ্য সাধক দৌলত শাহ একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। সাধক দৌলত শাহর প্রতি বৃহত্তর কুষ্টিয়ার

www.pathagar.com

বাউল ফকির ও সাধকদের রয়েছে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। ৮ আষাঢ় অমাবতী তিথিতে এ আখড়ায় বিশাল সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়।

আতাহার শার আশ্রম

১৯৮০-র দশকে সতীমা ঘরানার সাধক আতাহার শাহ মেহেরপুর জেলার টেঙ্গার মাঠ গ্রামে এ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। ২৭ আষাঢ় আতাহার শার প্রয়াণদিবস, ১৬ মাঘ আতাহার শার গুরু আমীর চাঁদে প্রয়াণদিবস, ১৯ আষাঢ় ভেলু শার প্রয়াণদিবস, ২০ অগ্রহায়ণ আমীর চাঁদের সেবাদাসীর প্রয়াণদিবসে এ আশ্রমে সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রম প্রাঙ্গণে রয়েছে দরবেশ আমীর চাঁদ, আতাহার শাহ, মলিজান ফকিরানি, রমজান ক্ষ্যাপা, ভেলু শাহর মাজার। আমেরিকা, কানাডা ও ইংল্যান্ড থেকে লোকগবেষকরা এ আশ্রমে এসেছেন বলে জানান আতাহার শাহর কন্যা তাহমিনা খাতুন।

রজব শাহর আখড়া

লালনপন্থি বাউল রজব আলী শাহ মেহেরপুরের শ্যামপুর গ্রামে এ আখড়াটি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামপুর গ্রামে রয়েছে শতাধিক বাউলের বসবাস।

কালি শাহর আখড়া

ভৈরবের গা ঘেঁষে যাদবপুর গ্রামে বাউল সাধক কলিমুদ্দীন ওরফে কালি শাহ ১৯৭০ দশকে গড়ে তোলেন বিশাল আখড়াবাড়ি। ৫ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ আখড়াবাড়ির খ্যাতি ছিল দেশ জুড়ে।

কলিমুদ্দীন ছিলেন সতীমা ঘরানার বাউল সাধক। তাঁর গুরুর নাম ফটিক মণ্ডল। ৩০ ফাল্গুন আখড়ায় সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। এক সময় ৩০ ফাল্গুনের সাধুসেবায় হাজার হাজার বাউল, সাঁই, দরবেশের ভিড়ে আখড়াসহ যাদবপুর গ্রাম ভরে যেত। কলিমুদ্দীনের মৃত্যুর পর এখানে আর সাধুসেবা হয় না। আখড়াবাড়িতে রয়েছে কলিমুদ্দীন ও সেবাদাসী জোবেদার মাজার।

মাতু ফকিরের মাজার

মরমি সাধক, সুগায়ক, পদরচয়িতা মাহাতাব চিশতী ওরফে মাতু ফকিরের জন্ম গাংনীর আকুবপুর গ্রামে। মৃত্যুর পর তাঁকে আকুবপুর গ্রামে সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর ২৮ অগ্রহায়ণ মাতু ফকিরের প্রয়াণদিবসে তাঁর মাজারপ্রাঙ্গণে আউল-বাউল ও চিশতিয়াপন্থি সাধকদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

মফেজুদ্দী শার আখড়া

মেহেরপুরের বৈকুণ্ঠপুরে মফেজুদ্দী শার আখড়াটি অবস্থিত। লালন ভাবাদর্শে নিমগ্ন মফেজুদ্দী শার রয়েছে অসংখ্য ভক্ত।

হোসেন শার আখড়া

সাধক, তত্ত্বজ্ঞ হোসেন শাহ মেহেরপুরের বাবরপাড়া গ্রামে একটি আখড়াবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। জেলা জুড়ে আখড়াটির পরিচিতি রয়েছে। হোসেন শাহর গুরু ছিলেন দরবেশ আমীর চাঁদ। ১৬ মাঘ এ আখড়ায় সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

দবির উদ্দীন শাহর আখড়াবাড়ি

মেহেরপুর জেলার কাজীপুর গ্রামের দবির উদ্দীন শাহর আখড়া এ অঞ্চলের সাধকদের কাছে পুণ্যভূমির মতো। প্রতিদিনই এ আখড়ায় বসে সাধুর সাধবাজার। দবিরের আখড়াটি ছিল তার গুরু মোফাজ্জেল ফকিরের আখড়া। মৃত্যুকালে তিনি দবিরকে আখড়াবাড়িটি দিয়ে যান। এখানেই রয়েছে মোফাজ্জেল ফকিরের মাজার। ৭ আগস্ট ২০১১ দবিরের মৃত্যুর পর তাঁকেও এ আখড়াপ্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। 'লালনের ছায়া' দবিরের নামে গড়ে ওঠা এ আখড়ায় ১৯ অগ্রহায়ণ ও ১৯ আশ্বিন অনুষ্ঠিত হয় দুটি বিশাল সাধুসেবা। এসব সাধুসেবায় কয়েক হাজার বাউলের জমায়েত হয়। এ আখড়ায় 'অন্ধ নিরঞ্জন' ছবির চিত্রায়ণ হয়েছে।

গোলাম ফকিরের মানবআশ্রম

মেহেরপুর জেলার কাজলা তীরবর্তী সাহারবাটির 'ওপারের মাঠে' ফকির গোলাম মাস্টার প্রতিষ্ঠা করেন বাউল আখড়া মানবআশ্রম। গোলাম মাস্টারের গুরু আজাদ শাহ ছিলেন খ্যাতিমান পদরচয়িতা। প্রতি বছর ৯ পৌষ আজাদ শাহের প্রয়াণদিবসে এ আখড়ায় বিশাল সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। মানবআশ্রম ছাড়াও সাহারবাটির গ্রামে রয়েছে শামসুদ্দীন শাহ, রশিদ ফকির, কিয়ামত ফকির ও লতিফ ফকিরের আখড়া। এসব আখড়ায়ও সাধু ও ফকিরদের পদচারণা পরিলক্ষিত হয়।

শামসুল ফকিরের আখড়া

গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে রয়েছে শামসুল ফকিরের আখড়া। লালন শাহী ঘরানার এই সাধকের রয়েছে কয়েক শত ভক্ত।

সালাউদ্দীন ফকিরের আখড়া

মেহেরপুর শহর সংলগ্ন দিঘিরপাড়ায় রয়েছে সতীমা ঘরানার সাধক সালাউদ্দীন শাহর আখড়া। সালাউদ্দীন শাহ গুরুর নাম আজের শাহ। মরমি সাধনায় নিমগ্ন এই সাধকের পিতাও একজন সাধক ছিলেন। প্রতিদিন এ আখড়ায় গান ও তত্ত্বালোচনার আসর বসে।

গরীবুল্লাহ শাহর আখড়া

মরমি সাধক, সুগায়ক, বয়াতি গরীবুল্লাহ শাহ জীবদ্দশায় গাংনী উপজেলার কাথুলী গ্রামে একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পর এই সাধককে কাথুলীর আখড়াবাড়িতে সমাহিত করা হয়।

'মান্যমান' গরীবুল্লাহ শাহর আখড়া ও মাজারকে এ অঞ্চলের বাউল ফকির ও সাধকরা পবিত্র সাধনপীঠ বলে মান্য করে।

চেরাগ শাহর মাজার ও আখড়া

বাউল সাধক চেরাগ শাহ নিজ গ্রাম রাজাপুরে একটি বাউল আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। তিরোধানের পর এই সাধককে আখড়াপ্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর এ আখড়ায় চেরাগ শাহপুত্র বাদশাহ ফকির সাধুসেবার আয়োজন করে।

www.pathagar.com

গোলাম ঝড়ু শাহর আখড়া ও মাজার

বাউলসাধক, সুগায়ক ও দোতারাবাদক গোলাম ঝড়ু শাহর জন্ম চুয়াডাঙ্গার আলোকদিয়া গ্রামে। তিনি ছিলেন লালনের গানের খ্যাতিমান গায়ক ও তত্ত্বজ্ঞ। দোতারাবাদক হিসেবে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মৃত্যুর পর তাঁকে যাদবপুর গ্রামে সমাহিত করা হয়। তাঁর মাজারকে সাধনপীঠ বলে মনে করে সাধক, গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রীরা।

এছাড়াও আমঝুপির গোলাম শাহ, চাঁদপুরের মজিবর শাহ, জালশুকার লুৎফর শাহ, দিঘিরপাড়ার আরাফাত শাহ, গৌরীনগরের কাতব শাহ, ইছাখালির আরজান শাহ, রামনগরের রাব্বানী ফকিরের আখড়ায় সাধুসেবা হয়ে থাকে। যাদুখালির লাফা সাধু বাউল সাধক না হলেও ২১ ডিসেম্বর তাঁর প্রয়াণদিবসে বাউল সমাবেশ হয়। বিভিন্ন ঘরানার বাউল ও তরিকাপন্থি ফকিরদের উপস্থিতিতে লাফা সাধুর মাজারপ্রাঙ্গণ ভরে ওঠে।

৩. দরগা, মাজারকেন্দ্রিক আচার

বাগু দেওয়ানের মাজারতলা

হিন্দু লোকমানসে দক্ষিণ রায়ের যে স্থান, মুসলিম লোকমানসে গাজিপিরের সেই স্থান। দক্ষিণ রায় ও গাজিপিরকে বাঘের দেবতা হিসেবে মান্য করে বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাঘের অধিপতি হিসেবে বাঘাই পিরকে মানা হয় এবং তার নামে পৌষ মাসে শিরনি দেওয়া হয়। আর মেহেরপুরে বাঘের পির বা অধিপতি হিসেবে মানা হয় বাগু দেওয়ানকে। এই পিরের নামে মেহেরপুর জেলার ভৈরব তীরবর্তী গোভীপুর গ্রামে একটি মাজার ও দরগা আছে। জনশ্রুতি আছে, শাহ ভালাই-এর সমসাময়িক বাগু দেওয়ান সতেরো শতকের প্রথম দশকে বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আসেন।

পরবর্তীকালে মেহেরপুরে এসে ভৈরবের তীরে যাদবপুর-গোভীপুরের মাঝামাঝি স্থানে আস্তানা গড়ে তোলেন। এই আস্তানা থেকে তিনি রাজশাহী ও যশোর অঞ্চলে ধর্ম প্রচারমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তিনি যশোরে 'কুলই দেওয়ান' নামে পরিচিত। 'কুলই দেওয়ান' অনেকটা ঢাকা-বরিশাল জেলার বাঘের অধিপতি 'কুলই ঠাকুর'-এর অনুরূপ ছিলেন।

এ অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস, বাগু দেওয়ান বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি পশুপাখির অধিপতি ছিলেন। তিনি যে বাঘটিতে চড়তেন সেটি জটাধারী ছিল। জঙ্গলি পির, বনবিবি প্রভৃতি লৌকিক পির পিরানীর মতো 'বাগু পির' ছিলেন জঙ্গলেরও অধিকর্তা। তাই গরু-ছাগল, বাঘ-শিয়াল, কীট-পতঙ্গ এমন কি ভূত-প্রেতেরও রক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁর আস্তানার আশেপাশে এক প্রাণী অপর প্রাণীকে হত্যা বা আঘাত করত না। কথিত আছে, তিনি যখন ধ্যানমগ্ন হতেন, তখন তাকে পশুপাখি পাহারা দিত। বাগু দেওয়ানের অনুসারী এবং মাজারের খাদেম আলম মাস্তান (৩৫) বলেন, বাগু দেওয়ান একদিন বাঘের পিঠে চড়ে জমিদারগৃহে গমন করেন। এতে জমিদারসহ মহলের সবাই বিস্মিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে বাগুপিরের অন্যান্য কেরামতি দেখে জমিদার তার খাজনা মওকুফ করে দেন। বাগু দেওয়ানের জন্ম ও মৃত্যুতারিখ সম্পর্কে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ৫ ফালগুন বাগু দেওয়নের মাজারপ্রাঙ্গণে প্রতি বছর ওরস হয়। অনুসারীদের দাবি, তিরোধানের পর তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়। এক সময়, জাঁকজমকের সাথে এখানে ওরস ও মহরম আশুরা হতো। ১৯৮০-র দশকে শরাপন্থিরা দরগা দখল করে নিলে মানত, ওরস, আশুরা বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৯ সালে এলাকার আউল-বাউল, সাঁই-দরবেশ, চিশতিয়াপন্থি সাধকরা একত্রিত হয়ে দরগা ও মাজারের জমি পুনরুদ্ধার করে।

বাগু দেওয়ান বদর পির, মাদার পির, গাজিপিরের মতো ঐতিহাসিক পির হোন, আর মানিক পির, সোনাপির, ঠুনকাপির, ঘোড়াপিরের মতো লৌকিকপির হন না কেন, তিনি মেহেরপুরের লোকমানসে পরম শ্রদ্ধার প্রতীক, দৈবশক্তির প্রতিভূ হিসেবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন। এ অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির সাথে বাগু দেওয়ানের সম্পর্ক এক ও অবিভাজ্য। নতুনভাবে পরিকল্পনা করে বাগুয়ানের মাজার শরিফ তৈরি করা হচ্ছে। মাজারপন্থিদের প্রত্যাশা, সরকারি, বেসরকারি ও এলাকাবাসীর সহায়তায় অচিরেই এখানে একটি মসজিদ, খানকাহ শরিফ, হুজরাখানা নির্মাণ করা হবে।

৪. কাত্যায়নী পূজা

এবারই প্রথমবারের মতো ভৈরব তীরবর্তী মেহেরপুর মহাশ্মশানে আয়োজন করা হয় কাত্যায়নী পূজা। এ উপলক্ষে বিশেষ আলোকসজ্জা, তোরণ, নয়নাভিরাম প্যাণ্ডেল নির্মাণ ও মেলার আয়োজন করা হয়। ১৪ কার্তিক (১ নভেম্বর ২০১১) অনুষ্ঠিত হয় অধিবাস। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন মেহেরপুর-১ আসনের এমপি. জয়নাল আবেদীন। ১৬ কার্তিক ১৪১৮ অষ্টমীর দিন আমরা মেহেরপুর থেকে হাজির হলাম পূজাপ্রাঙ্গণে। আকাশে আধা খানা চাঁদ কার্তিকের কুয়াশায় ম্লান হয়ে গেছে। স্তব্ধ, শান্ত, মৌন ভৈরব বয়ে চলেছে ধীর লয়ে। মধ্যরাত, তবুও অজস্র মানুষের কলরবে স্তব্ধ শ্মশান জেগে উঠেছে। কেবল মানুষ আর মানুষ। সবাই কাত্যায়নী পূজার দর্শনার্থী। বামনপাড়া স্কুলএলাকা জুড়ে বন্দর পর্যন্ত কয়েক হাজার দর্শনার্থী। মহাশ্মশানের গেটের সামনে তৈরি করা হয়েছে কমলা রঙের বিশাল তোরণ। চারিদিকে আলোর উৎসব আর মানুষের ঢল। যারা এসেছেন তারা সবাই হিন্দু নন।

আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য কাজল ভট্টাচার্য (৪০) জানান, "মেহেরপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপুজা এবং হরিসভার নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান।" কাত্যায়নী পূজার উৎসবটি সবচেয়ে বড় উৎসবে পরিণত হবে বলে মনে হয়, শ্যামাপূজার দীপাবলি শেষ না হতেই কাত্যায়নী পূজার আয়োজন করা হয়। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ উৎসব ১৪ কার্তিক শুরু হয়ে চলে পাঁচ দিন। আজ মহা অষ্টমীর দিন পরশু উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে। মূল তোরণ থেকে দাসপাড়া পর্যন্ত

www.pathagar.com

মেলা বসেছে। খুলনা, বগুড়া, কুমারখালী থেকে ফেরিওয়ালা ও দোকানিরা এসেছে পসরা নিয়ে। আসবাবপত্রের মেলা বসেছে। স্থানীয়রা নিয়ে এসেছে জিলাপি, খোরমা, কদমাসহ বিভিন্ন ধরনের গুড়ের মিষ্টি। কাত্যায়নী পূজা হিন্দুদের হলেও ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই উৎসবে এসেছে। মাগুরার কাত্যায়নী পূজার মতো মেহেরপুরের এ উৎসব ঐতিহ্যবাহী না হলেও জমজমাট। পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও দর্শনার্থীরা এসেছে।

যাত্রাশিল্পী কমলারানী (৫২) জানালেন, "শুনলাম মেহেরপুরে কাত্যায়নী পূজা হচ্ছে, আর কাত্যায়নী মানেই উৎসব। তাই মাগুরায় না গিয়ে মেহেরপুরে চলে এলাম। আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে আবার পূজা দেখাও হবে"। এ যেন 'রথ দেখা আর কলা বেচা' এক সাথে।

নয়নাভিরাম তোরণ ও বিশাল প্যান্ডেলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাই পূজামণ্ডপের কাছে। ভিড় ঠেলে প্রতিমাদর্শন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। নানা রঙের আলোর ঝলকানি, সাউন্ড বক্সে উচ্চ ভলিউমে বাজছে, 'নাগর আমার কাঁচা পিরিত পাকতে দিল না,' অথবা, 'পাগলু পাগলু থোড়া সে করলে রোমান্স'। আর সেই মিউজিকের তালে তালে একদল তরুণের বাঁধ ভাঙা নাচ আর হৈ হুল্লোড়। ভিড় ঠেলে দেবী কাত্যায়নী দর্শন করলাম।

মণ্ডলে যে দেবী কাত্যায়নী তা দেবী দুর্গার মতোই অবিকল। দুর্গার সঙ্গে আছে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ এবং মহিষাসুর। তবে পার্থক্য হলো দুর্গাপূজায় মহাদেব থাকেন আর এখানে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুর মশাইকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ পূজার নাম কাত্যায়নী কেন? তিনি জানান, কার্তিক মাসে এ পূজা হয় বলে এর নাম কাত্যায়নী পূজা। অবিবাহিত হিন্দু মেয়েরা শ্রীকৃষ্ণের মতো বর পাওয়ার জন্য এ উপলক্ষে ব্রত পালন করেন। তিনি আরও বললেন, দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁর পিতা বাসুদেব, মাতা দেবী ও ব্রজবাসীগণকে মর্ত্যলোকে প্রেরণ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র, বন্ধু, প্রিয় এবং প্রভুরূপে পাওয়ার জন্য ব্রজবাসীগণ কাত্যায়নী দেবীর ব্রত পালন করেন। হেমন্তের প্রারম্ভে যমুনাতীরে গোপিনিরা মাসব্যাপী ব্রত পালন করতেন বলেও শাস্ত্র থেকে জানা যায়। গোপীনিরা ফুল, ফল ও অন্যান্য উপকরণ দ্বারা দেবীর আরাধনা করতেন। এভাবে এক মাস আরাধনার পর দেবীমূর্তি মহা ধুমধামের সাথে বিসর্জন দিত। এভাবেই কাত্যায়নী পূজার প্রবর্তন হয়।

এ অঞ্চলের হিন্দুরা কাত্যায়নী পূজা দেখতে মাগুরায় যেত। মাগুরার পূজা দেখে সম্ভবত মেহেরপুরে এই আলো ঝলমল উৎসবের আয়োজন করে। কাত্যায়নী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত এ উৎসবটি মেহেরপুর জেলার একটি বড় লোকউৎসবে পরিণত হতে চলেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই আশা করছে আগামী বছর কাত্যায়নী পূজা আরও সাড়ম্বরে উদযাপিত হবে।

www.pathagar.com

কাত্যায়নী পূজার মণ্ডপ

তথ্যনির্দেশ

১. অনন্ত দাস (৫২), সভাপতি, বলরাম হাড়ির আখড়া কমিটি, গ্রাম : বারখাদা, ত্রিমোহনী, জেলা : কুষ্টিয়া, তারিখ : ১৩.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৫.০০টা
২. আলম পাগল (৩৪), পিতা : ইননাল বিশ্বাস, পেশা : কৃষিকাজ, গ্রাম : গোভীপুর, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ১৫.১০.২০১১, সময় : বিকাল ৪.০০টা
৩. আলেয়া খাতুন (৫২), স্বামী : মজিদ ফকির, পেশা : দর্জি, গ্রাম : সাহারবাটি, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ১৫.০৭.২০১১, সময় : দুপুর ১.০০টা
৪. জামাল শাহ (৮১), পিতা : রতন শেখ, পেশা : বাউল, গ্রাম : ক্যাশ্বপাড়া, জেলা : মেহেরপুর, তারিখ : ২৫.০৭.২০১১, সময় : সকাল ১১.০০টা

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

অঞ্চল ভেদে লোকসমাজের আচার-আচরণের মতো খাদ্যের ক্ষেত্রেও রয়েছে অঞ্চলবিশেষে নিজস্বতা, যাকে আমরা লোকখাদ্য বলে থাকি। লোকখাদ্যও লোক পরম্পরায় ঐতিহ্যবাহী। ছানার সন্দেশ বিশেষ গুণে-মানে ও আকারে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করে লোকখাদ্য হিসেবে পরিচিত। যেমন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় মণ্ডা, নড়াইলে ক্ষীরের চমচম ছানার তৈরি হয়েও ভিন্ন ভিন্ন নামে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মিষ্টিজাত লোকখাদ্যের মধ্যে মেহেরপুরে সাবিত্রী ও রসকদম্ব লোকখাদ্যের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে।

পিঠা

আনুষ্ঠানিকভাবে নবান্নের উৎসব মেহেরপুর জেলায় হয় না। তবে নতুন ধান উঠার সঙ্গে কৃষক পরিবারের আনন্দ উচ্ছ্বাসের গভীর সম্পর্ক ঠিকই আছে। এ সময়ে মেয়েরা আসে বাপের বাড়ি। জামাইদেরও দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনা হয়। আদর আপ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে নতুন জামা কাপড় দিয়ে বিদায় করা হয়। ভাদ্র মাসের আউশ ধান ওঠার চেয়ে অঘ্রাণ মাসের আমন ধান কাটা-মাড়াই-ঘরে তোলারই অধিক গুরুত্ব এ জেলায়। এ সময় হরেক রকম পিঠেপুলিরও আয়োজন হয়। নতুন ধান এবং নতুন গুড়ের সঙ্গে এ সময়ে এই এলাকায় যুক্ত হয় আরো একটি অনুপম উপাদান খেজুর রস। পিঠেপুলি, ক্ষীর পায়েশ নতুন স্বাদ ও ঘ্রাণ যুক্ত করে খেজুর রস। পাটিসাপটা, চিতাই, গোকুল, ভাপা পিঠে, রসে ভেজা পিঠে, নক্‌শিকাটা পিঠে, কতো নামের আর কতো রকমের পিঠে যে শীতকাল জুড়ে তৈরি হয়। তবে আনুষ্ঠানিক পৌষপার্বণের চল নেই এখানে। জেলার বিভিন্ন স্থানে বৈশাখী মেলার আয়োজন হয়, এমন কি আনুষ্ঠানিকভাবে ইলিশপান্তার আয়োজনও হয়, কিন্তু 'বৈশাখী খাবার' বলে বিশেষ কোনো খাবারের চল নেই। গাংনীতে সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে বেশ কিছুদিন থেকে পালিত হচ্ছে চৈত্রসংক্রান্তি। এ দিন সুরঙ্গন প্রাঙ্গনে 'আনখামজা' নামের এক প্রকার গণফলারের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মতো মেহেরপুর জেলার অধিবাসীদেরও প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, ডাল, শাকসবজি ইত্যাদি। ভাতের সম্পূরক খাদ্য হিসেবে অনেকে গমের রুটি খেতেও অভ্যস্থ হয়েছে। ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবের দিন সব পরিবারেই মুরগি, ছাগল, গরুর মাংস রান্না করা হয়। উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও ধনী পরিবারগুলোতে নিয়মিত মাছ, মাংসের তরকারি হয়। এছাড়া বাড়িতে জামাই বা অতিথি এলে গৃহপালিত মুরগির মাংস সহযোযোগে খাদ্য পরিবেশন এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য।

www.pathagar.com

শীতকালীন নানা রকম পিঠে, পুলি এবং খেজুররসের ক্ষীর-পায়েস এ জেলার মানুষের প্রিয় খাবার। পিঠে, পুলির গায়ে নকশা কেটে এই এলাকার গৃহিনীরা শিল্পীমনের পরিচয় দিয়ে আসছে বহুদিন থেকে। মহররম উপলক্ষে চাল ডালের খিচুড়ি এবং শবেবরাত উপলক্ষে নানা রকম হালুয়া তৈরি করে পাড়া প্রতিবেশির মধ্যে বিতরণ করার ঐতিহ্যও অনেকদিনের। 'বৈশাখী খাবার' বলে বিশেষ কোনো খাবারের চল নেই বটে, তবে পহেলা বৈশাখে এ জেলার গ্রামের মানুষ সকালে পান্তাভাতও যেমন খায় তেমনি সন্ধ্যাবেলায় আতপচাল এবং আখের গুড়ের তৈরি ক্ষীর কলাপাতায় করে সবাইকে খেতে দেয়।

মেহেরপুর জেলায় বিয়ে বা বৌভাতের অনুষ্ঠানে বরযাত্রী ছাড়াও আত্মীয় স্বজনের জন্য উন্নত খাবারের আয়োজন করা হয়। প্রথমে যে নাস্তা দেওয়া হয় সেখানে দুখ, দৈ, চিড়া, খই, মুড়ি, মুড়কি, মিঠাই পরিবেশনের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। বর্তমানে নাস্তায় স্থান পেয়েছে লুচি, সেমাই, সুজি, পায়েশ, মিষ্টি প্রভৃতি। প্রধান খাদ্যের তালিকায় থকে সাদা ভাত বা পোলাও, মুরগির রোস্ট, চপ বা টিকিয়া, ছাগল বা গরুর মাংস, ছোলার ডাল, মাছের ফ্রাই এবং সব শেষে দই-মিষ্টি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে মিষ্টি জর্দার পানের ঐতিহ্য তো আছেই।

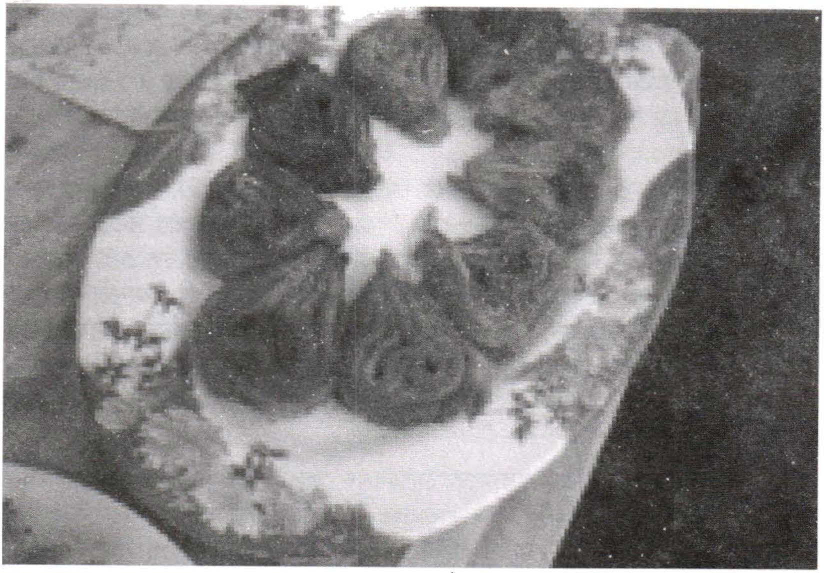

মেহেরপুরের পিঠা

www.pathagar.com

মিষ্টান্ন শিল্প

মিষ্টিজাত খাবার বাঙালি চিরদিন পছন্দ করে। প্রাচীনকাল থেকেই এ জনপদের মানুষ পিঠা ও পায়েস খেত। অবিভক্ত নদীয়ার মিষ্টান্নের খ্যাতি ছিল সারা বাংলা জুড়ে। একসময় কৃষ্ণনগর ও তৎসন্নিহিত মেহেরপুর, রানাঘাট, নবদ্বীপ, দেবগ্রাম, বেতাই এলাকায় গরু পালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল। মেহেরপুরের রাজা গোয়ালা চৌধুরী ছিলেন গরুর রাখাল এবং তাঁর মা রাজু গোয়ালিনী মূলত : ঘোষ ছিলেন। তাই এ অঞ্চলে এক সময় প্রচুর পরিমাণে গো-দুগ্ধ উৎপাদন হতো। গো-দুগ্ধের সহজলভ্যতার কারণে মেহেরপুর শহরসহ মহাজনপুর, পিরোজপুর এবং পার্শ্ববর্তী জগন্নাথপুরে মিষ্টান্ন শিল্প গড়ে ওঠে।

সাবিত্রী ও রসকদম্ব

সাবিত্রী ও রসকদম্ব মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি।

বাসুদেবের 'সাবিত্রী' কোনো পৌরাণিক উপাখ্যানের চরিত্র নয়। এটা এক ধরনের মিষ্টি যার নাম শুনলে জিহ্বায় জল আসে। বাসুদেবের সাবিত্রী খায়নি এমন লোক মেহেরপুর জেলায় নেই বললেই চলে। বিভিন্ন রকম মিষ্টি এ জেলায় পাওয়া গেলেও সাবিত্রীর লোকপ্রিয়তা অতুলনীয়। সাবিত্রীর পাশাপাশি রসকদম্বেরও সুনাম রয়েছে। কেবল মেহেরপুরে নয়, দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও সাবিত্রী ও রসকদম্ব যায়। রসনা তৃপ্তির অনন্য উপকরণ হয়ে সাবিত্রী ও রসকদম্ব টিকে আছে।

মেহেরপুর শহরের প্রধান সরণীর পাশে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ থেকে অনতি দূরে অবস্থিত 'বাসুদেব এণ্ড গ্র্যান্ড সন্স' নামের মিষ্টির দোকানটির পরিচিত রয়েছে জেলা জুড়ে। ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন দোকানটির বর্তমান সত্ত্বাধিকারী বিকাশ কুমার সাহা। তিনি জানান, তাঁর সাত পুরুষ মিষ্টি ব্যবসার সাথে যুক্ত। পূর্বে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানানো হলেও শত বছর আগে তাদের এক পূর্ব পুরুষ বাসুদেব সাহা প্রথম রসকদম্ব ও সাবিত্রী বানানো শুরু করেন। তখন থেকে বাসুদেবের সাবিত্রী ও রসকদম্ব নামে মিষ্টিদ্বয় পরিচিতি লাভ করে।

মিষ্টির সুনাম ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে দোকানের নামেই রাখা হয়েছে মিষ্টির নাম। প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ কেজি মিষ্টি তৈরি করে বিকাশ সাহা। প্রতি কেজির বর্তমান দাম ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা। কোনো কারিগর বা কর্মচারী নেই তাদের দোকানে। মিষ্টির মান ও স্বাদ ধরে রাখার জন্য নিজেরাই মিষ্টি তৈরি করেন। অগ্রিম অর্ডার ছাড়া ৫/৭ কেজি মিষ্টি কেনা যায় না। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, অতিথি আপ্যায়নে বাসুদেবের মিষ্টির কদরই আলাদা। জেলার বাইরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে গেলে বাসুদেবের সাবিত্রী কিংবা রসকদম্বের বিকল্প নেই। প্রবাসে অবস্থানকারীরা বাড়ি এসে ফিরে যাওয়ার সময় বন্ধু ও সহকর্মীদের জন্য বাসুদেবের মিষ্টি সঙ্গে নিয়ে যান। বিকাশ সাহা জানান, ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী মেহেরপুরের প্রবাসীরা অর্ডার দিয়ে তাদের তৈরি সাবিত্রী রসকদম্ব নিয়ে যান।

www.pathagar.com

মিষ্টির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় কেবল দুধ আর চিনি। সঙ্গে কিছু গরম মসলা। পোড়ামাটি রঙ এর সাবিত্রীর আকার চ্যাপ্টা মতো। রসকদম্বের ওপর সাদা সাদা এক ধরনের দানা বসানো হয় যা পোস্তদানার ওপর চিনির প্রলেপ দিয়ে তৈরি।

নাটোরের কাঁচাগোল্লা, কুমিলার রসমালাই, বগুড়ার দৈ, পোড়াবাড়ির চমচম, শেরপুরের ছানার পায়েশ এর মতো মেহেরপুরে তৈরি বাসুদেবের সাবিত্রী ও রসকদম্বের ঐতিহ্য রয়েছে। ভৌগোলিক পরিবেশ, দুগ্ধজাত দ্রব্যের সহজপ্রাপ্যতা এবং চাহিদার কারণে এ অঞ্চলে মিষ্টান্নশিল্প গড়ে ওঠে। জগন্নাথপুর ও মহাজনপুরের ময়রাদের এবং মেহেরপুরের গিয়াসের রসগোল্লার খ্যাতি আছে। দেশি গরুর ঘন দুধের অভাবে মেহেরপুরের গ্রাম-গঞ্জের মিষ্টির ঐতিহ্য হারাতে বসেছে, তবুও বাসুদেবের সাবিত্রী, রসকদম্ব এবং গিয়াসের রসগোল্লা-সন্দেশের খ্যাতি রয়ে গেছে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে এখানে ঐতিহ্যগত ভাবেই মিষ্টান্ন শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল।[১]

মেহেরপুরের রসকদম্ব

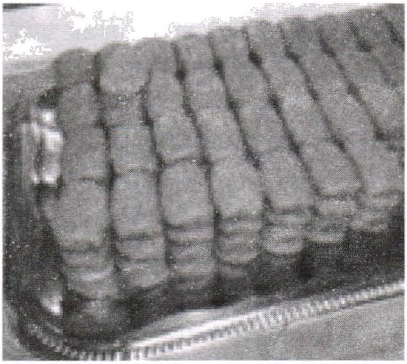

বাসুদেবের সাবিত্রী

তথ্যনির্দেশ

১. বিকাশ কুমার সাহা (৪৫), পেশা : মিষ্টান্ন শিল্পী, প্রো : বাসুদেব এন্ড গ্র্যান্ড সন্স, কাঁশারীপাড়া, প্রধান সড়ক মেহেরপুর। তারিখ : ১৪.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০.০০টা

www.pathagar.com

লোকনাট্য

গ্রামীণ সমাজের জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাট্যধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তা-ই লোকনাট্য। লোকসমাজের প্রয়োজনেই লোকনাট্যের উদ্ভব। আদিতে ছিল এর আনুষ্ঠানিক গুরুত্ব। পরবর্তীকালে লোকমনোরঞ্জন ও শিল্পদান লোকনাট্যের উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো। মাধ্যম হলো অভিনয়। লোকনাট্য সাধারণ লোকদের দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছে পরিবেশিত হয়। এর রচয়িতা, শিল্পী ও দর্শক—সকলেই লোকায়ত স্তরের মানুষ। সাধারণত খোলা আকাশের নিচে মুক্ত ও অবারিত অভিনয়, অতিসাধারণ সাজসজ্জা এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে লোকনাট্যের অভিনয় হয়। দর্শকের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী লোকনাট্যে নতুন নতুন উপাদানের প্রবেশ ঘটে, লোকনাট্যে অভিনয় নিছক অঙ্গভঙ্গি আশ্রয়ী হতে পারে। যেমন—ছৌনাচ বা পুতুল নাচ, আবার অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে সংলাপ ও সংগীতও থাকতে পারে। যেমন—লেটো, আলকাপ, গম্ভীরা ইত্যাদি। লোকনাট্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মমূলক। লোকনাট্য মূলত লোকসমাজের আত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের দর্পণ, সমাজ পরিবর্তনের ছাপ এতে স্পষ্ট। লোকনাট্য চিরকাল লোকশিক্ষার বাহনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১]

লোকযাত্রা

দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) মাসিক 'বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে (১৩৩৯-৪৩) প্রকাশিত তাঁর 'সেকালের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন : 'সেকালে বায়োয়ারি তলায় যেমন যাত্রাগান হইত, তেমনই কবিগানও হইত।' তিনি আরও লিখেছেন, 'আমাদের বয়স দশ বারো বৎসর—সেই সময় মেহেরপুর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের সম্মুখে একদিন যাত্রাগান হইয়াছিল, কাহার দল স্মরণ নাই।' তিনি লিখেছেন, সে যুগের যাত্রাদলের অধিকারী গোবিন্দ অধিকারী, মতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সুনাম করেছেন। মেহেরপুরে যাত্রাগানের ইতিহাস বেশ পুরানো। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মুখার্জী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৌখিন যাত্রাদল গড়ে ওঠে। পূজা-পার্বণে এ দল যাত্রাপালা মঞ্চায়ন করতো। সে সময়ে কানাইলাল সরকার, পাঁচু হালদার, নিখিল বাঁড়ুজ্যে ছিলেন নামকরা অভিনেতা। মেহেরপুরের বাসন্তী মেলা'য় কলকাতা থেকে থিয়েটারের দল আসতো। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশ নন্দিনী' প্রকাশনার পর পরই তা পালাকারে মেহেরপুরের বাসন্তী মেলার স্টেজে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর হিন্দুরা ভারতে চলে গেলেও যাত্রাপালা মঞ্চায়নে ভাটা পড়েনি এ জেলায়। ১৯৫০' এর দশক থেকে মেহেরপুর শহর ছাড়াও সাহারবাটি, পিরোজপুর, আমঝুপি, দারিয়াপুর, আমদহ, গোভীপুর, চিৎলা, হরিরামপুর, রাধাকান্তপুর, কুলবাড়িয়া, উজলপুর, জোড়পুকুরিয়া, গাংনী মহাম্মদপুরে যাত্রাদল গড়ে ওঠে। সাহারবাটির নবকল্লোল অপেরা, পিরোজপুরের জনতা অপেরা, দারিয়াপুরের পল্লিশ্রী অপেরা, মেহেরপুরের প্রগতি পরিমেল, মিলনী অপেরা, আমঝুপি পাবলিক ক্লাব ও লাইব্রেরী প্রভৃতি যাত্রাদলের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশ ছোঁয়া। মফিজুর রহমান (মেহেরপুর) আব্দুল গণি (সাহারবাটি), আব্দুল মজিদ (সাহারবাটি), আবুল কাশেম (গোভীপুর), লাল মহাম্মদ বিশ্বাস (পিরোজপুর), সিরাজ মাস্টার (দারিয়াপুর), ডা. আব্দুল মান্না (টঙ্গী), আব্দুস সাত্তার (দারিয়াপুর), প্রসেনজিৎ বোস (মেহেরপুর), মশিউজ্জামান-বাবু (মেহেরপুর), আব্দুল ওয়াদুদ (মেহেরপুর), আব্দুস সাত্তার-খাতের (সাহারবাটি), সন্তোষকুমার সান্তারা (সাহারবাটি), গোলাম আম্বিয়া (চিৎলা), আব্দুর রশিদ (আমদহ), আব্দুল ওয়াদুদ মোল্লা (আমঝুপি), আজিজুল আজিম (আমঝুপি) প্রমুখ যাত্রাভিনেতার নাম এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। কোহিনূর, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মা মাটি মানুষ, দস্যু মোহন, যে আগুন জ্বলছে, পাগলা গারদ, নাচমহল, রূপবান, দেবী সুলতানা, কলংকিনী বধূ, হাসির হাটে কান্না, নীচুতলার মানুষ, অশ্রু দিয়ে লেখা, রক্তে রোয়া ধান, জোড়া দিঘীর চৌধুরী পরিবার, একটি পয়সা, আনন্দ আশ্রম, দস্যুরানী কল্পনা দেবী, লাইলা-মজনু, লালন ফকির প্রভৃতি পালা এ অঞ্চলের যাত্রাদল গুলির সুনামের সথে মঞ্চস্থ করেছে। মেহেরপুরের যাত্রাদলগুলি যেসব পালা মঞ্চস্থ করেছে সেগুলির অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের নামকরা পালাকারদের রচিত। সাহারবাটি, পিরোজপুর, দারিয়াপুর, আমঝুপির মতো নামকরা দলগুলি কোনো লোকযাত্রাপালা মঞ্চস্থ করেনি। লোকযাত্রা বলতে যা বোঝায় তা মঞ্চায়নে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে মেহেরপুরের মায়ামারী গ্রামের যাত্রাদল। ১৯৭০' এর দশকে তারা 'ভানুমতি' যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। চার দশক ধরে মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে এ পালার মঞ্চায়ন চলেছে। মায়ামারী গ্রাম নিবাসী মিনহাজ উদ্দীন জানান, আমঝুপি, চাঁদবিল, পিরোজপুর, রাইপুর, মোনাখালী, আমদহ, দফরপুর, বারাদী, শালিকা (৫-রাত্রি ব্যাপী), গাংনী (৩ রাত্রি ব্যাপী), নিত্যানন্দপুর, খোকসা, কাথুলী, ভবরপাড়া, শ্যামপুর, শোলমারী (৭-রাত্রি ব্যাপী) আনন্দবাস, দরবেশপুর, আজান, সাহারবাটি (৫-রাত্রি ব্যাপী), রঘুনাথপুর, হরিরামপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে ভানুমতি পালা মঞ্চস্থ হয়েছে। ভানুমতি পালার সবচেয়ে বড় আয়োজনটি হয় ১৯৯২-সালের ৯-ডিসেম্বর মায়ামারী প্রাইমারী স্কুল মাঠে। যারা সেদিনের পালায় অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে যারা অভিনয় করেছিলেন তাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

চরিত্রের নাম	অভিনেতা	গ্রাম
নাজির শাহ	মোজাম্মেল হক	মায়ামারী
দরবেশ	আলতাফ হোসেন	ঐ
উজির	আলম হোসেন	ঐ

www.pathagar.com

সেনাপতি	ইউনুছ আলী	ঐ
কামাল	আজিজুল মালিথা	ঐ
রক্ষী	আখতার আলী	ঐ
ডাকাত	আক্তার আলী (১)	ঐ
মাঝি	মিলন হোসেন	ঐ
বনরাজ	চাঁদ আলী	ঐ
বিবেক	আলতাফ হোসেন	ঐ
দেবরাজ পাটনী	ময়েজ উদ্দীন (প্রয়াত)	ঐ
মাস্টার	কালাম হোসেন	ঐ
ফটিক	জবেদ আলী	ঐ
ভানুমতি	ইজ্জত আলী	ঐ
মালেকা	মোয়াজ্জেম আলী	ঐ
বেলুকা	আরজত আলী	ঐ

'ভানুমতি' পালায় কুশীলবরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর এবং অর্থনৈতিকভবে প্রান্তসীমা ছুঁয়ে যাওয়া মানুষ। এরা কেউ দিনমজুর, ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষি, প্রান্তিক চাষি কেউবা জাল বোনে, মাছ ধরে আবার কেউবা ছুতোর মিস্ত্রি, গাড়োয়ান এবং রিকসাচালক। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নারী চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন তারাও পুরুষ। পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র 'কামাল' ও 'ভানুমতি'। এ দুটি চরিত্রে অভিনয় করেন আজিজুল মালিথা ও ইজ্জত আলী। আটটি চৌকি দিয়ে মঞ্চ তৈরি করে উপরে একটি রঙিন শামিয়ানা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়াম, আড়বাঁশি, ঢোল, জুড়ি, ফ্লুইট, কর্নেট এবং কাঁসর ব্যবহার করা হয়। মঞ্চ থেকে ১০ হাত দূরে সাজঘর বানানো হয় অভিনেতাদের বসার জন্য। নানা প্রতিকূলতার কারণে পালাটি আয়োজকরা মঞ্চস্থ করতে পারেনি। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত যাত্রা পালার সাথে যারা যুক্ত ছিলেন তারা আমাকে পালাটি বর্ণনা করে শোনালেন। পালার প্রথমে পরম করুণাময় আল্লার কাছে প্রার্থনা করা হয়, আসর বন্দনার মাধ্যমে। আসর বন্দনা পালার কোনো অংশ নয়, তথাপি বন্দনার গুরুত্ব রয়েছে, বললেন মিনহাজ উদ্দীন।[২] বন্দনা নিম্নরূপ :

প্রথমে বন্দনা করি আল্লাজির দরবারে
ওগো আল্লাহ্ করবেন দয়া গো, আমাদের আসরে।
পশ্চিমে বন্দনা করি, মক্কা মসজিদ ঘরে, সেই ঘরেতে
পড়ে নামাজ গো, যত মুসলমানে।

দক্ষিণে বন্দনা করি, ক্ষিরোদর সাগরে, সেই সাগরে চালায় ডিঙ্গা সাধু সওদাগরে।

পূর্বেতে বন্দনা করি, ভানুমার চরণে,
এক জায়গাতে উদয় ভানুগো চারদিকে হয় আলো।
উত্তরে বন্দনা করি, হিমালয় পর্বত
সেখান থেকে উঠে বারি, সাগরে যায় মিশে।
তারপরে বন্দনা করি পিতা মাতার চরণে,

www.pathagar.com

মাতা-পিতা আমার করবেন দয়া গো
আমাদের আসরে...
তারপরে বন্দনা করি উস্তাদজির চরণে
উস্তাদ আমার দিস্তার মিয়াগো বাড়ি ময়ামারী
তারপরে বন্দনা করি-বই মাস্টারের চরণে
বই-মাস্টার আমার দৌলত হোসেন, বাড়ি ময়ামারী
তারপরে বন্দনা করি দশ ভায়ের চরণে
দশ ভাই আমার করবে দোয়া গো আমাদের আসরে,
এই পর্যন্ত বন্দনা আমার শেষও হয়ে গেল
মন দিয়ে শুনো এবার, ভানুমতির গান ও... ।

বন্দনা শেষ হওয়া মাত্রই 'কনসার্ট' দেওয়া হয় । কনসার্টের সুর বেদনা মাখানো, করুণ । এরপর পালা শুরু করা হয় । পালার কাহিনি নিম্নরূপ :

দরবেশের প্রবেশ : দরবেশ প্রবেশ করবে এবং ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে থাকবে ।

রাজ্যের বাদশা মৃগ শিকার করতে গভীর বনে চলে যাবে । হঠাৎ সামনে দেখতে পাবে কোনো একজন বসে আছে । বাদশা বার বার জানতে চাইবে ঐখানে কে বসে আছে । কিন্তু কোনো উত্তর না পেয়ে মানুষটিকে পদাঘাত করে । কিছু বুঝে উঠার আগে দেখতে পায় একজন দরবেশ । বাদশাকে প্রশ্ন করবে—কেরে নরাধম? এই গভীর জঙ্গলের মাঝে আমার ১২ বছরের ধ্যান ভঙ্গ করলি । আমি তোকে দিলাম কঠোর অভিশাপ । তুই হবি একদিন পথের ভিখারি ।

এই সময় দূর থেকে ভেসে আসবে বিবেকের গান । 'চারদিকে তোর ঘোর অন্ধকার । চোখ থাকিতে হলি কানা । আপন পায়ে মারলি কুড়াল হলি পথের ভিখারী ।'

বাদশা বলে কোথাকার ভণ্ড তুই আমায় দিস অভিশাপ । দাও দাও আমায় অভিশাপ । বাদশা মৃগ শিকার না করে রাজদরবারে ফিরে আসে । রানী দেখতে পায় রাজা ভীষণ চিন্তিত । মনে কোনো আনন্দ নেই । রানী জিজ্ঞাসা করে, 'জাহাপানা আপনার কি হয়েছে? মৃগ শিকার করতে গিয়ে কি কোনো অঘটন ঘটেছে?' রাজা বলে, না কোনো অঘটন ঘটেনি । সে বনের ভিতর একজন ধ্যানমগ্ন আল্লার ওলিকে না বুঝে পদাঘাত করেছে ।

উজিরকে বাদশা কয়েকদিনের জন্য রাজ্যের দায়িত্ব দিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হয় । বনের মধ্যে যেতে যেতে হঠাৎ 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার শুনতে পায় । বাদশা দ্রুত সেইদিকে গিয়ে দেখে দুইজন ডাকাত একটি বালক ছেলেকে নিয়ে টানা হেচড়া করছে । বাদশা ডাকাতের হাত থেকে বালকটিকে উদ্ধার করে বাড়ি ফিরে আসে । ছেলেটি পালিত সন্তান হিসেবে রাজদরবারে স্থান পায় । পরে বাদশা তাকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন ।

কাহিনির এক পর্যায়ে পাটনিকন্যা ভানুপতি একদিন একটি সুন্দর ফুলের বাগানে ফুল ছিঁড়ছে আর মনের আনন্দে গান গাইছে :

বসন্তের হাওয়ায় প্রাণ পাগল কইরাছে আমার ।
বসন্তের হাওয়া পেয়ে নানান গাছে ফুল ফুটেছে ।

www.pathagar.com

আমারি মনের বেদনা কার কাছে জানাই । ঐ
জোড়ায় জোড়ায় পাখি ওড়ে, গান গায় তারা মধুর সুরে ।
আমারি মনের বেদনা কার কাছে জানাই বসন্তের হাওয়ায় ।

ওই রাস্তা দিয়ে বাদশার ছেলে কামাল বাগানের কাছে এসে দেখে বাগানের মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ে গান করতে করতে ফুল ছিঁড়ছে । এক পর্যায়ে শাহজাদা কামাল প্রশ্ন করে, কে তুমি সুন্দরী কন্যা? মেয়েটি কথা বলে না ।

কামালের গান :
পূর্বেতে উদয় ভানুরে,
আরে ও ভানু পশ্চিমে যায় ডুবে ।
আজকে কেন উদয় ভানু দক্ষিণ ফুল বাগানে
ভানুরে ।

ভানুর গান : কি নাম তোমার মাতা পিতা হে
হারি ও নাগর কি নামও তোমায়
সত্য করে বলো নাগর কোথায় তোমার
ঘর নাগর হে ।

কামালের গান :
পিতার নামটি নাজির বাদশা হে ।
আরেও কন্যা রোমেতে ঘর বাড়ি
নিজের নামটি কামাল বাদশা
তোমার কাছে বলি কন্যা হে ।
এক নাম তোমার মাতা পিতা হে
আরেও কন্য কি নামও তোমার
কোথা হতে এলে কন্যা, কোথায় তোমার ঘর ।

ভানুর গান :
পাটনির কন্যা আমি হে
আরেও নাগর রোমেতে ঘর বাড়ি
নিজের নামটি ভানুমতি তোমার কাছে বলি নাগর হে ।
ভানুমতি বলে শয়ন বাদশার কুমার এখানে?
কামাল বলে, আমি তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়ে ভালোবেসে ফেলেছি ।

ভানুমতির গান :
পাটনিরও কন্যা আমি হে
হারিও নাগর দুঃখে জীবন গড়া
আমার সঙ্গে প্রেম করিলে
সইবে না কপালে নাগর হে

কামালের গান :
কি বলিলে প্রাণের ভানু রে
আরেও ভানু কি বলিলে তুমি

www.pathagar.com

তোমার জন্য আমার জীবন
করবো যে কুরবানি ভানুরে ।

স্কুলে পড়তে গিয়ে আবার কামালের সঙ্গে দেখা হয় ভানুমতির । ভানুমতিকে প্রেমের প্রস্তাব দেয় । ভানুমতি এক সময় স্কুল থেকে বেরিয়ে চলে যায় ।

কামালের গান :

কোথায় রইলে প্রাণের ভানুরে,
আরেও ভানু এসে কর দেখা ।
অবুঝ মনে বুঝ মানে না বলো দুটি
কথা ভানু রে ।

ভানুমতির গান :

মিছে কেন ডাকো কুমার হে
আরেও কুমার দু :খিনীর নাম ধরে
আমার সঙ্গে প্রেম করিলে সইবে না কপালে ।

কামালের গান :

চাইনা মাতা, চাইনা পিতা হে
আরে ও কন্যা চাইনা সোনার পুরি
চাইযে আমি ভানুমতি ।
হইবো দেশান্তরী কন্যা হে ।

ভানুমতি দাদার কাছে তার মনের জ্বালায় কথা বলে ।

ভানুমতির গান :

কি করিতে গিয়েছিলাম, ও দাদা দক্ষিণ ফুল বাগানে
কি রূপও হেরিলাম, ও দাদু আমারই নয়নে ।
প্রাণের দাদু, দাদুগো
ফুটিয়াছে সোনার কমল গো
ও দাদু জল ভরা পুকুরে ।
না বুঝিয়া বোকা ভোমর গো
ও দাদু পিছে কেন ঘোরে ফেরে ।
প্রাণের দাদু, দাদু গো ।

দাদু ভানুমতিকে বোঝায়, আমরা গরিব মানুষ, আর কামাল বাদশার ছেলে । তার সঙ্গে তোর প্রেম হয়না, তুই বাদশার ছেলেকে ভুলে যা । বাদশা শুনলে আমাদের শেষ করে ফেলবে । ভানুমতি দাদুকে বোঝায় কামালকে আমি ভালবেসে ফেলেছি । তাকে না পেলে আমি বাঁচব না দাদু ।

ভানুমতি ও কামালের প্রেমের কথা উজির প্রথমে বাদশাকে অবহিত করে । বাদশা উজিরের কথা বিশ্বাস করে না । বাদশা কামালকে ডেকে ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করে । কামাল বলে—

কামালের গান :

খোদাকে করে সাক্ষী গো
ও আব্বা যারে দিলাম কথা

www.pathagar.com

আরো সাক্ষী চন্দ্র সুরুজ,
সাক্ষী গাছের পাতা আব্বা গো ।

বাদশা রেগে কামালকে চাবুক মারে । আর বলে সামান্য ঐ পাটনির কন্যাকে ভুলে যাও । কামাল বলে আব্বাজান ভানুমতিকে আমি আমার প্রাণের চেয়ে অনেক ভালবাসি । বাদশা রক্ষীকে ডেকে বন্দী করার জন্য আদেশ দেয় ।

কামালের গান :

কোথায় রইলে প্রাণের ভানুরে
আরে ও ভানু এসে কর দেখা
আমার মরণের কালে বলো দুটি কথা
ভানুরে ।

ভানুমতির গান :

আপনি হলেন রাজ্যের রাজা গো
ও রাজন আমরা আপনার প্রজা ।
অবিচার করিয়া রাজা গো
ওইনা কেন দিচ্ছেন সাজা গো
রাজ্যের রাজা, রাজা গো ।

উজির বঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা হাতে নেওয়ার জন্য মনে মনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে । সে বাদশার ছেলে কামালের প্রেমকে পুঁজি করে এগুতে থাকে । একদিন বাদশাকে বলে, 'জাহাপনা আপনার রাজ্যে যদি কোনো লোক অন্যায় কাজ করে, তাহলে কি তার বিচার হবে ।'

বাদশা বলে, 'কেউ যদি কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে তার জীবন যাবে প্রকাশ্য ময়দানে ঘাতকের হাতে ।'

উজির বাদশার বিচারের কথা শুনে ভাবতে থাকে রাজ্য তার হাতে নেওয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার । সে রাজার পালিতপুত্র সেনাপতি কামালকে রাজ্যের প্রলোভন দেখায় । উজির ভাবে রাজ্য থেকে যদি কোনো অবস্থায় কামালকে তাড়ানো যায়, তাহলে আর কেউ পথের কাটা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না । তাই একদিন রাজদরবারে বাদশাকে বলে- জাহাপনা, কামাল সামান্য একজন প্রজা গরীব পাটনির মেয়েকে ভালবেসেছ, সে কি কোনো অন্যায় করেছে? বাদশা বলে, 'সে ভীষণ অন্যায় করেছে । রাজপুত্র হয়ে সামান্য এক প্রজার মেয়েকে ভালোবাসার শাস্তি তাকে পেতেই হবে । বাদশা আরো বলে, আগামীকাল রাজদরবারে কামাল আবার যদি ভালোবাসার কথা বলে তাহলে তার প্রকাশ্য দরবারে বিচার করা হবে । বন্দি অবস্থায় কামালকে রাজদরবারে হাজির করা হয় । বাদশা বলে, শুনো বাবা কামাল, সামান্য পাটনির মেয়ে ভানুমতিকে তুমি ভুলে যাও । আমি খোরাশান রাজ্যের রাজকন্যার সাথে তোমার বিয়ে দেব ।

কামাল বলে, 'আব্বাজান আমি ভানুমতিকে কখনো ভুলতে পারবোনা ।'

বাদশা বলে, 'শোন কামাল তুমি বাদশার ছেলে হয়ে সামান্য একজন গরীব পাটনির মেয়েকে ভালোবেসে, আমার মান-সম্মান ধূলির সাথে মিশিয়ে দিয়েছো । এই

www.pathagar.com

জন্য তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। এই বলে জল্লাদকে ডেকে কামালের শিরচ্ছেদ করার আদেশ দেন।

জল্লাদ কামালকে শিরচ্ছেদ করার জন্য নিয়ে যায়।

কামালের গান :

ওকি জল্লাদ ভাই, ধরি আপনার দুটি পায়।
এমনও বিপদের কালে ও ভাই
ছেড়ে দেন আমায়।

ভানুর গান :

ওকি জল্লাদ ভাই, আমি ধরি আপনার দুটি পায়।
প্রাণের কামাল মারা গেলেও ভাই
দাঁড়াবো কোথায়।

জল্লাদ, কামাল ও ভানুর কান্নায় কষ্ট পেয়ে কামালকে ছেড়ে দেয় এবং বলে এই রাজ্য থেকে পালিয়ে অন্য কোনো রাজ্যে চলে যেতে। এমতাবস্থায় কামাল ও ভানুমতি অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার জন্য হাঁটতে থাকে।

উজির যখন দেখে বাদশা তার নিজের সন্তানকে প্রেমের জন্য জল্লাদের হাতে তুলে দিলো শিরচ্ছেদ করার জন্য, তখন জামালকে বলে সেনাপতি এখন আমাদের এই রাজ্য বাদশার কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে এবং এই রাজ্য অর্ধেক হবে তোমার আর অর্ধেক হবে আমার। এখন বাদশাকে তুমি নিজ হাতে বন্দী করবে। আমি তোমার পাশে থাকবো।

বাদশা ভাবতে থাকে তার কলিজার টুকরা কামালকে জল্লাদের হাতে তুলে দিল কী করে? তার সন্তান আর কখনো আব্বাজান বলে ডাকবে না। যাকে নিয় এত স্বপ্ন, সেই আজ জল্লাদের হাতে প্রাণ দিয়ে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। এর মধ্যে হঠাৎ দেখতে পায় তার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে সেনাপতি হ্যাণ্ডকাপ হাতে তার সামনে।

সেনাপতি বাদশাকে হীন উক্তি করে বলে বুড়ো বাদশা তোমার অনেক বয়স হয়েছে। তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই আমি বন্দী করে কারাগারে বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি। উজির ও সেনাপতি বাদশাকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়।

এই দিকে কামাল ও ভানুমতি জল্লাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হাঁটতে হাঁটতে গভীর এক বনের মধ্যে চলে যায়। তার দুজন খুব ক্ষুধার্ত। বনের মধ্যে হঠাৎ কামালকে একটি বিষধর সাপে কামড়ে দিলো। সে সেখানে ঢলে পড়ে গেল।

ভানুমতি গান :

করলি, কি করলি সাপরে
ও সাপ তীর মারলি বুকে।
যা করলি তুই ভালোই করলি
ও সাপ তুরাই থাকিস সুখে
বনের সাপও, সাপরে।

www.pathagar.com

কামাল ভানুমতিকে পানি খাওয়ানোর জন্য বলে কিন্তু আশে পাশে পানির কোনো সন্ধান পায় না। কামালকে রেখে দূরে পানি আনতে যায়। এবং ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

কামালের গান :

ওকি ভানুরে, ও তুই চলিস কোথায়
পানির আনার ছলনা করে ভানু
আমায় দিলি ফাঁকি।

ভানুমতির গান :

ওকি বন্ধুরে, দেখলাম জগতের ইতিহাস
এই জগতে কেউ কারো নয় বন্ধু
সবাই করে সর্বনাশ।

কামালের গান :

ওকি ভানুরে, ও ভানু চলিলে কোথায়
তোমার চলার পথে ভানু সঙ্গে করে নাও

ভানুমতির গান :

ওকি বন্ধুরে, কি করিলাম আমি
তোমার সাথে প্রেম করে বন্ধু
হইলাম কলংকিনী।

ভানু ও কামাল বনের মধ্যে বনরাজের আশ্রয়ে থাকে। বাদশা নজির শাঁর কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেয়ার পর উজির সেনাপতিকে বলে, ওরে বনের ইঁদুর, যে বাদশা নিজের জীবন বাজি রেখে তোকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করে অন্ন স্নেহ দিয়ে বড় করল এবং রাজ্যের সেনাপতির পদ দিল, আজ তুই সেই পালিত পিতা বঙ্গরাজ্যের বাদশাকে বন্দী করলি।

সেনাপতি বলে, উজির সাহেব এই সব কাজ তো আপনার আদেশেই করেছি। উজির বলে, ওরে নিমকহারাম! যে তোর জন্য এত তিছু করলো আমার আদেশে তাকে তুই যদি বন্দী করতে পারিস তাহলে অন্য কারোর আদেশে যে কোনো সময় আমাকেও বন্দী করতে পারবি। তাই এক্ষুণি আমি তোকে বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেনাপতি বন্দী করে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। বনরাজের আশ্রয়ে কামাল ও ভানুমতি জীবনযাপন শুরু করে একদিন রাতে কামাল দু :স্বপ্ন দেখে,যে তার পিতাকে কারা যেন আটক করে রেখেছে। এবং তার মাতা তাদের রক্ষা করার জন্য কামালকে বার বার আসার জন্য বলছে। কামাল বনরাজকে ছদ্মবেশে তার পিতার রাজ্যের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য বলে। বনরাজ বঙ্গ রাজ্যে গিয়ে জানতে পারে উজির ও সেনাপতি চক্রান্ত করে বাদশাকে বন্দী করে রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। এবং বাদশা ও বেগমকে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। বনরাজ ফিরে এস সমস্ত ঘটনা কামালকে বলে। কামাল বনরাজকে তার লোকজনকে নিয়ে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করে । বনরাজ তার বনের সমস্ত লোক দিয়ে কামালকে সাহায্য করে। বঙ্গরাজ্যের উজির হঠাৎ অন্ধ হয়ে যায়। উজিরের স্ত্রী বেলুকা উজিরকে বলে, আপনার পাপের প্রতিফল আজ আপনি

www.pathagar.com

ভোগ করুন। আমি আর আপনার সঙ্গে থাকতে চাইনা। অন্ধ উজির খুব দুঃখ কষ্টে বসবাস করতে থাকে।

একদিন প্রজারা দেখতে পায় শাহাজাদা কামাল বঙ্গরাজ্যের দিকে বনরাজের লোকজন নিয়ে প্রবেশ করছে। প্রজারা বুঝতে পারে শাহাজাদা কামালকে জল্লাদ হত্যা করেনি। কামাল বেঁচে আছে। প্রজারাও কামালের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজপ্রাসাদে আক্রমণ করে। এবং উজিরকে বন্দী করে কারাগারে পাঠায়। বাদশা কামালকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। বাদশা বলতে থাকে, ওরে আমার কলিজার টুকরা চোখের মণি, আমি তোমার উপর কত অন্যায় অবিচার করেছি। আজ তুই বুড়ো বাবাকে ক্ষমা করে দিস।"কামাল বাবাকে শান্ত হতে বলে এবং ভানুমতিকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য বলে। বাদশা ও বেগম ভানুমতিকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিয়ে কামালের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেয়। এবং ভানুমতিকে রানী হিসেবে কামালের পাশে থেকে রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য আদেশ করেন। এভাবে ভানুমতি পালার পরিসমপ্তি ঘটে। ভানুমতিপালার রচয়িতার নাম জানা যায় না। মায়ামারী গ্রামের অশিক্ষিত পালাকাররাই এর স্রষ্টা। ভানুমতির পালা আর মঞ্চস্থ হয় না। কিন্তু এ পালার গানগুলি এখনও এ অঞ্চলের লোকজনের মুখে মুখে ফেরে।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. মানস মজুমদার, বাংলার লোকনাট্য : সমাজের অভিভাবকত্ব, ফোকলোর, বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৮
২. মিনহাজ উদ্দীন (৪০), পিতা : আলম হোসেন, পেশা : কৃষিকাজ, ময়ামারী, মেহেরপুর, তারিখ : ২৫.০৯.২০১১, সম : সকাল ১১.০০টা

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

জীবন-জীবিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না আর এভাবে বাঁচতেও সে চায় না। জীবনকে আনন্দময় করে তোলার জন্য মানুষ নিজেকে নানাবিধ কাজের সাথে যুক্ত করে। অবসর সময়েও মানুষ নানারকম কাজ করে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে সে তার জীবনকে অর্থময় ও আনন্দময় করে তোলে। অবসর সময় যাপন এবং চিত্তবিনোদনের জন্য মানুষ যে সব উপায়, উপকরণ ও কৌশল আবিষ্কার করেছে, তাঁর মধ্যে গীত, নৃত্য-বাদ্য, ক্রীড়া, গল্পগুজব, প্রমোদ, ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ, বনভোজন উল্লেখযোগ্য। তবে চিত্তবিনোদনের উপায় সমূহের মধ্যে খেলাধূলার গ্রাহ্যতা সবার উপরে। খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষ পায় অনাবিল আনন্দ এবং বৈচিত্র্যহীনতা ও একঘেঁয়েপনা থেকে বাঁচার সুখ। খেলাধুলা মানুষকে সুস্থ-সবল-দীর্ঘ জীবন লাভে সহায়তা করে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ নানা ধরনের খেলাধুলার চর্চা করে আসছে। কোনো খেলায় রয়েছে শরীরিক কসরৎ আবার কোনো খেলায় আছে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা। কোনো কোনো খেলায় রয়েছে ছড়া, ধাঁধা, বুদ্ধি, কৌশল এবং অভিনয়। লোকখেলাধুলার মধ্যে সাধারণত মস্তিষ্ক চালনার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। নাগরিক খেলার 'অভিনয়' বিষয়টি থাকে না, কিন্তু লোকখেলাধুলায় তা অব্যাহত রয়েছে। ছড়া কাটা, ধাঁধা প্রয়োগের মাধ্যমে 'অভিনয়' গুণটি গ্রামীণ ও লৌকিক খেলায় বহাল রয়েছে। কানামাছি খেলায় ছড়া আবৃত্তির সাথে খেলা চলতে থাকে। 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ' ছড়াটি আবৃত্তি করতে করতে খেলা শুরু হয়। লুকোচুরি খেলায় রাজা ও চোর সাজানো হয়। 'বউ তোলা' খেলায় হাঁড়ি-কলসের ভাঙা টুকরাকে 'বউ' হিসেবে বৃত্তের মধ্যে বসিয়ে রাখা হয়। হাডুডু খেলায় শ্বাস বন্ধ করে 'কাবাডি, কাবাডি, কাবাডি' কিংবা 'টেক, টেক, টেক' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে হয়।

খেলার মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহসিকতাও প্রকাশ পায়। লাঠিখেলার মধ্য দিয়ে তিতুমীরের নেতৃত্বে সংগঠিত বৃটিশ শাসক, নীলকর ও জমিদার বিরোধী সংগ্রাম ফুটে ওঠে। লাঠিখেলা, মাল খেলায় সাধারণত মুসলমানরা অংশ নেয়। মেহেরপুর জেলার লাঠিখেলা প্রসঙ্গ তুলতেই গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শফিকুল আলম বলেন, "আমি একসময় লাঠিখেলায় যুক্ত ছিলাম। আমার পূর্ব পুরুষদের অনেকেই নামকরা লাঠিয়াল ছিলেন। আমরা নানা বিখ্যাত লাঠিয়াল ছারু সরদারের কাছে শুনেছি, লাঠিখেলা আসলে মুসলমানদের খেলা। এ খেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল অধিক।"

পৃথিবীর তাবৎ খেলাই মূলত দলবদ্ধ হয়ে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন খেলায় মানুষ কোনো আনন্দ পায় না এবং কৌশল-নৈপুণ্যও প্রদর্শন করতে পারে না। বাংলাদেশের সব লোকখেলাধূলাই যূথবদ্ধ জীবনের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ফুটবল, ক্রিকেট, লন

www.pathagar.com

টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হকি প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খেলার দাপটে লৌকিক খেলাধূলা প্রায় বিলুপ্তির পথে। তথাপি লাঠিখেলা, হাডুডু, কানামাছি, লুকোচুরি, দাঁড়িয়াবান্ধা, কড়িখেলা, শাখের ঘুঁটি, বউতোলা প্রভৃতি খেলা মেহেরপুর অঞ্চলে টিকে আছে। লাঠি, খোলামকুচি, তেঁতুলবিচি প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে এসব খেলা করা যায় বলে সাধারণ মানুষ এসব খেলায় আজও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। মেহেরপুর জেলার প্রায় সব গ্রামেই যেসব লোক খেলাধুলার নিয়মিত অনুশীলন হয় তার একটি বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

১. লাঠিখেলা

লাঠিখেলা আমাদের জাতীয় জীবনের ঐতিহ্য বহনকারী জনপ্রিয় খেলা। শুধু পল্লিজীবনে চিত্তবিনোদনই নয়, শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষার কলাকৌশলের শিক্ষাও ঘটে এই খেলার মাধ্যমে। এই খেলার মধ্য দিয়ে লোকায়ত বাংলার ঐতিহ্য, শৌর্য এবং বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মেহেরপুর জেলায় লাঠিখেলা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ঐতিহ্যগত ধারবাহিকতার সূত্র ধরেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ওহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব সৈয়দ নেসার আলী ওরফে তিতুমীরের (১৭৭২-১৮৩১) হাতে এলে তিনি ইংরেজদের নির্মম শাসন, নীলকরদের নিষ্ঠুর শোষণ, নির্যাতন এবং দেশীয় জমিদারদের অত্যাচার-লুণ্ঠনের হাত থেকে বৃহত্তর নদীয়া চব্বিশ পরগনা-ফরিদপুরের সাধারণ মানুষকে রক্ষার করার জন্যে গড়ে তোলেন 'হামকল বাহিনী।' বাঁশের লাঠিই তাদের আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র ছিল। মেহেরপুর জেলার ভাটপাড়া, বেতবাড়িয়া, গোয়ালগ্রাম, মহাজনপুর প্রভৃতি স্থানে গড়ে ওঠা হামকল বাহিনীর আস্তানা থেকেই ধীরে ধীরে সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ে লাঠিখেলা। অধিকাংশ গ্রামেই স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে লাঠিখেলার দল। কিন্তু যন্ত্র সভ্যতার প্রসার, আধুনিক নগরায়ন ও জীবনযাত্রার গ্রামীণ প্যাটার্নের পরিবর্তনের ফলে গ্রামবাংলার অন্যান্য খেলাধুলার মতো লাঠিখেলাও ক্রমশ বিলুপ্ত হতে থাকে। স্বাধীনতার পর বিলুপ্ত প্রায় এই লাঠিখেলাকে সাংগঠনিক রূপরেখার মধ্যে এনে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভিত্তিতে দাঁড় করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রাণপুরুষ কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান সিরাজুল হক চৌধুরী (ওস্তাদ ভাই) এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মেহেরপুরের কৃতি লাঠিয়াল মো. জানারুদ্দীন (১৯৩২-২০০৪) গড়ে তোলেন বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনী। তাঁদেরই নেতৃত্বে অবহেলিত এবং বিস্মৃত প্রায় একটি গ্রাম্য খেলা লাভ করে জাতীয় পর্যায়ের পরিচিতি। এমন কি সাফ গেমসে পর্যন্ত লাঠিখেলা প্রদর্শনের স্বীকৃতি হিসেবে পদক লাভ করেন এ জেলার কয়েকজন কৃতি খেলোয়াড়।

লাঠিখেলার কলাকৌশল

লাঠিখেলা নিছক লাঠালাঠি নয়, এখানে থাকে কৌশল ও বুদ্ধির কাজ। লাঠিখেলাতে গতি চাই তড়িৎ, দৃষ্টি চাই সূক্ষ্ম এবং বুদ্ধি চাই ধূর্ত। তাহলেই সম্ভব প্রতিপক্ষের হামলা মোকাবিলা এবং নিজে আক্রমণ রচনা করা।

www.pathagar.com

উপকরণ
লাঠিখেলার প্রধান উপকরণ বাঁশের তৈরি লাঠি। বেতের তৈরি ঢাল অনেক সময় খেলায় নতুন মাত্রা যুক্ত করে বটে, তবু এটা অপরিহার্য উপকরণ নয়। লাঠিখেলায় সাধারণত তিন ধরনের লাঠি ব্যবহৃত হয়। ক. বড় লাঠি ছয়ফুট লম্বা, খ. মাঝারি লাঠি-সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা, গ. ছোট লাঠি- আড়াই ফুট থেকে তিন ফুট লম্বা।

কৌশল
বিভিন্ন ধরনের লাঠির জন্য স্বতন্ত্র প্যাঁচ ও রং রয়েছে, যা বিশেষ ধারা অনুসরণ করে চালনা করা হয়। এ ব্যাপারে রয়েছে গুরুমুখী বিদ্যা। তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চলন এবং তা খেলতে হয় নিজস্ব পাঁয়তারা নিয়ে। পাঁয়তারাগুলোর বিভিন্ন নাম আছে-চাঁদ, ভি, আলিফ ইত্যাদি।

বাদ্যযন্ত্র
লাঠিখেলার অপরিহার্য অংশ ঢোলের বাদ্য। সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা। বাদ্যের ছন্দ ও তাল অনুযায়ী লাঠিয়ালের হাত-পা নেচে ওঠে, তার হাতের লাঠিও নেচে ওঠে ঐ একই তালে ও মুদ্রায়। বলা যায়-বাদ্যের তালই লাঠিয়ালকে খেলিয়ে নেয়। ঢোলের বাদ্যের অতি পরিচিত বোল্‌গুলি হচ্ছে : 'এক ধামা চাল একটা পটল' কিংবা 'তাকতা ধাতিং ধাতিং তাতাক ধাতিংতা' ইত্যাদি। লাঠিখেলার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে নৃত্য। বাদ্যের তালে তালে লাঠিয়ালের হাতের লাঠি যেমন নেচে ওঠে, তেমনি তাদের পায়ে ফুটে ওঠে বিভিন্ন প্রকার নৃত্যের মুদ্রা। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নৌকা বাইচ নৃত্য, মানুষ কোতা নৃত্য, আলী আলী নৃত্য, হাজরা পোটা নৃত্য, ঢালী নৃত্য ইত্যাদি।

পোশাক-পরিচ্ছদ
লাঠিয়ালদের জন্যে নির্ধারিত কোনো পোশাকের চল পূর্বে ছিল না। নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে এনে লাঠিখেলাকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াশিল্পে রূপান্তরের পর থেকে প্রত্যেক খেলোয়াড় সাদা হাফপ্যান্ট এবং সাদা গেঞ্জি পরিধান করেন।

শ্রেণি চেতনা
একটি বিষয় বিশেষভাবেই লক্ষণীয় যে, সেই তিতুমীরের সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত লাঠিখেলার সঙ্গে মুসলমানেরা যেভাবে যুক্ত হয়েছে, হিন্দুদের উপস্থিতি সেরকমভাবে নজরেই পড়ে না। লাঠিখেলা যেন মুসলমানেরই খেলা। 'আলী আলী' বলে হুঙ্কার দিয়ে খেলোয়াড়েরা মাঠে নামে এবং মাঝে মধ্যে আল্লাহ-রসুলের নাম উচ্চারণের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ রচনা করে। মুসলমানদের মধ্যেই বংশপরম্পরায় লাঠিখেলার চর্চা করতে দেখা যায়। মেহেরপুর জেলার চর গোয়ালগ্রামের বিখ্যাত লাঠিয়াল ছেরু সর্দার একদা শিকারপুর কনসার্নের অত্যাচারী নীলকর ব্রুমফিল্ডের কুখ্যাত নায়েব রমেশচন্দ্র ঘোষালকে শুধু যে লাঠির আঘাতে হত্যা করেন তাই নয়, তাঁর বংশের উত্তরাধিকারীদের জন্য লাঠিখেলার অনুশীলন বাধ্যতামূলক করে তোলেন এবং সেই ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

www.pathagar.com

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে থাকা লাঠিয়াল বাহিনীর মধ্যে আন্তসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং লাঠিখেলাকে সাংগঠনিক ভিত্তির উপরে দাঁড় করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন আমঝুপি গ্রামের মো. জানারুদ্দীন। পেশাগত জীবনে তিনি ছিলেন তহশীলদার। সরকারী কর্মসূত্রে বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন তহশিল অফিসে ঘুরেছেন এবং সেই অঞ্চলের লাঠিয়ালদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার তিনি জাতীয় পর্যায়ে লাঠিখেলায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন এবং ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ লাঠিয়াল বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন।

ওস্তাদ মো. জানারুদ্দীনের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালের ২৪, ২৫ ও ২৬ অক্টোবর মেহেরপুর জেলার গাঁড়াডোব স্কুলমাঠে অনুষ্ঠিত হয় লোক ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা ও অস্ত্র খেলার জাতীয় ভিত্তিক প্রদর্শনী। এ আয়োজনে স্বাগতিক মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন লাঠিয়াল বাহিনী এবং সারা দেশের বেশ কয়েকটি লাঠিয়াল বাহিনী অংশগ্রহণ করে। তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গ্রামীণ লোকক্রীড়া হিসেবে লাঠিখেলার ঐতিহ্য সংরক্ষণ, মান উন্নয়ন এবং সাংগঠনিক রূপরেখা প্রণয়নের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক এ.কে.এম মহিউদ্দীন।

তিন দিনব্যাপী এ ধরনের লাঠিখেলা প্রদর্শনীর আয়োজন আবারও করা হয় ১৯৮৮ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮ নভেম্বর, মেহেরপুর স্টেডিয়ামে। সারা দেশের বিপুল সংখ্যক লাঠিয়াল এতে অংশ নেয়। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনের এই প্রদর্শনী। এরপরও বেশ কয়েকবার এ ধরনের প্রদর্শনী মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হয় বটে, তবু জেলাব্যাপী সত্যিকারের সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠেনি। ২০০৪ সালে ওস্তাদ জানারুদ্দীনের মৃত্যুর পর এ জেলায় লাঠিখেলার বড় ধরনের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় নি। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ অঞ্চলের লাঠিখেলা এখন অনেকটাই নিস্প্রাণ হয়ে পড়েছে। তবে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের ধারা একেবারে হারিয়ে যায়নি। জেলার চর গোয়ালগ্রাম, বাদিয়াপাড়া, শিশিরপাড়া, বানিয়াপুকুর, সাহারবাটি, দিঘিরপাড়া, আমঝুপি, পিরোজপুর, মোনাখালি প্রভৃতি গ্রামে এখনো লাঠিখেলার চর্চা অব্যাহত আছে।

২. হাডুডু

সারা বাংলাদেশের মতো মেহেরপুর জেলায় হাডুডু খেলার প্রচলন রয়েছে। জেলার প্রায় সব গ্রামের তরুণ ও যুবকরা একসময় এ খেলার সাথে যুক্ত ছিল। আমঝুপির জমিরুদ্দীন, গোয়ালগ্রামের সাদ আহমেদ, ফজলু বাঙ্গাল, কাথুলীর আমীর, জমির, পুরন্তপুরের নওসাদ, মনোহরপুরের বেলু মেম্বর, মেহেরপুর ফৌজদারীপাড়ার কামাল, দিঘীরপাড়ার আব্দুল গণি, আমঝুপির হান্নান, জামিরুল-এর হাডুডু খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাতি ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট, লন টেনিস, ব্যাডমিন্টনের দাপটে খেলাটির জনপ্রিয়তা আগের মতো নেই। হাডুডু খেলা শক্তির খেলা হওয়ায় এতে মেয়েরা কখনই অংশগ্রহণ করেনি। অঙ্গহানির সম্ভাবনা থাকায় অনেকেই এ খেলায় অংশ নিত না, তবে সবাই খেলা উপভোগ করতো।

www.pathagar.com

হাডুডু খেলা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। মেহেরপুরে এর নাম 'ডু খেলা', কেউ কেউ কপাটি খেলাও বলে থাকেন। এ জেলায় হাডুডু একটি নিয়মে খেলা হয়, মাটির উপর দাগ কেটে সীমানা বেঁধে। ২১×১৪ বর্গ হাতের একটি ঘর কাটা হয় এবং এটিকে একটি সরলরেখা দ্বারা সমান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ঘর দুটি দুপক্ষের সমান সংখ্যার খেলোয়াড়দের দ্বারা সাজানো হয়।

এক পক্ষের একজন খেলোয়াড় মাঝরেখা থেকে দম বন্ধ করে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে আসতে চেষ্টা করে। সে যে দম বন্ধ করে আছে তা জানান দেবার জন্য শ্রুতিগ্রাহ্য হয়ে স্বরে 'টেক, টেক' বা 'কাবাডি কাবাডি' ইত্যাদি ধ্বনি করতে হয়। দম বন্ধ এই ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় প্রতিপক্ষের একজন বা দুজনকে ছুঁয়ে মাঝ রেখা পার হলে যাকে ছোঁয়া হয়েছে, সে বা তারা মারা যাবে অর্থাৎ খেলার অধিকার হারাবে। আর যদি নিজে আটকা পড়ে যায় এবং দম ছেড়ে দেয় তবে সে মারা পড়বে, সাথে সাথে খেলার অধিকার হারাবে। এরপর অপর পক্ষের একজন খেলোয়াড় খেলতে বা গাইতে আসবে। কোনো এক পক্ষের সব খেলোয়াড় মারা গেলে একটা গেম হয়।

এক সময় গ্রামে গ্রামে এ খেলার প্রতিযোগিতা হতো। বিজয়ী দলকে ছাগল, ভেড়া কিংবা শিল্ড বা কাপ দেওয়া হতো। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নানামুখী অভিঘাতে খেলাটি বিলুপ্তির পথে। কোনো কোনো গ্রামে এখনও খেলাটির প্রচলন রয়েছে।

৩. কুস্তি বা মাল খেলা

লাঠিখেলার মতো পৌরুষদীপ্ত খেলা কুস্তি বা মাল খেলা। মেহেরপুর এলাকায় এ খেলার রয়েছে সুদীর্ঘ কালের ঐতিহ্য। প্রায় সব গ্রামেই এক সময় অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৪০-এর দশক থেকে ৬০ দশক পর্যন্ত মেহেরপুর অঞ্চলে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কুস্তি খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। বৈশাখ মাসের প্রথমে ও চৈত্র মাসের শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে এ খেলা হতো। ঢোল-কাঁসি, ফ্লু-করোনেট বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে কুস্তিগীরদের লড়াইয়ের ময়দানে আনা হতো। সমবেত জনতার হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে রেফারির উপস্থিতিতে মাল খেলা শুরু হতো তখন। এখনও কোনো কোনো গ্রামে বৈশাখ মাসে এ খেলা হয়। এ খেলায় যারা নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন আছের মাল অন্যতম। তিনি মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন খানপুরে ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার কুস্তিগীর ইউসুফ খানের কাছে খেলা শিখেছেন। বল্লভপুরের বিমল মল্লিক, আশরাফপুরের ফকির মাল, করিম মাল, সাহেবপুরের ক্ষুদি বিশ্বাস, ফতেহপুরের ঝড়ু শেখ, কাঁঠাল পোতার চমৎকার মাল প্রমুখের মাল খেলার জন্য খ্যাতি ছিল। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে পুরস্কৃত হয়েছেন। এছাড়াও দিঘির পাড়ার মুনসাদ মাল, ঝাউবাড়িয়ার সোবহান, মায়ামারীর হিরু মাল, বিল ধলার সোবহান, আব্দুল কাদের, দারিয়াপুরের কাদের জমিদার, বিশ্বনাথপুরের দাউদ হোসেন, আজাহার মাল এবং রাজাপুরের ঝড়ুমাল ছিলেন মাল খেলার খ্যাতিমান খেলোয়াড়। গাংনী উপজেলার গোয়ালগ্রাম, জোড়পুকুরিয়া, মিনাপাড়া এলাকায় এ খেলার ব্যাপক

www.pathagar.com

প্রচলন ছিল। জনশ্রুতি আছে, মাল খেলার সঙ্গে যুক্ত খেলোয়াড়রা জমিদারদের দেহরক্ষী, দ্বাররক্ষী হিসেবে কাজ করতো। কখনও কখনও তাদেরকে দাঙ্গা, মারামারি, জমি দখলের কাজেও ব্যবহার করা হতো।

৪. কানামাছি

নির্মল আনন্দ-উপভোগের জন্য মেহেরপুরের গ্রামীণ এলাকায় কানামাছির প্রচলন রয়েছে। সাধারণত বাড়ির উঠানে অথবা ফসল মাড়াই-এর খোলায় কানামাছি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১০/১২ বছরের ছেলে-মেয়েরা এ খেলায় অংশ নেয়, তবে মেয়েদের উপস্থিতিই বেশি থাকে। খেলার প্রারম্ভে একজনকে 'কানা' নির্বাচন করা হয় চোখ বেঁধে দিয়ে। দুচোখ বাঁধা অবস্থায় সে কানার ভূমিকা পালন করে। আর অন্য খেলোয়াড়রা চারদিকে থেকে 'কানা' কে হালকা ধাক্কা দেয় বা স্পর্শ করে। চারদিকে থেকে খেলোয়াড়রা কানামাছির মতো কানাকে ধাক্কা দেয় বা উত্যক্ত করে বলে খেলার নাম 'কানামাছি'। এ খেলায় কোনো উপকরণ ব্যবহার করা হয় না। তাই এর রয়েছে দারুণ জনপ্রিয়তা। এ খেলাকে কেন্দ্র করে নানারকম ছড়ার সৃষ্টি হয়েছে। 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ'—ছড়াটি মেহেরপুর এলাকায় ছেলেমেয়েরা খেলার সময় ব্যবহার করে। আকাশ সংস্কৃতির বিকাশ, নগরায়নের ফলে অনেক লোকখেলা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও কানামাছি বিলুপ্ত হয়নি। বরং এর জনপ্রিয়তা গ্রাম এলাকায় এখনও রয়েছে।

কানামাছি খেলায় রত বালক-বালিকারা

www.pathagar.com

৫. ষোলো ঘুঁটি

এ খেলায় দুজন প্রতিযোগী থাকে এবং প্রত্যেকের ষোলোটি ঘুঁটি থাকে। এ খেলার সাথে দাবা খেলার কিছুটা মিল রয়েছে। প্রথমে একজন এক ঘর সামনে ঘুঁটি এগিয়ে দিয়ে খেলা শুরু হয়। ঘুঁটি হিসেবে খোলান কুচি, ইটের সুরকি, তেঁতুলের বিচি ব্যবহার করা হয়। লাফ দিয়ে ঘুঁটি চালের সুযোগ এলে ঘুঁটি মারা যায়। ঘুঁটি মেরে মেরে প্রতিপক্ষের ঘুঁটি শূন্য করে দিতে পারলে অথবা প্রতিপক্ষের ঘুঁটির চালের পথ বন্ধ করে দিতে পারলে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। এ খেলা দাবা খেলার মতো বুদ্ধি, কৌশল, ধৈর্য ও সতর্কতার খেলা। বয়স্ক পুরুষরা অবসর সময় যাপনের এ খেলায় অংশ নেয়। খেলাটি 'মোগল-পাঠান' খেলা নামেও পরিচিত। যুদ্ধবিদ্যার ছায়া অবলম্বনে উদ্ভাবিত খেলাটির জনপ্রিয়তা মেহেরপুর অঞ্চলের গ্রামে-গঞ্জে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

৬. কড়ি খেলা

সামুদ্রিক শামুক বা কড়ি এ খেলার প্রধান উপকরণ। অবসর সময় যাপন ও চিত্ত বিনোদনের জন্য মেয়েরা এ খেলার ব্যবস্থা করে। এ খেলা মেয়েদের হলেও ছেলেরাও অংশ নেয়। উপকরণ হিসেবে চারটি কড়ি ব্যবহার করা হয়। কড়ি মাটিতে ছুঁড়ে দেওয়ার পর চারটি কড়ি উপুড় হয়ে পড়লে খেলার প্রথম সুযোগ পায়। মাটিতে কড়ি ছোঁড়ার পর কড়িগুলি পরস্পর একে অপরের গায়ে লেগে থাকলে খেলোয়াড় দান হারায়। জোড়ায় জোড়ায় মারতে পারলে দুপয়েন্ট পাওয়া যায়, আর না পারলে দান হারাতে হয়। কারো চালে চারটি কড়ি উপুড় হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে তুলে নিয়ে চুমু খেতে পারলে ৮ পয়েন্ট বা ১৬ পয়েন্ট পাওয়া যায়। এভাবে যার কুড়ি পয়েন্ট আগে হয়ে যায় তার একটি গেম পাওনা হয়। জয়ী খেলোয়াড় বিজিত খেলোয়াড়কে কিল মারার সুযোগ পায়। স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কড়ি খেলাটির আবেদন রয়েছে।

৭. দাড়িয়াবান্ধা বা ফুল খেলা

দাড়িয়াবান্ধা মেহেরপুর জেলায় ফুল খেলা বা সূল খেলা নামে পরিচিত। সারাদেশের মতো মেহেরপুরেও গ্রামীণ এ খেলাটির রয়েছে দারুণ জনপ্রিয়তা। বালক-বালিকা থেকে বয়স্ক পুরুষরাও এ খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সাধারণত শুকনো মৌসুমে দাড়িয়াবান্ধা খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ৪/৫ থেকে ৮/৯ জন পর্যন্ত খেলোয়াড় দিয়ে খেলার টিম গঠন করা হয়। ছক বাঁধা ঘর তৈরি করে এ খেলা হয়ে থাকে। মাটির উপর দাগ কেটে সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

১ শূল ঘর	খা ড়া	২ নূন ঘর
৩	কো	৪
৫	ট	৬

এ খেলায় একক কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ থাকে খুব কম। একজনের ভুল বা অসতর্কতার জন্য সমস্ত দলের পরাজয় ঘটে। পারস্পরিক সহযোগিতার সংস্কৃতি ও সমবায়িক মনোভাব এ খেলার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। ফুটবল-ক্রিকেটের আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তার মধ্যেও দাড়িয়াবান্ধা বা ফুল খেলা মেহেরপুরের গ্রামে গ্রামে টিকে আছে।

৮. কিতকিত খেলা

এক্কা দোক্কা মেহেরপুর এলাকায় কিতকিত খেলা নামে পরিচিত। উঠোনে বা মেঝের উপর দাগ কেটে ঘর তৈরি করে এ খেলার আয়োজন করা হয়। খেলার উপকরণ হিসেবে ভাঙা হাঁড়ি-কলসের গোলাকার টুকরা বা 'খোলাম কুচি' ব্যবহার করা হয়। এই গোলাকারটিকে 'ঘুঁটি' বা 'খোলা' বলা হয়। দুজনে বা দলবদ্ধভাবে এ খেলায় অংশ নেওয়া যায়। ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বা নৈপুণ্য দেখানোর সুযোগ এ খেলায় থাকে। খেলার প্রারম্ভে বাইরে থেকে ঘুঁটি নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে ফেলে এক পায়ের উপর ভর করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠেলে ঘুঁটি ঘরের বাইরে আনতে হয়। 'ঘুঁটি' বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠেলার সময় দমবন্ধ করে 'কিতকিত' শব্দ করতে হয়। বিশ্রাম ঘর ছাড়া অন্য ঘরে শ্বাস নিলে বা দুপা একত্রে মাটিতে স্পর্শ করলে উক্ত খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। খেলার ঘুঁটি দাগের উপর পড়লেও খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়।

খেলারত অবস্থায় বিশ্রাম ঘর ছাড়া অন্য ঘরে খেলোয়াড়কে এক পায়ে ভর দিয়ে কিতকিত শব্দ করতে হয়। কিতকিত খেলার মধ্য দিয়ে শিশুরা নির্মল আনন্দ খুঁজে পায়। সেই সাথে দম বন্ধ করে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার ফলে শারীরিক ব্যায়ামও হয়। এ খেলার ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই আগ্রহ দেখায় বেশি। খেলাটির তাৎপর্য সম্পর্কে ওয়াকিল আহমেদ 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন— "নারী নীড়াশ্রয়ী। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীই পুরুষকে ঘর বাঁধার প্রেরণা দিয়েছে। ঘর দখল ও ঘরকন্নায় নারীর ভূমিকা আজও সক্রিয়।" সুতরাং 'কিতকিত' খেলায় নারীর সেই প্রবণতার পরিচয় থাকতে পারে।

৯. লুকোচুরি

ছেলেমেয়েদের মধ্যে লুকোচুরি খেলার রয়েছে বেশ জনপ্রিয়তা। মেহেরপুর অঞ্চলে এ খেলাকে লোকাচোরনী বলা হয়। লটারির মাধ্যমে এ খেলায় একজনকে দলনায়ক বা সর্দার এবং একজনকে চোর সাজানো হয়। দলনায়ক খেলার প্রারম্ভে চোরের চোখ বেঁধে দেয় এবং অপরাপর খেলোয়াড়কে সুবিধাজনক স্থানে আত্মগোপন করে থাকতে নির্দেশ প্রদান করে।

সব খেলোয়াড় আত্মগোপন করলে চোরের চোখ খুলে দেওয়া হয়। চোর আত্মগোপনকারীদের যে কোনো একজনকে খুঁজে বের করে আনলে অথবা তাঁকে ছুঁয়ে এসে দলনায়ককে ছুঁয়ে দিতে পারলে ঐ খেলোয়াড় যাকে ছুঁয়ে দেয় সে চোর সাব্যস্ত হবে। তবে ছোঁয়ার পরও যদি ঐ খেলোয়াড় দলনায়ককে দৌড়ে এসে ছুঁয়ে দেয় তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না।

www.pathagar.com

এভাবে খেলা চলতে থাকে যতক্ষণ না চোর সফল হয় অন্য কাউকে চোর সাব্যস্ত করতে। এ খেলাটি কেউ কেই 'চোর-পুলিশ' খেলাও বলে। নির্মল আনন্দ লাভ ও অবসর সময় যাপনের জন্য এ খেলার আয়োজন করা হয়। নবপরিণীতা বধূর সাথে ছোট দেবর-ননদরাও লুকোচুরি খেলা করে থাকে।

১০. বউ তোলা খেলা

এ খেলায় হাঁড়ি-কলস বা নান্দা ভাঙার টুকরাকে বউ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মাটির উপর দাগ কেটে বৃত্ত করা হয় এবং টুকরাটিকে বৃত্তের মধ্যে রাখা হয়। বৃত্ত থেকে কিছু দূরে দাগ কেটে সীমানা নির্ধারণ করা হয়। সীমানা থেকে একজন খেলোয়াড় শ্বাস বন্ধ করে 'কিতকিত' শব্দ করে 'ভাঙা টুকরা' বা বউকে তুলে নিয়ে যেতে চাইবে। বউ তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত খেলোয়াড়কে 'বউ'-এর পার্শ্বে দাঁড়ানো অন্য কোনো খেলোয়াড় ছুঁয়ে দিলে বউ তোলা হবে না এবং সে মারা পড়বে। পরবর্তীতে অন্য একজন বউ তোলার জন্য নির্ধারিত হবে। আর এভাবেই খেলা চলতে থাকবে।

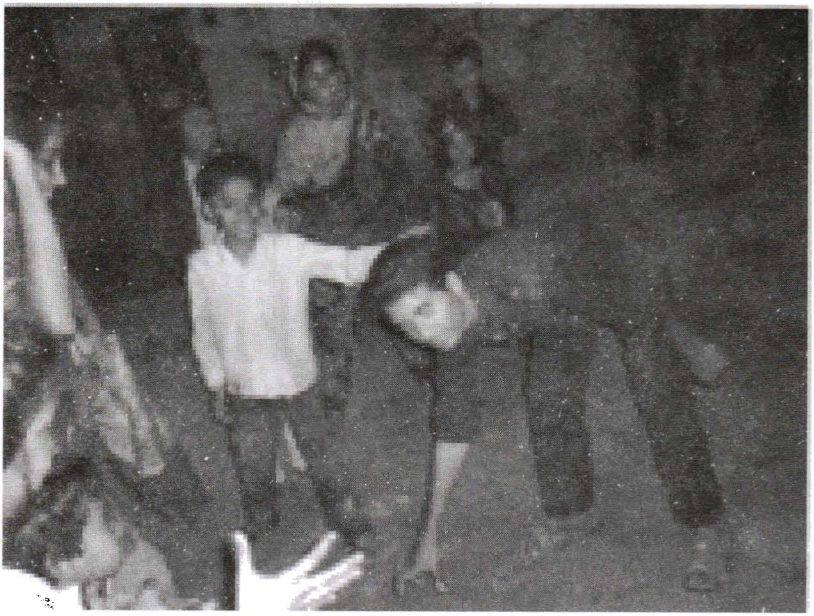

বউ তোলা খেলা

১১. গোল্লাছুট বা ঘুপা খেলা

গোল্লাছুট মেহেরপুর অঞ্চলে ঘুপা খেলা নামে পরিচিত। একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে দ্রুততার সাথে দৌড়ের উপর এ খেলার সাফল্য নির্ভর করে। খোলা মাঠ বা ফসল

www.pathagar.com

মাড়াই-এর প্রশস্ত 'খোলা'কে খেলার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। খেলোয়াড় সংখ্যা ৬/৮ থেকে ৮/১০ জন।

গোল্লাছুটের জন্য একটি গর্ত বা 'গোল্লা' করা হয় এবং গোল্লা থেকে ৪০/৫০ হাত দূরে একটি ইট বা পাথরখণ্ড স্থাপন করা হয়। গোল্লা থেকে দৌড়ে গিয়ে ইট বা পাথরখণ্ড ছোঁয়াই এ খেলার মূল উদ্দেশ্য। এজন্য এ খেলার নাম গোল্লাছুট।

এ খেলায় যারা প্রথম 'পাড়' পায় তারা গর্ত বা ঘুপা ছুঁয়ে দাঁড়ায়। খেড়োরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে লম্বা হয়ে প্রধান খেড়োকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। প্রতিপক্ষ দলের খেড়োরা বিভিন্নভাবে সুবিধাজনক স্থানে লুকিয়ে থাকে। গোল্লাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে যাদের হাত ছুড়ে যাবে তারা দ্রুত দৌড়ে দূরের সীমা ছুঁতে যাবে আর প্রতিপক্ষ তাদের ছুঁয়ে দিয়ে বাঁধা প্রদান করবে। যতক্ষণ ঘুপার সাথে সংযোগ থাকবে ততক্ষণ নিরাপদ। ঘুপা ছেড়ে প্রধান খেড়োকে এক সময় ছুটতে হয়। সে যদি জোড় পায়ে লাফ দিয়ে সীমানার বাইরে যেতে পারে তবে তার দলের জয় হয়। না পারলে অথবা স্পর্শ দোষে মারা পড়লে প্রতিপক্ষ দল 'পাড়' পায়। এ খেলার জন্য কোনো উপকরণ ব্যবহৃত হয় না বলে খেলাটি এখনও এ অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বেশ জনপ্রিয়।[১]

গোল্লাছুট খেলা

তথ্যনির্দেশ

১. মুস্তাফিজুর রহমান বড় বাবু (৬০), পিতা : মেহের আলী বিশ্বাস, পেশা : ক্রীড়া শিক্ষক ও ব্যবসায়ী, মেহেরপুর, তারিখ : ০২.১২.২০১১, সময় : সকাল ১০.০০টা

www.pathagar.com

তন্ত্র-মন্ত্র

বলা যায় বাঙালি জীবনের সঙ্গে ট্যাবু-টোটেম, মন্ত্র-তন্ত্র, যাদু-দারুটোনার সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সে নানা ভাবে যাদু-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, টোটকার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এসব আচার অনুষ্ঠান সব সময় শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রথা অনুসরণ করে হয় না। লোক বিশ্বাস ও সংস্কার, জাদু-মন্ত্র ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করেই পালন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাঙালি যেমন শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে, তেমনি লৌকিক ধর্মের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেছে। কালের পরিক্রমায় যদিও সেই সব আচার-আচরণ, বিশ্বাসের ভিত্তি ও খোলস বদলে গেছে। তবুও অজস্র কিংবদন্তি, ট্যাবু-টোটেম, জাদু-মন্ত্রকে ঘিরে আমাদের লোকায়ত জীবন আবর্তিত হয়। একুশ শতকেও এসব লৌকিক আচার-আচরণ, তন্ত্র-মন্ত্র বিশুদ্ধ রূপে না হলেও পরিবর্তত রূপে টিকে আছে।

মেহেরপুর জেলার গ্রামে গঞ্জে তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝাঁড় ফুকের ক্রিয়ানুষ্ঠান লক্ষ করা যায়। মন্ত্র পড়ে এবং কিছু লৌকিক আচার পালন করে রোগীকে সুস্থ করার চেষ্টা করা হয়। সাপে কাটা রোগীর প্রাণ সংশয়াপন্ন হলে ঝাঁড়-ফুঁক দেওয়া হয়। মেহেরপুর জেলার সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র পাঠ যারা জানে তারা কেউই পেশাদার নয়। এরা জীবিকা নির্বাহের জন্য নয়, লোক কল্যাণে বিষ ঝাড়া বা ওঝার কাজ করে থাকে। রোগীর কাছ থেকে তারা টাকা পয়সা পর্যন্ত নেয় না। এরা মনে করে টাকা পয়সা নিলে মন্ত্র অকার্যকর হয়ে যায়। নিম্নে সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র উদ্ধৃত করা হলো :

শোন শোন কৃষ্ণ তুমি/ শোন দিয়া মন/ তোমার সাক্ষাতে গেলে/ পাবো স্বর্গ দরশন।/ শুনেছি তোমার কথা / আগমে পুরাণে/ বাসুদেবের পুত্র তুমি/ দেবগণ তা জানে। / যশোদা রাণী দৈবকিনী/বসুধ তিনার পিতা হয়/তাহার পুত্র হয়ে ঠাকুর/কারে রাখো ভয়।/মুদ্দ মনসার রাধে /রয় তোমার কাছে/ তোমার ওই না বুঝ পর্বতে / গরুড় বসে আছে।/ আরেকটি কথা রাধে/ তোমায় বলে দিই/ কামরূপেতে জন্মেছিল/হাড়ির ঘরে ঝি/ হাড়ির ঘরে জন্ম তিনি/ বেঁধেছিল মন/ সেই কারণে শিব তারে /দিয়েছিল ধন।/রাধে বলে তোমার কাছে ধরিলাম চরণ/ শাস্ত্রতে দেখলাম ঠাকুর না হবে মরণ/ নাই বিষ, বিষ হরি আজ্ঞে বলো নাই।

মন্ত্রে প্রার্থনা থাকে না—থাকে দোহায় আর জোর দাবী। মুসলমানি মন্ত্রে এমন জোর দাবীর কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

নামরে দুরন্ত বিষ জলদি নেমে যা।
নাম নাম বিষ তোর খুদার কসম খা।
আউলে কসম লাগে এলাহি রব্বের।
দোওমে কসম লাগে নবী হযরত রসুলের।

www.pathagar.com

ফাতিমা হাসান হোসেন আলী খুদা শের
তারপরে কসম নবীর চার ইয়ারের।
নেমে যা দুরন্ত বিষ দোহায় রব্বের।
যদি ফিরে আসিস বিষ দোহায় কাদের।

ইসলামি ভাবধারায় রচিত উপর্যুক্ত মন্ত্রের রচয়িতা মুন্সি আব্দুর রহমান (১৯০৭-১৯৮৬)। মুন্সিজির জন্ম নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার মৃগি গ্রামে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর তিনি মেহেরপুর জেলার আলমপুর গ্রামে চলে আসেন। মুন্সিজির পৌত্র হাসিবুজ্জামান বলেন, "তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। আরবি, ফারসি ও ফেকাহ শাস্ত্রের পণ্ডিত এই মানুষটি ছিলেন একাধারে লোক চিকিৎসক ও ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত। জ্বিনের আছর, দোষের ভাব ও অন্যান্য জটিল-কঠিন রোগীদের চিকিৎসাও করতেন তিনি। ইসলামি ভাব ধারায় ৭২ টি মন্ত্র তিনি রচনা করেছেন।"

যেগুলি এ অঞ্চলের ওঝাদের মুখে মুখে ফেরে। মুন্সিজি রচিত আরও একটি সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র উদ্ধৃত করা হল।

ঝাড়ি ঝাড়ি বিষ কালেমার মুখে,
খোদার হুমকীমে বিষ যা মুখেতে পরে।
মারি চাপড় উড়াই যহর খোদার নিজ নামের গুণে
হাত চাপড়ে বিষ নেমে গেল পাতাল ভুবনে।[১]

মেহেরপুর জেলার ওঝারা প্রায় সকলেই মুসলমান। তবুও কোনো কোন মন্ত্রে হিন্দুয়ানি ও মুসলমানি ভাবের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এ ধরনের একটি মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

এসো গো মা মনসা বোস সিংহাসনে,
এ আর্শিবাদ করো মাগো বিষ যদি নামে,
ভোগ খাওয়ার সাধ যদি থাকে রোগী ভাল করবা
ধুপ দেব ধুপচি দেব আরও দেব বলি
বিষের জালায় সোনার অঙ্গ হলো কালি।
সরোবর নদীর জল শুকাইয়া যায়
গঙ্গা যমুনায় যেমন বইয়ে চিরস্থায়ী হয়।
কাহিনি মন্ত্র শুনে বিষ নেমে গেল।
যে যেখানে আছেন সবাই আল্লাহ আল্লাহ বল।
নেই বিষ বিষ হরির অঙ্গে।[২]

তথ্যনির্দেশ

১. হাসিবুজ্জামান (৩২), পিতা : জুলফিকার আলী, আলমপুর, মেহেরপুর, তারিখ: ৮ জুলাই ২০১১
২. কাউসার আলী (৪২), পেশা : কৃষিকাজ, মোনাখালী, মুজিবনগর, মেহেরপুর, তারিখ : ১৫ নভেম্বর ২০১১।

www.pathagar.com

ধাঁধা

বাংলা লোকসাহিত্যের প্রধান উপাদান হচ্ছে ধাঁধা। গভীর জীবনবোধ সম্পন্ন মানুষেরাই সামাজিক জীবনের নানা দিক পর্যবেক্ষণ করেন নিবিড়ভাবে, তারপর সেই পর্যবেক্ষণলব্ধ নিগূঢ় নির্যাসকে সূত্রায়িত করেন এবং রহস্যময় ও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপন করেন; তখনই সৃষ্টি হয় ধাঁধা বা হেঁয়ালি। 'কল্পনা ও মন, রহস্য ও রসবোধ, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সমন্বয়ে রচিত ধাঁধা লোকসাহিত্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শাখা। সাধারণত ধাঁধাকে বুদ্ধির খেলা বলা হয়।

ধাঁধা কেবলমাত্র অবসর যাপন বা বিনোদনের মাধ্যমই নয়, একদা বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বিয়ের আসরে বরপক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করা হতো ধাঁধা বা হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে।

মেহেরপুর জেলাতেও তার প্রচলন ছিল। বর্তমানে খানিকটা হ্রাস পেয়েছে। তাই বলে ধাঁধা-চর্চা মোটেই হারিয়ে যায়নি। বহুকাল থেকে বহু মানুষের মুখে মুখে রচিত এবং আশ্রিত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ধাঁধা বা হেঁয়ালি মেহেরপুর জেলায় এসে নতুন নাম পেয়েছে 'ফট্‌কি' বা 'ফইট্‌কি'। এই 'ফইট্‌কি' বা ধাঁধার মাধ্যমে এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের নানা ইঙ্গিতময় পরিচয় খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

আবাসন ও গৃহস্থালি বিষয়ক ধাঁধা

মেহেরপুর জেলার সাধারণ মানুষের, এমনকি গৃহস্থ বাড়িতেও ঘরের আকৃতি ছিল খড়ে ছাওয়া চারচালা বিশিষ্ট। সাম্প্রতিককালে খড়ের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে চারচালা টিনের ঘর হয়েছে। এ অঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধায় এই রকম ঘরের ছবি পাওয় যায়। যেমন :

ইট ঘুঘুর পিঠ টান
কোন ঘুঘুর চার কান। [ঘরের চাল]

শুধু ঘর নয়, এতদঞ্চলে প্রচলিত ধাঁধায় ঘরের দরজা, জানালা, কপাট, খিল, চাল, চালের বাতা, চালের মট্‌কা প্রভৃতি প্রসঙ্গেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। রান্না ঘর, গোয়াল ঘর, বৈঠক ঘর নিয়েও মুখে মুখে তৈরি হয়েছে ধাঁধা বা হেঁয়ালি। যেমন :

জানলা নেই দরজা নেই এমন আজব ঘর
আলো হাওয়ার নেই কো অভাব, বলো কী খবর? [ডিম]

গ্রামীণ জীবনে ঢেঁকির সঙ্গে সবাই পরিচিত। প্রবাদে আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ঢেঁকি নিয়ে তৈরি একাধিক ধাঁধার মধ্যে একটি হচ্ছে—

শুঁড় দিয়ে করি কাজ নই আমি হাতি
উপকার করি তবু খাই শুধু লাথি। [ঢেঁকি]

www.pathagar.com

ঘর-দোর নিয়ে বহুল প্রচলিত অরো কয়েকটি ধাঁধা—

১. ঘর আছে দোর নাই, মানুষ অছে কথা নাই। [কবর]

২. ঘরের মধ্যে ঘর, কিসের বলো ডর। [মশারি]

৩. ইনি বিনি তিনি, আমরা তিন বুনি
তিন বোনেতেই আগুন খাই
আর রাগ গরগর শুনি। [চুলায় ভাত রান্না]

৪. এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়,
বারে বারে আছাড় খায়। [ঝাঁটা/বাড়ুন]

নদী-জাল-জল কেন্দ্রিক ধাঁধা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের মুখে মুখে রচিত অনেক ধাঁধায় নদী, জাল, মাছ ধারা, ঢেউ প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন :

১. পাড়ায় পাড়ায় নাচে কন্যা পায়ে সোনার মল
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কন্যার পায় কে মনের তল? [নদী]

২. রাজার বাড়ির কালো গাই
ঘাটে ঘাটে পানি খায়। [নৌকা]

৩. তুমি থাকো জলে আমি থাকি ডালে
দুজনের দেখা হবে মরণের কালে। [মাছ ও মরিচ]

৪. ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তার উপরে ঢেউ
তার উপরে বইসি আছে লাট সাহেবের বড়। [কচুরিপানা]

৫. একটুখানি পানির মধ্যে মাছ কিলবিল করে
জেলের বাবার সাধ্যি আছে জাল ফেলতে পারে? [ফুটন্ত ভাত]

৬. জন্মে সাদা, যৌবনে কালো
পুরুষে পিঠে চড়ে বেশ তো চলো,
আছাড় দিয়ে ফেলে তোমায়
লেজ ধরে বেশ টানে ভালো। [ক্ষ্যাপ্‌লা জাল]

ক্ষুদ্র প্রাণী বিষয়ক ধাঁধা

গৃহপালিত পশুপাখি ছাড়াও মশা, মাছি, পিপড়া, ইঁদুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে প্রাত্যহিক জীবনে। প্রতীকী ব্যঞ্জনার আড়ালে তাদের পরিচয় লুকিয়ে রেখে নানা সময়ে রহস্য বা ধাঁধা সৃষ্টি করা হয়েছে বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণের জন্য। আপাতদৃষ্টিতে সহজ সরল মনে হলেও এসব ধাঁধার উপর খুঁজতে গিয়ে বেশ বুদ্ধি খাটাতে হয়। যেমন :

১. সোনার বরণ, ছয়টি চরণ.
পেট কাটলেও হয় না মরণ। [পিঁপড়া]

www.pathagar.com

২. কালো কালো পাহাড়ে কালো হরিণ চরে
দশজনে খুঁইজি আনে দুই জনাতে মারে। [উকুন]

৩. পাখা আছে পাখি নয়
তবু তাকে খুবই ভয়
তার জন্যি কখুন কী যে
রোগ বিরোগের জন্ম হয়। [মাছি]

আবার এই পাখা নিয়েই মাছ তৈরি হয়েছে অন্যরকম ধাঁধা। সেখানেও রহস্য কম নয় উত্তর খুঁজতে হিমশিম খেতে হয়। যেমন :

১. পাখা নেই উড়ে চলে, মুখ নেই ডাকে
বুক চিরে আলো ছোটে, চেনো নাকি তাকে? [মেঘ]

২. পাখি নয় তবু সে তো উড়ে উড়ে চলে
দিনে যদি নাও হয় রাতে ঠিকই জ্বলে। [জোনাকি]

৩. কালো মেয়ে আকাশে চলে
মাটি ভিজায় সে চোখের জলে। [মেঘ]

বই বিষয়ক ধাঁধা

১. গাছ নেই তার আছে শুধু পাতা
মুখ নেই তবু বলে শুধু কথা। [বই]

২. বুদ্ধি নেই তার আপন ধড়ে
তা বিলিয়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে। [বই]

৩. বাতি নয় তবু ছড়ায় আলো
দূর করে সব মনের কালো। [বই]

পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ক ধাঁধা

পোশাক-পরিচ্ছদ আড়াল করে শরীর। কিন্তু এই পোশাক নিয়ে রচিত ধাঁধায় দেখা যায় রূপকের আড়ালে পোশাক-পরিচ্ছদেরও ভিন্ন তাৎপর্য হয়। যেমন :

১. হাত আছে পা নেই।
গলা আছে মাথা নেই। [জামা]

২. একটুখনি মামা
গা ভারা তার জামা। [পেঁয়াজ]

৩. রাঙা বিবির জামা গায়
ভাঙলি বিবি দুখান হয়। [মসুরের ডাল]

www.pathagar.com

ফল-ফসল-সবজি বিষয়ক ধাঁধা

প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যদি তা প্রতীক বা রূপকের আড়াল তৈরি করে রহস্যময় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা যায়। সামান্য শাক সবজিও তখন অসামান্য হয়ে ওঠে। যেমন :

১. বুনতে মশুরী, তুলতে গ্যাড়া,
যে বলতে না পারবে, তার বাপ বুড়ো ভেড়া। [মূলা]

২. প্রথমে মুড়ি তারপর খই
তারপর সটাং সই। [সজ্‌নে ডাঁটা]

৩. বন থেকে বেরুলো টিয়ে
লাল টোপর মাথায় দিয়ে। [কলার মোচা/আনারস]

৪. মাটির নিচে থাকে বুড়ি
কাপড় পরে তিন কুড়ি
ধোপায় কাপড় নেয় না
কাপড় ময়লা হয় না। [রসুন]

৫. উঠোন চচ্চড়ি বেলে মাটি
খায় খোসা নেই কো আঁটি। [পেঁয়াজ]

৬. রাজার বাড়ির ঘোড়া
এক বিয়ানেই বুড়া। [কলাগাছ]

শরীরের অঙ্গ বিষয়ক ধাঁধা

১. একটুখানি পুকুরে জল টলমল করে
কারো বাপের সাধ্য নেই জাল ফেলতে পারে। [চোখ]

২. মায়ের পেটের দুই বোনে
কেই বা কাকে চেনে শোনে! [দুই চোখ]

৩. দুই পারেতে দুই ভাই
দেখা হয় তো পরিচয় নাই। [দুই হাত]

৪. এক হাত লম্বা গাছটা
ফল আছে তাতে মোট পাঁচটা। [হাত ও আঙুল]

চারদিকের ধাঁধা

বাঙালি পরিবারে ভ্রাতৃত্বের এই বিরোধের চিত্র প্রচলিত অনেক ধাঁধার মধ্যেও ফুটে উঠেছে। ব্যাপারটা মোটেই ভ্রাতৃবিরোধের নয়, তবু রূপকের ছদ্মবেশে সেই চিত্রই বড় হয়ে ওঠে। যেমন :

ছিল তারা চার ভাই
বাস করে চার ঠাঁই

www.pathagar.com

একই মায়ের চার ছেলে
তবু তাদের দেখা নেই। [পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক]

পানি বিষয়ক ধাঁধা

খাল-বিল, নদী-নালায় পানি থাকলে সেটা স্বাভাবিক, আর যদি গাছের মাথায় অথবা ঢেলার উপরে সুস্বাদু পানির সন্ধান পাওয়া যায় সেটা তো অস্বাভাবিকই বটে। আর এই অস্বাভাবিকতা ঘিরে যদি রহস্যময় ধাঁধা সৃষ্টি করা যায় তাহলে সেটা হয়ে ওঠে আরো উপভোগ্য। যেমন :

১. খালবিল শুকিয়ে গেল
ঢেলার উপর পানি। [তরমুজ]
২. গাছের গোড়ায় নেইকো পানি
গাছের মাথায় পানি। [ডাব গাছ]
৩. আল্লার কি কুদরৎ
লাঠির মাথায় শরবত। [আঁখ]

খাদ্য খাবার বিষয়ক ধাঁধা

১. গাছে নয় হাড়িতে
সাদা সাদা ফুল ফোটে
সব্বার বাড়িতে। [ভাত]
২. বাড়িতে আছে কাঠের গাই
বছর বছর দুয়ি খাই। [খেজুর রস]
৩. সাগরেতে জন্ম তার লোকালয়ে বাস
মায়ে ছুঁলে পুত্র মরে এ কী সর্বনাশ। [লবন]
৪. আঁটি আঁটি আঁটি
মাটির নিচে লাঠি। [সেদ্ধ খাওয়ার আলু]

এ অঞ্চলে এক সময় মৃৎশিল্পের যে ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মাটির হাঁড়ি-পাতিল, কলসি-ভাঁড় ইত্যাদি বিষয়ক নানা ধাঁধা থেকে। যেমন-মাটির হাঁড়ি বিষয়ক ধাঁধা :

লাল বুড়ি হাটে যায়
চড় খাতি খাতি পরাণ যায়। [মাটির হাড়ি]
অথবা, লাল বুড়ি হাটে যায়
দোষ না করেও থাপ্পড় খায়।

এই হাটে যাওয়া নিয়ে অন্যরকম ধাঁধা ও আছে। মাটির তৈরি তৈজসপত্র নয়, তরিতরকারি আনাজ পাতিও হাটে যায়, তাকেও ভালো-মন্দের পরীক্ষা দিতে হয়। যেমন :

ধলা মিয়া হাটে যায়
নিত্য হাটে চিমটি খায়। [লাউ]

www.pathagar.com

অথবা,

রাজপুত্তুর হাটে যায়
জামার পরে জামা গায়। [বাঁধা কপি]

অলংকার ও প্রসাধন বিষয়ক ধাঁধা

বাঙালি নারী চিরদিনই অলংকারপ্রিয়। আগের দিনে আধুনিককালের প্রসাধন-চর্চার সুযোগ ছিল না বটে, তবে প্রাকৃতিক উপায়ে রূপচর্চাও প্রসাধনীচর্চা কখনো বন্ধ থাকেনি। প্রচলিত বহু ধাঁধায় নানাবিধ সোনারূপার অলংকারের উল্লেখ মেলে। চুড়িঅলার কাছে বসে চুড়ি পরা নিয়ে রচিত এবং দেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত রসমধুর ধাঁধাটি এ রকম :

হাসতে হাসতে গিয়ে বসে পরপুরুষের কাছে
ঢোকানোর সময় কান্দাকাটি, হয়ি গেলিই হাসে। [চুড়ি পরা]

ধাঁধার ভেতরে সিঁদুর, কাজল, তেল-চিরুনি প্রভৃতি প্রসাধন দ্রব্যের উল্লেখও পাওয়া যায়।

সিঁদুরে ডগোমগো কাজলের ফোটা
হাজার হাজার ফলে, তবু একটাই বোঁটা। [কুঁচ ফল]

প্রসাধন কাজের ব্যবহৃত আয়না-চিরুনি নিয়েও এ অঞ্চলে ধাঁধার প্রচলন আছে। যেমন :

যার মদ্যি মানুষ নাই
তার মদ্যিই মানুষ পাই। [আয়না]

পান-তামাক বিষয়ক ধাঁধা

এ অঞ্চলে পান-চাষের ইঙ্গিত পাওয়া যায় প্রচলিত প্রবাদে :

খড়িতে জড়ো সড়ো।
ডাঙ্গাতে বাস
ফুল নেই ফল নেই
ধরে বারো মাস। [পান]

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি-পান-তামাকের ভক্ত। পান-তামাক ছাড়া আতিথেয়তা মোটেই পূর্ণতা পায় না। হুক্কা বা গড়গড়ি দ্বারা তামাক-সেবনের রীতি একদা এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই 'হুক্কা' নিয়ে রচিত হয়েছে চমৎকার সব ধাঁধা। যেমন :

ওই পাড়ায় শুইনি আলাম আজব এক কথা
ছোট ভাইয়ের পাছার মদ্যি বড় ভাইয়ের মাথা। [হুকো ও কল্কে]

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

যে কোনো ভাষার প্রাণসম্পদের পরিচয় মেলে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে। ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মতে, "সুন্দরীর অলকতিলকের ন্যায় প্রবাদবাক্যগুলি ভাষার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে।" লোকসাহিত্যের রত্নভাণ্ডারে প্রবাদ-প্রবচনগুলিই সবচেয়ে উজ্জ্বল মণিমানিক্য। বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং লোকপরম্পরাগত, নীতিগর্ভ ও জীবন সমালোচনামূলক ক্ষুদ্রতম বিশেষ উক্তি বা ছন্দোবদ্ধ দুই চরণের বক্তব্যই বাংলা লোকসাহিত্যে প্রবাদ হিসেবে পরিচিত। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতোই প্রবাদের দর্পণে প্রতিফলিত হয় সমাজের ঐতিহ্য, জ্ঞান, শিক্ষা, আচার, সংস্কৃতি সব কিছুই। মেহেরপুরে প্রচলিত প্রবাদগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রবাদ

প্রচলিত প্রবাদগুলির মধ্যে অনেক সময় ফুটে ওঠে পারিবারিক জীবন ও সম্পর্কের ছবি। পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজে নারী নিগ্রহের দৃষ্টান্ত প্রচুর থাকলেও প্রবাদে মায়ের প্রসঙ্গই বারবার এসেছে এবং তা যথেষ্ট মর্যাদা ও মমতার সঙ্গেই এসেছে। যেমন :

১. চিড়ি মুড়ি যা-ই বোলো ভাতের সুমান নয়
খালা-ফুপু যা-ই বোলো মায়ের সুমান নয়।

২. মায়ের চোখের হাসি
হয় কখনো বাসি।

৩. আটার গুণে রুটি
মায়ের গুণে বেটি।

৪. যেমন মা, তেমন ছা।

পরিবারে বাবার অবস্থান বাস্তবে যেমনই হোক, প্রবাদে কিন্তু মায়ের সমান শ্রদ্ধাবহ মোটেই নয়, বরং সন্তানের প্রতি বাবার স্নেহশূন্যতার ছবিই প্রবাদে ফুটে ওঠে। যেমন :

১. মা মরলি বাপ হয় তায়ুই
ছেলিপিলি হয় বনের বায়ুই।

২. বাপ দেখিনি বাবার কালে
হ্যাঁ গো বাবা কাকে বলে।

৩. বাপে না পুতে
চোঙা ভইরি মোতে।

পিতৃতান্ত্রিক এই পরিবারে সন্তান বড় হয় বাবার পরিচয়েই, উত্তরাধিকার সূত্রে পৈত্রিক সম্পত্তিরও অংশ পায়, তবু মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া যে সন্তানের সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব নয় সে কথাই ফুটে ওঠে নিচের প্রবাদে-

www.pathagar.com

১. মায়ের স্তন চুষে না হলে
বাপের ধোন চুষে কী হবে?

পারিবারিক আত্মীয়ের মধ্যে মামা-ভাগ্নের সম্পর্কই যে সবচেয়ে মধুর, 'মামার বাড়ির আবদার' প্রবচনের মধ্যেই সেটা ফুটে ওঠে। মেহেরপুর অঞ্চলসহ সারাদেশেই ব্যাপক পরিচিত প্রবাদেও সেই চিত্রই পাওয়া যায় :

মামা-ভাগ্নে যেখানে
আপদ নেই সেখানে।

আবার 'কংস মামা'র দল ভাগ্নেকে আপদ শুধু নয়, বিপদ বলেও গণ্য করেছেন ক্ষেত্রবিশেষে। প্রচলিত প্রবাদে দেখা যাচ্ছে 'আপনজনে'র তালিকা থেকেই ভাগ্নেকে বাদ দেওয়া হয়েছে :

যম-জামাই-ভাগ্নে
তিন নয় আপ্‌নে।

'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'-এ প্রবাদ যেমন সত্যি মামার গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলে, তেমনি আবার কোনো কোনো প্রবাদে মামার প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পায়। যেমন :

মায়ের ভাই মামা
কান্ধে থিকি নামা।

মামা কখন দুর্বহ বোঝা হয়ে ওঠে আমরা জানি না, তবে মামি বা মামানি চরিত্রটি প্রবাদে বিশেষ শ্রদ্ধা কখনো পায়নি। একটি প্রবাদে পাই :

যে ভারি মোর মামানি
পান্তাভাতে আমানি।

'মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি' হওয়াকে কেউই সুনজরে দ্যাখে না। 'বিড়ালকে বাঘের মাসি'র মর্যাদা দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত কে বলবে সেই কথা। তবে বাঙালি পরিবারে মাসি এবং পিসি উভয়েরই আছে প্রীতিমধুর আদরণীয় স্থান। তবু দেখি পুরুষতান্ত্রিকতা এসে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে মাসি এবং পিসির মাঝখানে। প্রবাদে বলে :

বাপের বোন পিসি, ভাত-কাপড়ে পুষি
মায়ের বোন মাসি, কাদায় ফেলে ঠাসি।

কটাক্ষপ্রিয় এই সমাজে যারা 'বরের মাসি এবং কন্যার পিসি' উভয় ভূমিকা একই সঙ্গে পালন করতে চায়, তাদের কখনো সুনজরে দেখা হয় না। মেসো বা খালুকে নিয়েও প্রবচন আছে, কিন্তু সেখানে পুরুষকে খুব খাটো করে দেখানো হয়েছে। কী যে অবিশ্বাস মেশানো বাক্য- 'পুরুষমানুষ কারো খালু হয় না।'

বাঙালি পরিবারের মেয়েরা বিয়ের পর দূরদূরান্তে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় বলেই প্রবাদে বলা হচ্ছে-'গাঙে গাঙে দেখা হয় তো বোনে বোনে দেখা হয় না।' আর ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে- 'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই।' তা ঠিক, একান্নবর্তী পরিবার এক সময় ভেঙ্গে যায়, কিন্তু ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কি চিরতরে ছিঁড়ে যায়? না, প্রবাদে জানাচ্ছে, 'মায়ের পেটের ভাই, ঠিকই চিনা যায়।' কিংবা 'ভাইয়ের বাড়া দোসর নাই।' অথবা, 'ভাইয়ের জন্যি কান্দে, ভাইয়ের জন্যি বান্দে।' 'রামের ভাই লক্ষণ' সবাই হোক বা না হোক, বাংলা প্রবাদে ভাইয়ের প্রতি ভক্তির ব্যাপারটা খুবই উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু

www.pathagar.com

ভ্রাতৃবধুর ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো। প্রবাদের ভাবি বড়ই মমতাশূন্য, নির্দয়; অন্তত ননদদের ক্ষেত্রে। প্রবাদে আছে : 'ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।'

অথবা,

কী করবে ভাই ভালোবেসে,
ভাবি আমার সর্বনেশে।

পারিবারিক জীবনে দেবর-ননদের স্থান প্রীতিমধুর হলেও ভাসুরকে রাখা হয় বেশ সম্মানজনক দূরত্বে। ঠাকুর দেবতার পর্যায়ের মানুষ বলেই সহজে ভাসুরের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় না। প্রবাদে পাওয়া যাচ্ছে-

ভাসুরের নাম সবাই জানে
কিন্তু কেবা মুখে আনে!

দেবর বা ভাসুরের স্ত্রী হচ্ছে জা। বহুদিনের প্রচলিত ধারণা—পরের মেয়ে জায়েরা এসে ভ্রাতৃবিরোধ তৈরি করে দেয় এবং সংসারে ভাঙন ত্বরান্বিত করে; প্রবাদেও প্রতিফলিত হয়েছে :

১. ভাইয়ে ভাইয়ে মিল নেই, জায়ে জায়ে মিল
ঘরের দুয়োর খোলা রাইখি কোথায় দেব খিল!

অথবা ২. জায়ের গু জায়ে খায়
ননদের গু গড়াগড়ি যায়।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ক প্রবাদ : সংসার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। স্বামীর যোগ্য স্ত্রী অথবা স্ত্রীর যোগ্য স্বামী হলে তো সোনায় সোহাগা। প্রবাদে বলা হচ্ছে :

যেমন হাঁড়ি তেমন সরা
মিলিয়ে দিয়িচে খুদাতালা।

পুরুষ শাসিত এই সমাজে 'ভাত' দেওয়ার ভাতার না কিল মারার গোসাঁই' অনেক পাওয়া যায়। নারীর শ্রমের মূল্যায়ন করে না সমাজ। অথচ স্বামীর সংসারেও নিজের গতর খাটিয়ে তবেই স্ত্রীকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সেই ইঙ্গিতও মেলে প্রবাদে :

ভাত দেয় না ভাতারে
ভাত দেয় আপন গতরে।

রূপে-গুণে যেমনই হোক, প্রত্যেক নারীই চায় একজন স্বামী। উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া গেলে কী আর করার থাকে, অনুপযুক্ত পাত্রকেও মেনে নিতে হয়। নাতি-নাতনি সম্পর্কের কাউকে কাল্পনিক পাত্র/পাত্রী হিসেবে বিবেচনা করাও এই সমাজেরই একটি রীতি। তাই প্রবাদে আছে :

অগত্যা নাতি ভাতার
নাতি আবানে গাঙে সাঁতার।

পছন্দ হোক বা না হোক, স্বামীর প্রতি স্ত্রীকে আনুগত্য দেখাতেই হয়। হয়তো গোপনে দীর্ঘশ্বাস চেপে স্ত্রী কোথাও বলে ওঠে :

এমনিই কপাল পুড়া
তাও ভাতার পালাম খুঁড়া।

www.pathagar.com

কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অবশ্যকরণীয় কর্তব্যগুলো তো তাকে পালন করতেই হয়, নইলে লোকে কী বলবে! প্রবাদেও তাই বলা হয়েছে :

যে রূপের ভাতার!
আমার দেখলি চাপে ন্যাকার,
কাছে যদি না শুই তো
লোকে বোলে ঠ্যাকার।

প্রচলিত প্রবাদে এর উল্টো দিকের ছবিও পাওয়া যায়। স্ত্রীর রূপে তৃপ্ত হতে না পেরে স্বামীও ওই একই রকম পরিহাস করে ওঠে—

যে মোর রূপখান
নাম তার নূরজাহান।

বাড়তি আয়যুক্ত স্বামীর মর্যাদা যেমন সমাজেও বেশি, প্রবাদেও তেমনি তার ছায়া পড়েছে-

মাছের রাজা ইলিশ
স্বামীর রাজা পুলিশ।

স্বামীর জন্য বাঙালি নারীর প্রতীক্ষা নতুন কিছু নয়; সাজসজ্জা করে, চিরুনিতে সিঁথি পেড়ে পথ চেয়ে থাকে নারী। এই পথ চাওয়া কখনো সফল হয়, কখনো হয় না। প্রবাদে পাওয়া যাচ্ছে-

আসুক না আসুক বর
সিঁথি পেড়ি পেড়ি মর।

বাঙালি পরিবারে গৃহকর্ত্রী বা গৃহিণীকে বলা হয় গিন্নি। গিন্নিরা চিরদিনই কর্তৃত্ব খাটায় বাড়ির বৌ-ঝিদের উপরে। সেই গিন্নির শাসন থেকে মুক্তির পথ খোঁজে বৌ-ঝিয়েরা। প্রবাদে পাওয়া যাচ্ছে সেই ঐকান্তিক বাসনার কথা—

গিন্নি মরলি সিন্নি দেব
আঁচল ঝুলিয়ি ঘাটে যাব
আমি গিন্নি কবে হব!

কিন্তু গিন্নি হওয়া কি অতোই সোজা? এ দায়িত্ব সবাই পালন করতে পারে না। প্রবাদে আছে :

এ্যালানি বউ ফ্যালানি হলো
হাঁড়ি-খাকি বউ গিন্নি হলো।

এ রকম অযোগ্য মানুষ গিন্নি হলে রান্নার যে কী দশা হবে তাও বলা হয়েছে প্রবাদে :

গিন্নির কী যে ছিরি
শাকে দেয় জিরি।

রান্নাবান্নার অনিয়ম শুধু নয়, এমন গিন্নির পক্ষে আরো অরাজকতা করা সম্ভব। পিরের দরগায় সিন্নি দেওয়ার বদলে গোয়ালে দিয়ে আসেতেও পারে। প্রবাদে আছে :

ওরে আমার গিন্নি,
পিরের দরগা বাদ দিয়ি
গোয়ালে দেয় সিন্নি।

সমাজ নারীকে সম্মানের চোখে দেখে না বলেই জব্দ করতে চায়। আর সে কারণেই শ্বশুরবাড়ি হয়ে ওঠে নারীর কাছে ভীতিকর জায়গা। প্রবাদে উল্লেখ করা হয় :

www.pathagar.com

লোহা জব্দ কামারবাড়ি
মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ি ।

আর নারী যদি একটু অসুন্দর হয়, তাহলে তো কটাক্ষের শেষ থাকে না। প্রবাদ তৈরি হয়ে যায় ।

চেহারা ছবি আন্ধার কোটা
তার উপরে সিঁদুরের ফোঁটা ।

অন্য এক প্রবাদে পাওয়া যাচ্ছে :

কানা চোখে দিয়ি কাজল
নিজের রূপে নিজেই পাগল ।

ঘরের বউকে নিয়ে বেশ রঙ্গরসিকতার চিত্রও ফুটে উঠেছে কোনো কোনো প্রবাদে। যেমন :

বউ কুথায়-বাপের বাড়ি
আনিসনি ক্যানে-বড্ড ভারি
মারিস নি ক্যানে-জান পিয়ারি ।

বহু বিবাহের প্রবাদ

ঝিকে মেরে বউকে শিক্ষা দেওয়ার সামাজিক প্রথার পরিচয় প্রচলিত প্রবাদেও পাওয়া যায়। কিন্তু সেই বউ যদি দ্বিতীয়, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর হয়, তাহলে? না, সে ক্ষেত্রে চিত্র অন্য রকম। শাসন নয়, সোহাগই সেখানে বড় হয়ে ওঠে। আর যতো অবহেলা তা কেবল প্রথম পক্ষের বউয়ের বেলায় প্রযোজ্য। যেমন :

এক পক্ষের বউ আমার হেলাফেলা
দুই পক্ষের বউ আমার গলার মালা
তিন পক্ষের বউ আমার পাকা কলা
চার পক্ষের বউ-কেঁদো না
চাল ভিজিয়ে খাব, ভাত রেঁধো না ।

পুরুষের বহুবিবাহ এখনো সমাজে চালু আছে। তবে এই প্রথার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশুভ এবং অশান্তিময় হয়ে দেখা দেয়। এ নিয়েও প্রচুর প্রবাদ আছে। এমনই একটি প্রবাদে দুই বউ নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছে :

দুটু বউয়ের ক্যামন জ্বালা
জানে মোর এরশাদ কালা ।

সপত্নীবাদের প্রবাদ

সপত্নীবাদের জ্বালা চিরদিনই বাঙালি নারীর অন্তর ক্ষত-বিক্ষত করেছে, তার চরিত্রে দিয়েছে হিংসাপরায়ণতা। মেহেরপুরের প্রবাদেও সেই চিত্র মেলে :

সতীন হলু গলার মালা, আমি হনু পর
তেমনি মাগির কান্ধে আছে জ্বিন-পেত্নির ভর ।

www.pathagar.com

শুধু সতীনই নয়, সতীনপুত্রও হয়ে ওঠে দুচোখের বিষ। তাই তার স্বাস্থ্যের বর্ণনাও হয়। বিকৃত :

আমার ছেইলি আলাভুলা, উনার ছেইলি হুঁৎকা
খাতি বইসি খায়ি ওঠে পোন সের চাইলির কোঁত্কা।

সপত্নীবাদের জ্বালা নারীকে স্বভাবতই অনুদার করে তোলে, তাই প্রবাদে পাওয়া যায় তার স্পষ্ট ঘোষণা : 'ভাতের ভাগ দেব তো ভাতারের ভাগ দেব না।' ফলে ঈর্ষাকাতর নারী কিছুতেই সহ্য করতে পারে না সতীনের রূপগুণ। সব কিছুতেই নিন্দা করা হয়ে ওঠে তার স্বভাব। কিন্তু ছোট বউয়ের দুর্নাম সইবে কেন স্বামী? সে প্রথম বউকেই তখন শোনায়,

নিজির গাল দ্যাখ না শালী
পরকে বুলিস ট্যাবা-গালি।

আসলে একাধিক বিয়ে করে পুরুষও সে খুব সুখী হয়, তা কিন্তু নয়। প্রাথমিক মোহ কেটে যাবার পর তার অবস্থাও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয় প্রবাদ বলছে :

দুই মাইগের ভাতার,
না পায় সাঁতার,
না পায় পাথার।

পরকীয়া প্রেমের প্রবাদ

পরকীয়া প্রেমকে সমাজ কখনোই অনুমোদন দেয়নি। লোকচক্ষুর অন্তরালে তবুও প্রেম প্রবহমান। প্রেমিককে এ জন্যে চরম মূল্য দিতে হয়, কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সেই কষ্টের ছবি ফুটে উঠেছে প্রবাদে :

নাঙের আশায়
পইড়ি থাকনু ন্যাশায়, [ন্যাশায়= নিচু জায়গায়]
কাম্ড়ি খাইলু মশায়।

লোকনিন্দার ভয় যতোই থাকুক, পরকীয়া প্রেমের গল্প কারো কাছে গোপনে বলতে না পারলেও বুঝি স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। কিন্তু ঝুঁকি তো আছেই। তাই সাবধানতার কথা বলা হয়েছে প্রবাদে :

নাঙের বাড়ির গল্প
করলি করিস অল্প।

পরকীয়া প্রেমে কত যে জ্বালা, আর কত যে বাধা! এই ধরনের প্রেমের কথা প্রকাশ তো করাই যায় না, এমন কি প্রেমিকের মৃত্যু ঘটলে প্রকাশ্যে কাঁদাও যায় না। প্রবাদে বলছে :

ঘরের কতা কতি নি
নাঙ মরলি কাঁদ্তি নি।

পতিতাবৃত্তির প্রবাদ

পতিতাবৃত্তিকে সমাজ কখনোই সুনজরে দেখে না। আদিম এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি প্রতিনিয়ত হয় নিন্দিত। প্রবাদে পতিতারাও চিহ্নিত হয়েছে অত্যন্ত মন্দভাবে। যেমন :

www.pathagar.com

১. বেশ্যা খাতায় নাম লিখিয়ে
খদ্দের দেখা যায় বেঁকিয়ে।
২. সাত ছিনালের কাজল লতা
দুধ দিয়ে ধোয় পায়ের পাতা।

প্রেম বিষয়ক প্রবাদ

নর-নারীর প্রেম কোনো বাধাই মানেনি কখনো। প্রবাদেও দেখা যাচ্ছে জাতপাতের বহু ঊর্দ্ধে প্রেমের অবস্থান। যেমন :

১. পিরিতে মজিলে মন
কী যে হাঁড়ি কী যে ডোম!
২. একই বসন, একই বাসন, একই হাঁড়ির ভাত
তুমরা সবাই বোলো শুনি প্রেমের কিবা জাত!
৩. মাতায় রাখলি উকুনে খাবে
মাটিতি রাখলি পিঁপড়ি খাবে
ওলো আমার নয়া পিরিতের কী হবে!

কিন্তু পেটের জ্বালা বুঝিবা প্রেমকেও পরাস্ত করে। ক্ষুধাই হয়ে ওঠে বড় সত্য। নির্মম সেই বাস্তবতার কথাও প্রকাশ পায় প্রবাদে :

প্যাটে যখুন ধরবি জ্বালা
মাইগ্ ছেইলি সব ফেইলি পালা।

ঋতু বিষয়ক প্রবাদ : ঋতু বৈচিত্র্যের এই দেশে মাসে মাসে বদ্‌লে যাওয়া প্রাকৃতিক রূপ ও সৌন্দর্য নিয়েও রচিত হয়েছে অসংখ্যা প্রবাদ প্রবচন। যেমন :

১. বোশিখ মাসের খরানি
পা-দিয়ি যায় সরানি?
২. মা্গ্ মাসের জাড়ে
আগুন লাগে হাড়ে;
বাঘ বোলে একি ঠাণ্ডা
মলাম বাপরে মারে!

মানবস্বভাব বিষয়ক প্রবাদ

মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি সত্যিই বহু বিচিত্র। স্নেহ-প্রীতি-ঈর্ষা-অসূয়া এই সব কিছু নিয়েই মানব প্রকৃতি। প্রাকৃতিক এই বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। তাই প্রবাদেও বলা হয়েছে :

ইল্লত যায় না ধুইলে
খাস্‌লত যায় না মইলে।

অপরের অশান্তি দেখে নিজে আনন্দ লাভ করার মতো বিকৃত মানসিকতাও সমাজের অনেকেরই আছে। সেই ছবি ফুটে উঠেছে প্রবাদে :

ঘুঁটো পোড়ে গোবর হাসে
এমনি দিন তুমারও আছে।

www.pathagar.com

নারী-মনের রহস্য নিয়ে পুরুষের কৌতূহলের সীমা নেই। এ নিয়ে কাব্য কবিতাও কম লেখা হয়নি। প্রচলিত প্রবাদে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

ভাদুরি ম্যাগের আওলা যেমন [ভাদুরি-ভাদ্র মাসের]
যুবতী নারীর মন তেমন।

আবার পুরষমানুষকে নিয়েও প্রচুর প্রবাদ আছে। যেমন :

কুকুর ক্ষ্যাপে কাত্তিকে
পুরুষ ক্ষ্যাপে বাতিকে।

'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা', অথবা 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা'-এ রকম অসংখ্য বহুল প্রচলিত প্রবাদ এই মেহেরপুর অঞ্চলের মানুষেরও মুখে মুখে চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। আবার প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রবাদ। যেমন :

১. সারা গাঁ হুলুস্থূল
জানে না মোর আব্দুল।
২. কে বুলিচে কিসের কতা
গা ঘোরে না ঘোরে মাথা।
৩. কী ছিনু, আর কী হনু [ছিনু= ছিলাম, হনু = হলাম]
এক কাঠা চাল নিয়ি চিৎ হয়ি পনু [পনু = পড়লাম]

মানুষের স্বভাবই হচ্ছে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ ঘটানো। জায়গা না পেলেও জোরজবরদস্তি করে নিজের জায়গা করে নিতে সবাই তৎপর। আধিপত্যবাদী এই মানসিকতার ছবি প্রবাদেও খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন :

১. বস্‌তি পালি শুতি চায়
শুয়ার জাগা কনে পাই!
২. বস্‌তি পায় না পিঁড়ি
জায়গা নেবে জুইড়ি।

অসঙ্গতি বিষয়ক প্রবাদ

সামাজিক জীবনে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয় না। প্রচলিত অনেক প্রবাদ-প্রবচনে নানাবিধ প্রতীকের আশ্রয়ে এ ধরনের অসঙ্গতি ফুটে উঠেছে। যেমন :

১. ছেইলির চায়ি ছেইলির গু ভারি
তাইতি তুমার ধার ধারি।
২. কুদালের চায়ি আছাড়ি বড়
মুরগির চায়ি ডিম দড়।
৩. বাঁশের চায়ি কুঞ্চি বড়
তারই ভয়ে জড়োসড়ো।

'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি' হচ্ছে সাংঘাতিক অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত। ফলে যতোই মোটা এবং ভারি হোক, ফলভারে নিশ্চয় কোনো গাছ ভেঙ্গে পড়ে না, তবে নত

www.pathagar.com

হয়, বিদ্যার ভারে মানুষও তেমনই হয় বিনয়ী। আবার বাড়াবাড়ির অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়েছে প্রচলিত প্রবাদে :

১. অতি বাড় বাইড়ু না, ঝড়ে ভাইঙ্গি যাবে
অতি লোভ ভালো নাকো বাঘে ধইরি খাবে।

'বামুন হয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে চাওয়া' কে স্বাভাবিক প্রত্যাশা বলে কেউ নিশ্চয় মানবেন না। তবু সমাজে এ রকম অস্বাভাবিক ঘটনার ছবি অনেক দেখা যায়। প্রবাদেও সেটা ফুটে ওঠে :

পায় না পচা পুঁটি
খেতে চায় গোস্তরুটি।

গৃহস্থালি তৈজসপত্র বিষয়ক প্রবাদ

এতদঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদে ঘর-গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার্য তৈজসপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন :

১. চোরের উপর রাগ কইরি মাথায় দিয়ি হাত
থালা-বাসন লুকিয়ি থুয়ি মাটিত বাড়ে ভাত।

২. যার শিল তারই নুড়া
তারই ভাঙ্গে দাঁতের গুড়া।

৩. কোদালের চায়ি আছাড়ি বড়।

৪. নিজির খুন্তি বাঁদরের হাতে দিতি নি।

৫. ঘষে ঘষে খুন্তি কড়াই
এমনি হয় না ন্যাকড়া জড়াই।

খাদ্য খাবার বিষয়ক প্রবাদ

'হাঁড়ির ভাত একটা টিপলেই টের পাওয়া যায় হাঁড়ির খবর।' ভাত কিংবা অন্যান্য খাদ্য খাবার নিয়ে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে অসংখ্য প্রবাদ ও প্রবচন। মেহেরপুর জেলার সাধারণ মানুষেরাও সেগুলো গ্রহণ করেছে আঞ্চলিক উচ্চারণে। আবার এতদ্বিষয়ক কোনো প্রবাদ হয়তো সবার অলক্ষে এ অঞ্চলেই রচিত হয়েছে মুখে মুখে। খাদ্য খাবার বিষয়ক প্রবাদের উদাহরণ :

১. দুদিনের বৈরাগী, ভাতকে বোলে অন্ন
কতা শুইনি শরীল জ্বলে- এ কীরম জঘন্য!

২. পান্তাভাতে ঘি, কুতাও শুনিনি।

৩. কাঙালকে শাকের ভূঁই দ্যাখ্যাতি নি।

৪. কবে খায়ুছু ঘি, এ্যাখুন বা তার কী!

৫. ভাতের সাথে ডাল ভালো
রাঙা বউয়ের গাল ভালো।

৬. মাছের মদ্যি খয়রা
কুটুমের মদ্যি ভায়রা।

www.pathagar.com

৭. রুটি বলো পিঠি বলো ভাতের উপর না।
খালা বলো ফুপু বলো-সবার উপর মা।

৮. মাছের তেলে মাছ ভাজা
শক্ত দ্যাখো কার মাজা।

নারীশ্রম বিষয়ক প্রবাদ

মেয়েরা সাধারণত গৃহকর্মেই শ্রম দিয়ে থাকে। পুরুষশাসিত সমাজে এই গৃহশ্রমের বিশেষ কোনো মূল্য নেই। মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে দরিদ্র মহিলারা গৃহকর্মের বাইরেও নানাবিধ কাজে শ্রম দিয়ে নগদ অর্থ উপার্জন করছে। এ জেলায় ব্যাপক হারে তামাক চাষ হবার কারণে অনেক মহিলাশ্রমিক এখন তামাক শিল্পে যুক্ত হয়ে পড়েছে। সেই চিত্র এখানকার প্রবাদে প্রতিফলিত হয়েছে :

কনে যাচ্চো নাচতি নাচতি?
নাঙের বাড়ি তামুক বাছতি।

শুধু তামাক-বাছাইয়ের কাজেই নয়, এ জেলার মহিলা শ্রমিকেরা ইট ভাটায় ইট বওয়া, এমনকি মাটি কাটার মতো কঠিন কাজেও পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করছে, জীবনে একটুখানি স্বচ্ছলতার আশায়। কঠিন এই নারীশ্রম নিয়েও রচিত হযেছে কৌতুককর প্রবাদ :

মাগি মানুষ কাট্‌ছি মাটি
হায়রে জীবন পরিপাটি।

অতিথি বিষয়ক প্রবাদ

বাঙালি পরিবারে অতিথি প্রায় নারায়ণের মতোই সমাদৃত হন। কিন্তু গৃহস্থের ঘরে যদি চাল-বাড়ন্ত হয়, তাহলে অতিথির প্রতি বিরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তখন কণ্ঠে উঠে আসে প্রবাদ :

১. জ্বালার উপর জ্বালা
তার উপরে আইলো আবার
বড় বউয়ের খালা।

২. আগে নিজের পাছা ঢাক
পরে শংকরীকে ডাক।

৩. শাউন মাসে ভাতের জ্বালা (শাউন = শ্রাবণ)
অতিত ফকির পালা পালা। [অতিত = অতিথি]

৪. কানা গরু বামুনকে দান
যা পাবি তাই ধইরি আন।

www.pathagar.com

কাজ বিষয়ক প্রবাদ

সংসারে কাজের শেষ নেই। ঘর-গেরস্থালির কত রকম কাজ। কাজ নিয়েও বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে নানা রকম প্রবাদ। যেমন :

কাজের ব্যালা কাজী
কাজ ফুরালিই পাজি।

আবার এ সংসারে 'অকাজের ঢেঁকি'ও তো কম নেই। তাদের এই অকর্মণ্যতা নিয়েও রচিত হয়েছে প্রবাদ। যেমন :

কাজের নি সন্ধান।
অকাজের পিরধান। [পিরধান > প্রধান অর্থে]

সংসারের নৈমিত্তিক কাজগুলো শেষ হলেও আসলে মেয়েদের কাজ যেন কখনো ফুরায় না। তখন শুরু হয় অন্য কাজ—কাঁথা সেলাই, পাটি বুনানো, উঠোন নিকানো, এই রকম আরো অনেক কিছু। কিন্তু সেগুলো কি কাজের মধ্যে গণ্য হয়? হয় না। প্রবাদেও ফুটে ওঠে সেই চিত্র :

১. কাজ নি তো করি কী
ছিঁড়া ক্যাঁথায় ধাগা দি। [ধাগা > সেলাই]

২. নেই কাজ
তো খই ভাজ।

৩. কাজের নামে দুই
খাই আর শুই।

ঘরের কাজ করা না করার প্রশ্নে আসে স্ত্রী নির্যাতনের প্রসঙ্গও। প্রবাদে পাওয়া যায় :

মারের আগাই ভূত পালায়, পেত্নী বইসি কাঁন্দে
ঘরের বউ লক্ষ্মী হয়ি হাত পুড়িয়ি রান্ধে।

চোর বিষয়ক প্রবাদ

'চোর না শোনে ধর্মের কাহিনি'- বহুদিনের পুরানো প্রবাদ। চুরি তবু বন্ধ হয়নি সমাজে। তাই প্রবাদ চালু হয়েছে 'চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন।' আর 'চোরের মার বড় গলা' তো আছেই। কে করবে তার বিচার? 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।' চুরি যত না অভাবে, তারও অধিক স্বভাবে। তাই প্রবাদে আছে-

চোর যদি যায় গঙ্গাস্নানে
মন থাকে তার গাঁঠ্রি পানে।

বিবাহ বিষয়ক প্রবাদ

সামাজিক জীবনে বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বিয়ের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে লোকপ্রবাদে। 'বিয়ের ফুল' ফুটুক আর না-ই ফুটুক, কোনে পাত্রীর হঠাৎ বিয়ের আয়োজন হলে প্রবাদে বলা হয় :

www.pathagar.com

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ি
পায় আলতা দিয়ি ।

কিন্তু বিয়ে কি অতই সহজ । অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অনেক প্রস্তুতি নিয়েও অনেক সময় ভুলত্রুটি থেকে যায় । তাই প্রবাদে বলছে :

ঘর বোলে ভাইঙ্গি দ্যাখ্
বিয়ি বোলে জুইড়ি দ্যাখ ।

তবু বিয়ে মানেই আনন্দ । আর বিয়ে শুধু তারই নয়, এ আনন্দ পাড়াপড়শি সবারই প্রবাদে আছে :

যার বিয়ি তার কথা নি
পাড়াপড়শির ঘুম নি ।

অনেক সময় বিয়ে নিয়ে সমস্যাও হতে পারে । নানাবিধ অপপ্রচারে বিয়ে ভেঙে যেতেও পারে । তাই প্রকাশ্যে ধুমধাম না করে সে ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করাই জরুরি হয়ে ওঠে । কিন্তু সমাজের কৌতূহলী মানুষজনকে বাধা দেবে কে? তাই তো প্রবাদে বলা হয় :

এ্যাকে তো হয়না বিয়ি
লোক দাঁড়ালো কাতার দিয়ি ।

বাঙালি কথায় কথায় নানা প্রসঙ্গে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তের কথাটি প্রকাশ করে অসাধারণ প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে । যুগ পরম্পরায় লোকের মুখে মুখে তা রচিত হয়েই চলেছে । এর যেন শেষ নেই । মেহেরপুর অঞ্চলেও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন ।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার মূলত মানসিক ব্যাপার। মানুষের মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা, শুভাশুভ বোধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি থেকে এর উদ্ভব, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ব্যক্তিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, অনেক সময় বিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়ার আগেই মন থেকে তিরোহিত হতে পারে। কিন্তু কোনো বিশ্বাস যখন পূর্ণরূপ নিয়ে ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা হয় সংস্কার, লোকবিশ্বাস একান্তই ব্যক্তির ধ্যান-ধারণা মাত্র, কিন্তু সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু আচার-আচরণের ব্যাপার আছে। বিভিন্ন লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসের যে বিস্তার ঘটে তা জীবনের প্রয়োজনেই আপন অস্তিত্বে বিদ্যমান থাকে, প্রয়োজন শেষ হলে তার বিলুপ্তি ঘটে। নতুবা তা কুসংস্কারে পরিণত হয়।

শেখ ফরিদের দরগা

মেহেরপুর শহর থেকে ১৫ কিমি. দূরে অবস্থিত প্রাচীন জনপদ বাগোয়ান মোগল আমলে প্রসিদ্ধ পরগনা ছিল। বাগোয়ান সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গলে' আছে :

'ধন্য ছিল পরগনা বাগোয়ান গ্রাম
গাঙ্গিনীর পূর্বকুলে আন্দুলিয়া গ্রাম
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম
যাহে অন্নদার দাস হরিহোর নাম।'

বাগোয়ানের সন্তান ভাবানন্দ মজুমদার ছিলেন নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এ গ্রাম সম্পর্কে ড. ইরফান হাবিব এর 'An Atlas of Moghal Empires: Political and Economic Maps with detailed notes. Bibliography and Index' গ্রন্থে অনেক তথ্য আছে। এ গ্রামে শান বাঁধানো একটি দিঘি আছে। এই দিঘির পূর্বদিকে একটি প্রাচীন বসতবাড়ি ছিল। বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার নির্মিত এ মন্দিরটি ছিল আটচালা ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যমণ্ডিত। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের মন্দির, বসতবাড়ি এবং ভবানন্দ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত জনপদ সম্পর্কে এ অঞ্চলের মানুষ তেমন কিছু জানে না। এসবই ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে। বাগোয়ানকে মেহেরপুর ও এর পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ চেনে শেখ ফরিদের দরগার জন্য। জনশ্রুতি আছে যে, ষোড়শ শতক কিংবা সতের শতকের

www.pathagar.com

প্রথম দিকে শেখ ফরিদ ইয়েমেন থেকে ধর্ম প্রচারের জন্য বাগোয়ান গ্রামে আস্তানা গড়ে তোলেন। তিনি নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত মানুষদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি প্রায় সব সময়ই ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একদিন কিছু কাক এই সাধকের ধ্যান ভঙ্গ করে দেয় এবং এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে কাকগুলো তাড়িয়ে দেন। এরপর থেকে নাকি বাগোয়ান গ্রামে কেউ কাক ডাকা শোনেনি।

শেখ ফরিদের দরগার পাথর

৪ বিঘা জমির উপর অবস্থিত দরগাহের পাদদেশে রয়েছে ৭টি কালো পাথর এবং নকশা অংকিত কিছু ছোট ইট। দরগাহের ২৫০ গজ দূরে রয়েছে একটি বিরাট লোহার পাত। পাথরগুলোকে পবিত্র পাথর বলে এলাকার সাধারণ মানুষ মান্য করে। মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে শেখ ফরিদের প্রভাব ব্যাপক। বাগোয়ানের শেখ ফরিদ কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে এলাকার মানুষ শেখ ফরিদকে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার পির বলে মনে করেন। দরগাহের খাদেম সাদিমান দরগাই (৮৫), পিতা-খবির উদ্দিন দরগাই জানান, শুভফল কামনায় সারা বছর ফরিদ সাহেবের দরগায় শিরনি বা মানত দেওয়া হয়। কেউ দুধ, চিনি, চাল-ডাল মানত করে, কেউ করে মুরগি-ছাগল-গরু। দরগা সংলগ্ন দরগাপাড়ার আসমা বেগম (৫৫), স্বামী-কামাল উদ্দীন শেখ বলেন, "দাদার মুখে শুনেছি ফরিদ সাহেবের দরগা রাতারাতি হয়ে গেছে। কাকের ডাকে ভোর হওয়ায় তিনি দরগার কাজ শেষ করতে পারেননি।" ফয়েজউদ্দীন (৫৫), পিতা-খোদা

www.pathagar.com

বকসো শাহ বলেন, "শেখ ফরিদের দোয়ায় বাগোয়ানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হামলা করতে পারেনি।"

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম অথবা শেষে বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা, আত্মীয়-স্বজনের রোগমুক্তি, প্রবাসী প্রিয়জনের বিপদমুক্তি কামনা করে শেখ ফরিদের নামে মানত করে দুদিন আচার পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বাগোয়ানের প্রায় সব মেয়েরা রোজা রাখে এবং দুদিনই ইফতারি করে দরগাতলায়। ইফতারি হিসেবে রস-পিঠা (ক্ষীর চুষি) আনা হয় এবং তা দিয়ে বাল্যসেবা হয়। গ্রাম থেকে চাল, ডাল, তরকারি, পয়সাও সংগ্রহ করা হয়। পুরুষেরা খিচুড়ি রান্না করে সবার মাঝে বিতরণ করে।

মেহেরপুর জেলার লোকমানসে শেখ ফরিদের প্রভাব সত্য পিরের মতোই ব্যাপক। লোকসাহিত্য, ছড়া, পালাগানের মধ্য দিয়ে যেমন সত্যপিরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়, তেমনি বিভিন্ন কাহিনি-কিংবদন্তির ভেতর দিয়ে শেখ ফরিদের গুণকীর্তন করা হয়। সত্যপিরের স্রষ্টা ও প্রচারক যেমন মুসলমান সমাজ তেমনি শেখ ফরিদের প্রচারকও মুসলমান সমাজ। সত্যপির ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তার মানব পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে। সত্যপিরের ধারণা লোকমানস থেকেই সমৃদ্ধ হয়েছে। শেখ ফরিদ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তাঁর মানব পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে। 'মানব গুরু' দরবেশ ফরিদ এখন দেবগুরুতে পরিণত হয়েছেন।

শাহ বাবার দরগাহ

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে মুসলমান সুলতান-নবাব-সুবেদারদের চেয়ে পির-দরবেশরাই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। পির-দরবেশ-অলি-আউলিয়ারা মানুষের কাছাকাছি হয়ে ইসলামের বাণী, আদর্শ ও রীতিনীতি প্রচার করেছেন। লোকালয়ের আশেপাশে উন্মুক্ত আকাশের নিচে গাছতলায় বসে ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। সাধনালব্ধ জ্ঞান মানুষকে উদার মনে দান করেছেন। সেই সাথে আস্তানা, খানকাহ, দরগা গড়ে তোলেন যেগুলো তাদের ধর্মকৃত্যের পরিচয় বহন করে। মেহেরপুরের কালাচাঁদপুরে শাহ ভালাই-এর দরগা এমন এক সাধকের নামে গড়ে ওঠে। শাহ ভালাই ছিলেন একজন অধ্যাত্ম সাধক। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি ইয়েমেন থেকে এদেশে আসেন এবং কালাচাঁদপুরে আস্তানা গড়ে তোলেন। শাহ ভালাই এর প্রকৃত নাম দরবেশ শাহ মেহেরউল্লাহ।

ড. আনোয়ারুল করীম এর মতে, "তাঁর প্রকৃত নাম শেখ মুহাম্মদ জহির উদ্দীন। তিনি এতদঞ্চলে শাহ ভালাই নামে চিহ্নিত হন। তিনি ঝাড় ফুঁক দিয়ে লোকের রোগ ভাল করতে পারতেন বলে তাকে এই নামে অভিহিত করা হয়।"[১]

শাহ ভালাই-এর সংগী হিসেবে আসেন শেখ ফরিদ, মেহমান শাহ, মালেকুল গাউস। শেখ ফরিদ বসবাস করেছেন বাগোয়ান গ্রামে এবং এখানে তাঁর নামে একটি দরগা আছে। আর মেহমান শাহের মাজার আছে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার চারুলিয়া গ্রামে।

www.pathagar.com

"মালেকুল গাউস ধর্ম প্রচার করেছেন গাংনী অঞ্চলে কিন্তু তিনি কোথায় মৃত্যুবরণ করেছেন তার হদিস পাওয়া যায়নি। মালেকুল গাউস-এর মতো শাহ ভালাই-এর মাজারেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। কথিত আছে যে, ১৬৫৯ সালে শাহ ভালাই ইয়েমেন থেকে এসে কালাচাঁদপুরে আস্তানা গড়ে তোলেন। তখন ঐ গ্রামে খন্দকার ইসাহাক আলী নামে এক প্রভাবশালী মুসলমান বাস করতেন।

শাহ ভালাই কিছুকাল খন্দকার ইসহাকের বাড়ি বসবাস করেন এবং পরে আস্তানা গড়ে তোলেন। কিছুদিন পর তিনি মেহেরপুরের বড় বাজারে দ্বিতীয় দরগা বা দরবার শরিফ (১৬৬০-৬১) নির্মাণ করেন। অনুমান করা হয় তিনি ১৬৫৯ থেকে ১৬৬৪ খ্রিঃ পর্যন্ত মেহেরপুরে অবস্থান করেন।

১৬৬৫ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার গোকুলখালিতে তৃতীয় খানকাহ গড়ে তোলেন। এরপর চুয়াডাঙ্গা রেলবাজারের কাছে একটি আস্তানা করেন (১৬৯৯)। পরবর্তীকালে চুয়াডাঙ্গার ভেমরুল্লাতে অবস্থান করেন এবং একটি খানকাহ গড়েন। ভেমরুল্লা ত্যাগ (১৭০৮) করে দর্শনার কোষাঘাটায় অবস্থান করেন এবং ১৭১৪ সালে কোষাঘাটায় একটি খানকাহ গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তিনি কোথায় অবস্থান করেন তার হদিস পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি আছে, তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কামেল দরবেশ ছিলেন। তিনি নৌকা ছাড়া ভৈরব পার হতে পারতেন। হাতের ইশারা করলে ওপারে বাঁধা নৌকা এপারে চলে আসতো।

শাহ ভালাই এর নামে মেহেরপুরের কালাচাঁদপুরে দরগা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিদিন শাহ ভালাই-এর নামে মানত করে অনেকে এই দরগাতলায় আসে। কথিত আছে, শাহ ভালাই-এর নামে মানত করলে বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করে, অসুস্থ সুস্থ হয়, নিষ্ফলা গাছে ফল ধরে। কালাচাঁদপুরের শওকত আলী জানান, প্রতি বছর ১৩ ফাল্গুন এখানে ওরস হয়। এ ওরসে কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত হয়। অনেকেই মানত নিয়ে আসেন।

মা বরকতের দরগাহ

মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ায় বর্তমান সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিনের বাসভবনের পশ্চিম দিকে একটি দরগা আছে যেটি মা বরকতের দরগা নামে পরিচিত। দরগাহের গায়ে আরবি হরফে লেখা আছে এবং ফল-লতাপাতা খচিত নকশা রয়েছে। ছোট টালি দিয়ে চুন-সুরকির মাধ্যমে গাঁথা দরগাটির স্থাপনাশৈলী দেখে অনুমান করা যায় এটি কোনো মুসলমান দরবেশের দরগা। কবে, কখন দরগাটি গড়ে উঠে তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয়, এটি মোগল আমলে নির্মিত হয়েছে। দরগাটিকে ঘিরে নানা কিংবদন্তি ও মিথ চালু আছে। প্রায় প্রতিদিন প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা করে মেয়েরা দরগায় শিরনি মানত করতে আসে। শবে বরাতের দিন দরগায় মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। বিভিন্ন

www.pathagar.com

লোকধর্মের অনুসারী সাধকেরা দরগায় সেজদা করে। প্রথম সেজদায় মন্ত্রে উচ্চারণ করা হয় :

'গুরু সত্য, মা সত্য, মার নামে জয় হোক,
আমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হোক।
সেজদা দিলাম মা বরকতের চরণে
এই সেজদা মূল,
এই সেজদা কবুল করো আল্লা মহম্মদ রসুল।

আরও বলা হয় :

খাতনে মা জিন্নাত জহুরা হুঁশিয়ার
দীনহীনকে দয়া করে, কর মা উদ্ধার।
ও মা বরকত দাউনদার
তোমাকে জানাই প্রণাম আল্লাহো আকবার।
আল্লাওলি মহম্মদ কলি মা বরকত দাউনদার
তোমার চরণে জানাই সালাম আল্লাহো আকবার।

মেহেরপুরের লোকজীবন, মানস ও সংস্কৃতিতে মা বরকতের দরগার প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দরগাটি ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

সোনা গাজীর দহ

মেহেরপুরের লোকজীবনের সাথে ভৈরব নদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ভৈরবের দুপাড়েই গড়ে উঠেছে মেহেরপুর জেলার প্রাচীন গ্রামগুলো। ভৈরব তীরবর্তী জনজীবনের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি বিনির্মাণেও এ নদের রয়েছে অতুলনীয় ভূমিকা। এই নদটি মেহেরপুর জেলার আশরাফপুর গ্রাম পেরিয়ে ভবানন্দপুর ও রসিকপুরের দিকে বয়ে যাওয়ার সময় এক দহের সৃষ্টি হয়েছে। এই দহটির নাম সোনা গাজীর দহ। এর খাদের গভীরতা কত তা আজও কেউ পরিমাপ করেনি। দহের জল গ্রীষ্মকালেও শুকায় না। দহটিকে ঘিরে নানারকম ভয়, বিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে। স্থানীয়রা জানায়, সোনা গাজী দহের কাছে গেলে কেউ ফিরে আসতে পারে না। আশরাফপুর গ্রামের আরিফুল ইসলাম (২৪) জানান, "আগে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা কন্যাকে সুপাত্রে সম্প্রদান করার কামনা করে সোনা গাজীর দহে মানত করতে আসতো। সোনাগাজীর কাছে যা চাইতো সে তাই পেত বলে শুনেছি।' সোনাগাজীকে আশরাফপুর, ভবানন্দপুর, রসিকপুর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ 'পানির মালিক' নদ-নদীর অধিপতি বলে মান্য করে। লোকবিশ্বাস মতে তিনি পানিতে বাস করেন এবং এক চিরঞ্জীব জেন্দা পির।

www.pathagar.com

দরবেশ শাহ এনায়েত ওরফে বুড়া দেওয়ানের দরগা ও মাজার

আধ্যাত্মিক ও মহিমায় বলীয়ান এক সাধকের নাম দরবেশ শাহ্ এনায়েত যিনি বুড়া দেওয়ান নামে পরিচিত। 'কথিত' অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এই দরবেশের মাজার রয়েছে মেহেরপুর শহর থেকে ১২ কিমি. দক্ষিণে পিরোজপুর গ্রামে। কথিত আছে, তিনি অলৌকিক ক্ষমতা বলে অন্ধের অন্ধত্ব, খঞ্জের খঞ্জত্ব দূর করতে পারতেন। তাঁর ঝাড়-ফুঁক, পানি পড়া মহৌষধের মতো কাজ করতো। এছাড়াও এই সাধককে নিয়ে নানা কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকবিশ্বাস রয়েছে। জনশ্রুতি আছে, তিনি ভৈরব নদের স্রোত নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন এবং এ নদের অধিপতি হিসেবে ভৈরবকে যা আদেশ করতেন তাই শুনতো। একদিন তিনি এক ভক্তের নিকট থেকে প্রাপ্ত খাবার ভৈরবে ফেলে দেন এবং ভৈরবকে পুনরায় আদেশ করা হলে সেগুলো ফেরত পাওয়া যায়। দরবেশ শাহ এনায়েতের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কিত সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে শোনা যায়, তিনি এক জমিদারের দেওয়ান হিসেবে কাজ করতেন এবং এ কারণে তাঁর নাম বুড়া দেওয়ান।

সুবিদপুরের শাহ্ দরগা

মেহেরপুর শহর থেকে অনতিদূরে অবস্থিত সুবিদপুরের শাহ্ দরগাকে সাধারণ মানুষ পবিত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থান বলে মনে করে। দরবেশ মেহের আলী শাহের সমসাময়িক দরবেশ শাহ্ আলাই-এর স্মৃতি বহনকারী দরগাটি ৪০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে যে, ষোড়শ শতকের দিকে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মেহেরপুর অঞ্চলে আসেন এবং গদী সুবিদপুরে আস্তানা গাড়েন। এই আস্তানায় অবস্থান করেই তিনি ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পর এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। রোগমুক্তি ও শুভফল কামনা করে এখানে সাধারণ মানুষ মানত করে। শিশুর 'মুখে ভাত' অনুষ্ঠান ও অন্নপ্রাশন দরগার কাছে অনুষ্ঠিত হয়।

যাদুখালীর লাফা সাধুর মাজার ও আশ্রম

কত দূরে আছো তুমি,
তোমায় চিনি না আমি।
আমি ভুলে গেছি সব মায়াময়
মোহ ঘুম ঘোরে।

"বিষয়মোহে পড়ে আমরা ঈশ্বরকে চিনতে পারিনি, তোমাকে আমরা ভুলে গেছি। কিন্তু তুমি আমাদের মাঝেই আছো।" কথাগুলো বলেছিলেন অধ্যাত্ম সাধক জন্মেঞ্জয় মজুমদার ওরফে লাফা সাধু। সংসার বিবাগী এই সাধকের জন্ম মেহেরপুর জেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের টুঙ্গী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। পিতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন প্রভাবশালী জোতদার। তার মায়ের নাম মায়াদেবী। জন্মেঞ্জয় মেধাবী ছিল এবং ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে সুখ্যাতি ছিলেন তাঁর। গোলপোস্টে

www.pathagar.com

খেলার সময় লাফিয়ে লাফিয়ে বল ধরতেন বলে তাকে 'লাফা' বলে ডাকা হতো। উত্তরকালে সাধক জীবনে তিনি লাফা সাধু নামে পরিচিতি লাভ করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর পারিবারিক নির্দেশে আঠারো বছরে তিনি এক উচ্চবংশীয় সুন্দরী নারীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। দুবছর পর তারা একটি কন্যাসন্তান লাভ করেন। দুবছরের কন্যাকে রেখে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাস জীবন বেছে নেন। জগত জীবনের রহস্য উন্মোচন এবং সত্য অন্বেষায় গয়া-কাশীসহ বিভিন্ন তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। আজমীর শরিফে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রা.) দরবারেও কয়েক বছর ছিলেন। তীর্থ ভ্রমণ শেষে পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে বসবাস শুরু করেন এবং ঈশ্বরদীর ব্যোমভোলা সন্ন্যাসীর নিকট তান্ত্রিক মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষিত হয়ে তিনি আবার পৈতৃক গ্রাম টুঙ্গীতে ফিরে আসেন। তবে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে এক বটতলায় আশ্রয় নেন। সেই বটতলা ছেড়ে মাঝে মাঝে দেশের অন্য অঞ্চলেও চলে যেতেন। তিনি যে বটতলায় থাকতেন সেটির নাম এখন সাধুর আখড়া। একস্থানে থিতু হয়ে থাকা ছিল এই সাধকের স্বভাববিরুদ্ধ। বিভিন্ন স্কুলঘর কিংবা ভগ্ন মন্দিরে অবস্থান নিতেও তাঁকে দেখা গেছে। পিরোজপুর প্রাইমারি স্কুল, কোমরপুর স্কুল, সোনাপুর স্কুল, বলিয়ারপুর স্কুল, নাটুদহ হাইস্কুল, নাটুদহের এক ভগ্ন মন্দিরেও তিনি বসবাস করেছেন। তাঁকে নিয়ে অসংখ্য কিংবদন্তি-কাহিনি চালু আছে মেহেরপুর জেলায়। তাঁর খেয়ালি জীবনচর্যা, বোহেমিয়ানদের মতো চলাফেরা দেখে অনেকেই তাঁকে পাগল বলেছে। আবার আলাপ-আলোচনা শুনে তাঁকে সাধক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। তিনি জাতিভেদ প্রথা, ছুঁতমার্গ মানতেন না। তবে সকল ধর্মের সার্বজনীন মূল্যের প্রতি ছিলেন গভীরভাবে আস্থাশীল। লাফা সাধুর খাদ্যাভাসেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। তিনি যেমন শাকসবজি, তেলাকুচার পাতা ও কাঁঠাল সিদ্ধ খেতেন আবার রুটি, মুড়ি, ছোলাভাজাও খেতেন। মসুরির খিচুড়ি তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল। কাঁচামরিচ, রসুন তিনি বেশি খেতেন। মাঝে মাঝে কাঁচামরিচ ও পেঁয়াজ দিয়ে পান্ত া ভাত খেতেন। তিনি নিয়মিত গাঁজা সেবন করতেন। শীত-গ্রীষ্ম সব ঋতুতে পাতলা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে থাকতেন আর পরনে থাকতো গেরুয়া রঙের থান। তিনি বেশি কথা বলতেন না। মাঝে মাঝে বলতেন :

বিষয় বাসনা কামনা মায়া মোহজালে,
জড়ায়ে রেখেছো যারে,
ক্যামনে চিনিবে তারে।

ঈশ্বরে প্রবল বিশ্বাসী বিষয়বাসনাহীন এই সাধকের আখড়ামাঠের বটগাছটি কেটে ফেলা হলে যাদুখালী প্রাইমারি স্কুলের মাঠে চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। স্কুল চলাকালীন সময় বারান্দার এক কোণায় এবং রাতে কোনো একটি রুমে শুয়ে থাকতেন।

www.pathagar.com

এ সাধক সম্পর্কে মেহেরপুর সরকারি কলেজের লাইব্রেরিয়ান টুঙ্গী গ্রামনিবাসী মীনা পারভীন (৫১) বলেন, লাফা সাধু উঁচুমানের সাধক ছিলেন। রাজনীতি সম্পর্কেও তিনি খোঁজ খবর রাখতেন। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে এলাকাবাসীকে জাগিয়ে তোলার জন্য ১৯৭০'এর নির্বাচনের পর দেওয়ালে দেওয়ালে রাইফেল, বন্দুক, তরবারি আঁকিয়ে রাখতেন। এলাকাবাসী জিজ্ঞাসা করলে, বলতেন-যুদ্ধ শুরু হবে, প্রস্তুত থাকো।' মুজিবনগর কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক, লাফা সাধুর ভাবশিষ্য ইজ্জত আলী (৬২) বলেন, "সাধুজি অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৯৭৩ সালের এক রাতে আমি আখড়ায় সাধুর সঙ্গে থেকে আলাপ আলোচনা করবো বলে মনস্থির করেছি। রাত ১:৩০ মিনিটের দিকে সাধুজি আমাকে বললেন, "তুই বাড়ি যা। তখন বর্ষাকাল। নৌকায় নদী পার হয়ে বাড়ি যেতে হয়। আমি তাঁকে বললাম, নদী পার হয়ে আমি কীভাবে বাড়ি যাবো? সাধুজি বললেন, তুই যা, দেখ, যেতে পারবি। আমি সাধুজির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নদীর ঘাটে এসে দেখি নৌকা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখি একটি নৌকা আসছে। নৌকার মাঝিকে ডাকতেই সে আমাকে পার করার জন্য এগিয়ে আসে। আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করলে, মাঝি কথা বলে না। আমি মাঝিকে চিনতে পারিনি। সে আমাকে পার করে দেয়, কিন্তু পারের পয়সা নেয় না।"

এই রহস্যময় মানুষটি সম্পর্কে অসংখ্য কাহিনি প্রচলিত আছে, যা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে চলেছে। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছেন যে, লাফা সাধু রাত ১:০০ টার পর শ্মশানঘাটে স্নান করছেন। এসব প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে টুঙ্গীর আব্দুল মান্নান অন্যতম। তিনি পিরোজপুর গ্রাম থেকে যাত্রার রিহার্সেল শেষে রাত ১.০০ টায় বাড়ি ফেরার সময় এসব দৃশ্য দেখেছেন। জনশ্রুতি আছে, মুজিবনগর উপজেলার চন্দ্রবাস গ্রামের পক্ষাঘাতগ্রস্ত এক রোগী তাঁর তেল মেখে সুস্থ হয়েছে।

এই রহস্যময় পুরুষকে ঘিরে অসংখ্য কিংবদন্তি ও কাহিনি সৃষ্টি হয়েছে যা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে। তিনি ১৯৯৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১৪০০) পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে যাদুখালি হাইস্কুলের সামনে সমাহিত করা হয়। তাঁর প্রয়াণদিবসে আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশরা সাধুসঙ্গের আয়োজন করে। এই সাধুসঙ্গে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। এক অনামী বাউলের কণ্ঠে লাফা সাধুর ভাবশিষ্য ইজ্জত আলীর লেখা একটি দেশ গান শুনেছিলাম লাফা সাধুর আখড়ায় অনুষ্ঠিত এক আসরে। গানটি হলো :

মোর জীবনের ধ্রুবতারা তুমি গো
অনন্তকাল থাকিবে আমার সাথে।
আমি মূঢ়মতি পথ ভুলে যাবো
চেনা সুর ছেড়ে বেসুরো গাইব।
ঘাটখানি ছেড়ে অঘাটে নাইবো,
দেখাবে তখন অমল জ্যোতি
হাত রেখে মোর হাতে,

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ আল আমিন, মন্টু শেখ ও রফিকুর রশীদ

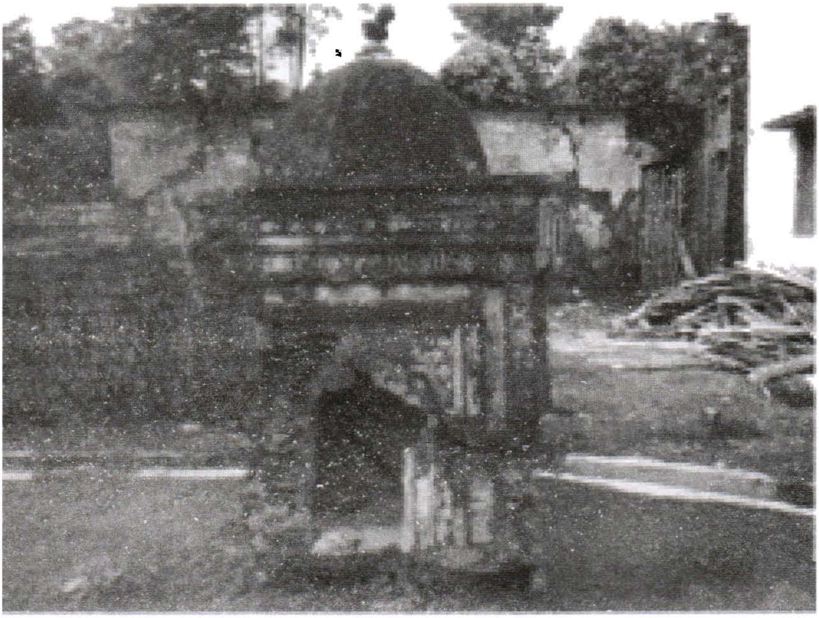

মা বরকতের দরগাহ, মেহেরপুর

www.pathagar.com

আমি তো তোমার দাসানুদাস
বুকে মনে মোর নাই কোনো আশ
তব সভ্যমাঝে করি হায় হুতাশ ।
আমারে লহ সকরুণ হেসে আমার জীবন প্রাতে
জনম অবধি আমি তোমার নয়নে
চোখ দুটি রাখিয়াছি জীবন-মরণে
হাসি ও কান্নার বিচিত্র বরণে ।
জনম জনম চাহিতে দাও
তোমার আশিস সাথে ।

লাফা সাধুর তিরোধান হয়েছে দেড় যুগ আগে । কিন্তু মেহেরপুরের সাধারণ মানুষ তাঁকে ভুলে যায়নি । তাঁর আখড়া ও মাজার প্রাঙ্গণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে মান্য করে এলাকার সাধকেরা ।

লাফা সাধু

তথ্যনির্দেশ

১. ড. আনোয়ারুল করীম : বাংলাদেশের বাউল, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০২/পৃ. ৩৭

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

জীবন-জীবিকার তাগিদে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন কৌশল কাজে লাগায়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার এবং প্রাত্যহিক জীবনে এর প্রয়োগ আমাদের চিরচেনা জগতটা বদলে দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির সর্বগ্রাসী প্রবল প্রভাবের মধ্যেও লোকপ্রযুক্তি টিকে আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। মানুষ লোকপরম্পরায় এসব প্রযুক্তি বা কারিগরি কৌশল আয়ত্ত করেছে। পুরুষানুক্রমে ঐতিহ্যগতভাবে প্রাপ্ত এসব কৃৎকৌশলকেই আমরা লোকপ্রযুক্তি (Folk Technology) বলে থাকি। ভূমি কর্ষণ, বীজ বোনা, ফসল কাটা, ফসল ঘরে তোলা, মৎস্য শিকার, ফসল সংরক্ষণ পর্যন্ত জীবনের কোনো না কোনো স্তরে এসব কারিগরি কৌশল ক্রিয়াশীল রয়েছে।

কৃষি সংক্রান্ত লোকপ্রযুক্তি

বর্তমানে মেহেরপুর জেলার কৃষকরা চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনে যেসব প্রযুক্তি, কারিগরি কৌশল, যন্ত্রপাতি, উপকরণ ব্যবহার করছে, তা দেশের অন্য অঞ্চলের মতই। ভূমি কর্ষণে লাঙল, কোদাল, অসমতল জমিকে সমতল করতে মই, জমির আগাছা দূর করার জন্য নিড়ানি, বিদি, ফসল কাটার কাজে হেঁসো-কাস্তের ব্যবহার করা হয়। ধান, গম, যব মাড়াইয়ের জন্য গরুকে ব্যবহার করা হতো এক সময়। একে 'মলোন' মাড়াই বলা হয়। মলোন মাড়াইয়ের সময় গরুর মুখে ঠুসি দেওয়া হয়। যাতে সে ফসল খেতে না পারে। কুলায় ঝেড়ে বা বাতাসে মেলে ধরে ধান থেকে চিটা আলাদা করা হয়। ভুষা থেকে দানা আলাদা করতেও একই কৌশল অবলম্বন করা হয়। বাঁশ-বেত নির্মিত 'কাঠা' ফসল মাপার কাজে এক সময় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। ফসল সংরক্ষণের জন্য গোলা, খড়-বিচালি সংরক্ষণের জন্য আজও পালা এবং গোয়াল-এর জন্য গাদা তৈরি করা হয়। খড়ের পালা এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগেও তার ক্ষতি না হয়। ক্ষেত থেকে ফসল ঘরে আনার জন্য গরুর গাড়ি ব্যবহার করা হতো। এখন এ অঞ্চলে যন্ত্রচালিত ট্রলি ব্যবহার করা হচ্ছে। ভূমিতে সারের ব্যবহার ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করেছে পাশাপাশি ফসল উৎপাদনেও যুগান্তর ঘটিয়েছে। রাসায়নিক সারের সাথে গরু-মহিষের গোবর, পচা লতা-পাতা, ছাই জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় জৈব সারের চাহিদা কমে গেছে। করলা, লাউ, বরবটির মতো লতানো গাছের জন্য মাচা বাঁধা এবং পানের জন্য বরজ নির্মাণ কৃষকের কৃৎকৌশলের পরিচয় বহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মেহেরপুর জেলায় প্রায় সব গ্রামে সবজি ও লতানো

www.pathagar.com

গাছের চাষ রয়েছে। সবজির বীজ বপন, উৎপাদন, সংরক্ষণেও এ জেলার কৃষকরা প্রযুক্তিগত বিদ্যার নিদর্শন বহন করে।

ভালো ফসলের জন্য রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বালাইনাশকের সঙ্গে পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কৃষকরা পানি সেচের মাধ্যমে তা সরবরাহ করে। খাল, বিল, পুকুর থেকে সে পানি সরবরাহ করে। তবে একালে জমিতে পানি সরবরাহের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপের ব্যবহার বেড়েছে। এক সময় পানি সরবরাহের জন্য ছেঁকনি ব্যবহার করা হতো। আগাছা দমন ও জমিতে ছড়ানোর বীজ ঢাকার জন্য আট-দশ হাত লম্বা বাঁশের অর্ধ ফালির মধ্যে বাঁশের খিল বা কাবারি সংযুক্ত মই ব্যবহার করা হয়। ফসল কাটতে ঝাঁটি, গরু-মহিষের ঘাস কাটার জন্য হেঁসো ব্যবহার করা হয়। টিন বাজিয়ে পাখি তাড়ানো হয়। চোর ও গবাদি পশুর প্রবেশ ঠেকানোর জন্য ফসলের মাঠ অথবা বাগানের চার পাশে বাঁশের চটা বা পাটকাঠি দিয়ে বেড়া বানানো হয়। মেহেরপুর জেলার কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রে যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করছে বা করেছে, সেসব একদিনে বা এককালে আয়ত্ত করেনি। সুদীর্ঘকাল ধরে তারা এসব প্রযুক্তি ও কৌশল আয়ত্ত করেছে।

মৎস্য শিকার সংক্রান্ত প্রযুক্তি

মেহেরপুর জেলায় তেমন নদ-নদী নেই। তাই মাছের জন্য তেরো ঘরিয়ার বিল, হরিরামপুরের বিল, চাঁদ বিলের জলাশয়, তারানগরের পদ্মপুকুর, মাইলমারীর পদ্মবিল, গাংনীর চাঁদপুরের বিল, মেহেরপুর শহরের গড়ের পুকুর এবং স্থানীয় পুকুর-ডোবার ওপর নির্ভর করতে হয়। মাছ ধরার জন্য এ জেলার পেশাদার জেলেরা ঘের জাল, মোটকে জাল এবং ফাঁস জাল ব্যবহার করে। আর সৌখিন মাছশিকারীরা ছিড় ব্যবহার করে। ছিপ দিয়ে মাছ ধরার সময় নির্দিষ্ট স্থানে 'চার' ফেলা হয়। মাছের চারের উপাদান হিসেবে খৈল, একানি, মেথি, ঘোড়বাজ, মিষ্টির গাছ ব্যবহৃত হয়। মেহেরপুর মল্লিক পাড়ার মৎস্যশিকারী সাইফুল ইসলাম ঘটন জানান—১ কেজি খৈল, ১০০ গ্রাম একানি, ১০০ গ্রাম ঘোড়বাজ, ১০০ গ্রাম মেথি, ১ কেজি মিষ্টির গাদের মিশ্রণ দিয়ে মাছের চার তৈরি করা হয়। বড়শিতে গাঁথা 'টোপ' বানাতেও এক অভিনব প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। ১০ পিস পাউরুটি, ১৫০ গ্রাম ছোলার ময়দা, ১০০ গ্রাম মধু, ১০০ গ্রাম লাল পিঁপড়ের ডিম দিয়ে টোপ তৈরি করা হয়।

গৃহকর্মে ব্যবহৃত প্রযুক্তি

দৈনন্দিন ঘর-গৃহস্থালির কাজে যাঁতা, পাটা, নোড়া, হামানদিস্তা, বটি, ঢেঁকি, কুরানি ব্যবহার করা হয়। ধান থেকে চাল তৈরির জন্য ঢেঁকি, গম-যবের আটা তৈরিতে যাঁতা, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, জিরা, আদা বাটতে পাটা-নোড়া, গরম মশলা গুঁড়া করতে হামানদিস্তা, তরকারি কুটতে বটি, নারকেলের শাঁস কুরতে কুরানি ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

এছাড়াও সরিষা, তিল থেকে তেল তৈরিতে কলুরা, মৃৎশিল্পের কাজে গ্রামের কুমাররা, কাপড় তৈরির কাজে তাঁতিরাও নানা প্রযুক্তির প্রয়োগ করে এবং এসব প্রযুক্তি দেশজ প্রযুক্তি। নদী পুকুরের পানিতে পাট 'জাগ' দিয়ে পাটকাঠি ও আঁশ আলাদা করা এবং তামাকপাতা পোড়ানোর কৌশল কৃষকদের একান্ত নিজস্ব। রংপুর জেলার তামাক পোড়ানো বা প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল আর মেহেরপুরের কৃষকদের এ সম্পর্কিত প্রযুক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। খেজুর রস থেকে পাটালি গুড় বানানোর কৌশলও এ অঞ্চলের কৃষকদের একান্ত নিজস্ব।

কৃষি উৎপাদন, মৎস্য শিকার, অন্তঃপুরে দৈনন্দিন গৃহকর্মের জন্য এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করতে এ অঞ্চলের কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার-কুমার, ছুতার তথা শ্রমজীবী মানুষ যুগে যুগে নানা প্রযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কালের আবর্তে লোকপ্রযুক্তির অনেক উপকরণ বিলুপ্তির পথে। তথাপি এই প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়নি একেবারে। সময়ের অভিঘাতকে সহ্য করে লোকপ্রযুক্তির অনেক উপাদানই আজঅবধি টিকে আছে।

হামানদিস্তা

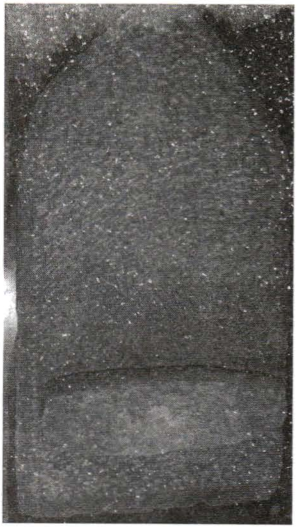
শিলপাটা

www.pathagar.com

ক্ষেত্র সমীক্ষায় তথ্যদাতার তালিকা

১. রমজান আলী (৮১), কবিয়াল বয়াতি, হিতিমপাড়া, মেহেরপুর।
২. আসকার আলী (৫৫), ধুয়াগান ও ঝাঁপান গানের বয়াতি, বেলতলাপাড়া, মেহেরপুর।
৩. শৈলেন হালদার (৬০), বাউল গায়ক ও সাধক, বলরাম হাড়ির আখড়া, মালোপাড়া, মেহেরপুর।
৪. সাদিমান দরগাই (৮২), শেখ ফরিদের দরগার খাদেম, বাগোয়ান, মেহেরপুর।
৫. মিনহাজ উদ্দীন (৪০), মায়াময়ী, মেহেরপুর।
৬. অনন্ত দাস (৫০), সভাপতি, বলরামহাড়ির আখড়া কমিটি, মেহেরপুর। ঠিকানা : বারখাদা, কুষ্টিয়া।
৭. নান্টু সরকার (২৮), লোকগায়ক ও যন্ত্রশিল্পী, চিৎলা, গাংনী, মেহেরপুর।
৮. এস.এম. তৌহিদ সরকার (৪০), লোকগায়ক, বাদ্যকার, চাঁদবিল, মেহেরপুর।
৯. চণ্ডিচরণ হালদার (৬২), কীর্তনীয়া ও বৈষ্ণব সাধক, চাঁদবিল, মেহেরপুর।
১০. মীনা পারভীন (৫০), গ্রন্থাগারিক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর।
১১. শাশ্বত নিপ্পন (৪০), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, মেহেরপুর জেলা সংসদ।
১২. মাহবুব চান্দু (৪৫), জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক সংবাদ, মেহেরপুর।
১৩. বাছান খাতুন (৫৫), বাউল সাধক ও পদাবলি রচয়িতা, গাংনী মহিলা কলেজ পাড়া, গাংনী, মেহেরপুর।
১৪. ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন (৪০), সংস্কৃতিকর্মী ও সংগঠক, চিৎলা, গাংনী, মেহেরপুর।
১৫. আকামুদ্দীন (২২), ছাত্র, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর। ঠিকানা পিরোজপুর, মেহেরপুর।
১৬. আরিফুল ইসলাম (২২), ছাত্র, মেহেরপুর সরকারি কলেজ। ঠিকানা : আশরাফপুর, মেহেরপুর।
১৭. নাজমুল হক (২২), ছাত্র, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, ঠিকানা : হিতিমপাড়া, মেহেরপুর।
১৮. হাসান রুদ্র (৩৫), কবি, ছড়াকার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, মোনাখালী, মুজিবনগর, মেহেরপুর।
১৯. আনোয়ার আয়ুব (৫২), ছড়াকার ও সংস্কৃতি কর্মী। মোনাখালী, মুজিবনগর, মেহেরপুর।
২০. আলম শাহ (৩৫), বাগু দেওয়ানের দরগার খাদেম, গোভীপুর, মেহেরপুর।
২১. আব্দুল মান্নান (৪২), বয়াতি, পদকর্তা ও কোর্ট মুহুরী, মেহেরপুর সরকারি কলেজ পাড়া, মেহেরপুর।
২২. আলফাজ উদ্দীন (৩৫), ঝাপান ও ভাসান গানের বয়াতি, বেলতলাপাড়া, মেহেরপুর।
২৩. জামাল শাহ (৮৫), বাউল সাধক ও গায়ক, ক্যাশ্বপাড়া, মেহেরপুর।

www.pathagar.com

২৪. সালাউদ্দীন ফকির (৫৮), বাউল সাধক ও লোক চিকিৎসক, দিঘিরপাড়া, মেহেরপুর ।
২৫. ননী গোপাল ভট্টাচার্য (৭৮), শিক্ষক, ছড়াকার ও সংস্কৃতিকর্মী, হোটেলবাজার, মেহেরপুর ।
২৬. আনোয়ারুল ইসলাম আকালী (৩৬), সমাজকর্মী, সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর ।
২৭. ইয়াসীন আলী (৩৮), অধ্যক্ষ, রূপায়ণ স্কুল, সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর ।
২৮. আব্দুল মান্নান ফকির, মরমি সাধক ও লেখক, প্রভাষক, হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, চুয়াডাঙ্গা ।
২৯. মোছা. শাহানারা খাতুন (৪৬), স্বামী : আবুল কালাম, গ্রাম : শুকুরকান্দি, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩০. কামরুল ইসলাম (৩৬), পিতা : আব্দুল গণি, গ্রাম : শুকুরকান্দি, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩১. ফাতেমা খাতুন (৬৫), গ্রাম : আকবপুর, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩২. আনিসুর রহমান, পিতা : আমীর হামযা, গ্রাম : ধানখোলা, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩৩. আব্দুল মাবুদ, পিতা : মকছেদ বিশ্বাস, গ্রাম : শিশিরপাড়া, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩৪. মো. আব্দুর রশীদ (৬০), পিতা : মহিউদ্দীন, গ্রাম : বানিয়াপুকুর, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩৫. মো. মোশারফ হোসেন, পরিচালক, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি, গাংনী, মেহেরপুর ।
৩৬. মো. রমজান আলী, পিতা : চতুর আলী, গ্রাম : সহড়াতলা, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩৭. শেখ শফিকুল ইসলাম, কবি ও সাহিত্যিক, গ্রাম : চৌগাছা, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩৮. নূরজাহান বেগম (৫৮), স্বামী : বজলুর রহমান, গ্রাম : জোড়পুকুরিয়া, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৩৯. বান্টু বিশ্বাস, পিতা : মাতু ফকির, গ্রাম : আকবপুর, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৪০. মো. সালাউদ্দীন (৪৫), পিতা : মো. ছাকেন উদ্দীন, গ্রাম : পাকুড়িয়া, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৪১. মো. শামসুজ্জামান (৫৮), সরকারি চাকরিজীবী, গাংনী, মেহেরপুর ।
৪২. মো. রফিকুল ইসলাম (৪২), পিতা : মাবিয়া মহলদার, গ্রাম : সাহারবাটি, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৪৩. রতন (২৫), পিতা : রফিকুল ইসলাম, গ্রাম : মটমুড়া, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৪৪. শোভা (১৮), পিতা : মজিবর রহমান, গ্রাম : মটমুড়া, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।

www.pathagar.com

৪৫. শামিমা খাতুন (১৭), গ্রাম : মটমুড়া, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৪৬. মাসুরা খাতুন (১৭), গ্রাম : মটমুড়া, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৪৭. রাসেল রানা (১৮), পিতা : আব্দুস সাত্তার, গ্রাম : মটমুড়া, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৪৮. মেহেরনিগার (১৮), পিতা : ইউনুস আলী, গ্রাম : রামনগর, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৪৯. তপন মাহমুদ, পিতা : রহিম শেখ, গ্রাম : ছাতিয়ান, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৫০. সঞ্চিতা, পিতা : মুরাদ আলী, গ্রাম : ছাতিয়ান, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৫১. আবুল কাশেম (৬০), পরিচালক, সাহেবনগর সমাজকল্যাণ সমিতি, বামুন্দি, উপজেলা : গাংনী, জেলা : মেহেরপুর ।
৫২. আব্দুর রাজ্জাক (৪০), সমাজকর্মী, মল্লিকপাড়া, মেহেরপুর ।
৫৩. ফকির গোলাম হোসেন মাস্টার, পিতা : শহীদ এমলাক হোসেন, সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর ।
৫৪. সুভাস মনিদাস (৪০), বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা, বাসস্ট্যান্ড, মেহেরপুর ।
৫৫. মহিদুল ইসলাম (৪০), সংস্কৃতিকর্মী, যাদবপুর, মেহেরপুর ।
৫৬. আব্দুস সাত্তার (৪৫), বাউল ফকির ও শ্রমিক নেতা, চিৎলা, গাংনী, মেহেরপুর ।
৫৭. আব্দুল মজিদ ফকির (৬৭), বাউল ফকির ও যাত্রাভিনেতা, পিতা : আজাদ শাহ সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর ।
৫৮. তামজিদুর রহমান মুক্তি (৪০), শিক্ষক ও ক্রীড়াবিদ, সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর ।
৫৯. শিশিরকুমার দাশ, 'বাংলা ছোটগল্প', অক্টোবর ১৯১৩, কলকাতা ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী